রূপকথা

দ্বিতীয় বর্ষ
উৎসব সংখ্যা
২০২২

বাংলা ও বাঙালির কথা বলে

সম্পাদক
মানস কুমার ঠাকুর

Azadi Ka Amrit Mahotsav
The Earth is our Workplace.
We Preserve and Protect it.
(Going Green since 1958)
More than 6 decades of Responsible Mining and Sustainability
One of the best performing Public Sector Enterprises of India
The single largest producer of iron ore in India
Venturing into steel by commissioning 3.0 MTPA Steel Plant at Nagarnar, Chhattisgarh
Sole producer of Diamonds in India
Bringing socio-economic transformation through innovative and impactful CSR initiatives in the less developed regions of the Country.
NMDC re-dedicates itself with a fresh zeal and renewed enthusiasm, energy and strategy to achieve greater heights in delivering value for all its stakeholders.
NMDC
NMDC Limited
(A Government of India Enterprise)
Khanij Bhavan, 10-3-311/A, Castle Hills,
Masab Tank, Hyderabad -500 028, Telangana, India
CIN : L13100TG1958GOI001674
/nmdclimited | www.nmdc.co.in
Eco-Friendly Miner

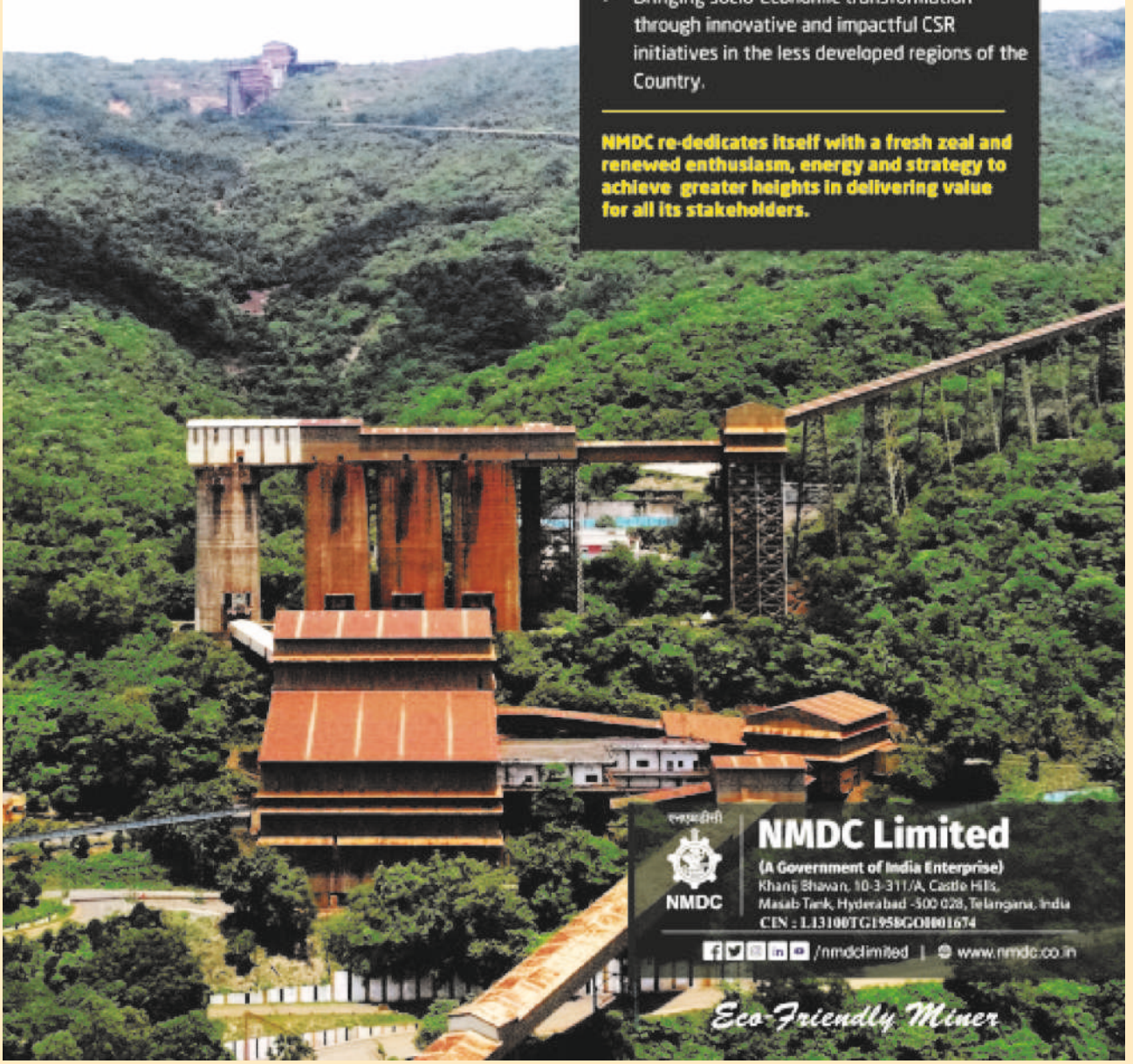

দ্বিতীয় বর্ষ শারদ সংখ্যা ২০২২

রূপকথা

বাংলা ও বাঙালির কথা বলে

প্রধান সম্পাদক
মানসকুমার ঠাকুর

নির্বাহী সম্পাদক
সৈকত হালদার

সহ-সম্পাদক
ঈপ্সিতা সেন

সহযোগী
মধুমিতা দাস

অক্ষরবিন্যাস
দেবাশিস নায়েক

প্রচ্ছদের ছবি
নন্দলাল বসুর আঁকা চিত্র
(সৌজন্যে: শ্যামল সান্যাল)

পরিচালনা
মানসী রিসার্চ ফাউন্ডেশন
www.manasiresearch.org

মুদ্রক
রোহিনী নন্দন
১৯/২, রাধানাথ মল্লিক লেন
কলকাতা - ৭০০০১২
www.rohininandan.com

দাম - ১৫০ টাকা

সূ চি প ত্র

সম্পাদকীয় - ৩

দুর্গা ও কালী দু'জনেই শক্তিরূপে আরাধ্য দেবী, তবু পার্থক্য কোথাও - ৪

রামেশ্বরপুরের ঘোষবাড়িতে নিমন্ত্রণের শুটিং হয় - ৬

বিপ্লবীদের জমায়েতের উদ্দেশ্যেই প্রথম সর্বজনীন পুজোর শুরু - ৭

ক্লীব সমাজ - ৭

কবিতা : ৮ - ১৪ পৃষ্ঠা

সুবোধ সরকার, নিতাই দে, অনিমেষ ভট্টাচার্য, শুভম চক্রবর্তী, শতাব্দী চক্রবর্তী, শুভ্রাংশু শেখর পাত্র, পূবালী চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ সরকার, কাজল আচার্য, তমাল লাহা, রুমকী দত্ত, অমিতাভ রায়, কাজল সেন, সুরভী চ্যাটার্জী, মধুমিতা হালদার, প্রদীপ আচার্য, তানিয়া হাজরা, তনুশ্রী চক্রবর্তী, সুপ্রীতি দত্ত, হাননান আহসান, শান্তিব্রত চট্টোপাধ্যায়, দেবাশিস দত্ত, প্রীতম মোদক, অরুণাংশু ব্রহ্ম, তাপস বৈদ্য।

গল্প : ১৫-৩০ পৃষ্ঠা

বোতলের জিন, মিনির রথ দেখা, ইন্দ্রিয় কথন, র‍্যাট ট্রাপ, বটগাছের থান, দিশা, বাজ বসন্ত।

জাতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামত - ৩১

তারা খসার উপন্যাস - ৩২

অসুখের পর - ৩৯

গান্ধীজীর কথাতেই ননীগোপাল মৈত্র সুলেখা কালির ব্যবসা শুরু করেন - ৬৫

রামমোহন রায়ের অজানা কাহিনি - ৬৬

অনন্য প্রবাদ প্রতিম পুরুষ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য - ৬৭

আইনস্টাইন চিঠি না লিখলে বিদেশে যাওয়াই হত না সত্যেন্দ্রনাথ বোসের - ৬৯

হাসির আড়ালে 'সিরিয়াস' ভানু - ৭০

অসুস্থ হলেই বাবার ওপর ভরসা করতেন উত্তমকুমার - ৭২

রবীন্দ্রনাথও শরৎচন্দ্রের লেখার ভূয়সী প্রশাংসা করতেন - ৭৪

সময়ের থেকে এগিয়ে ছিলেন আশুতোষ - ৭৬

কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই - ৭৭

প্রচারের অভাবেই পঞ্চকবির মধ্যে তিন কবির গান আজ ব্রাত্য - ৮০

সুচিত্রাদির উদ্যোগে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীতের আলাদা বিভাগ চালু হয় - ৮২

এই প্রজন্মের কাছে গীতিকার মোহিনী চৌধুরী উপেক্ষিত - ৮৩

জলধর সেনের হিমালয় ভ্রমণ সাহিত্য - ৮৫

কলকাতার কথকতা - ৯০

মানসকুমার ঠাকুরের কবিতায় 'মানসী'র খোঁজ - ৯৫

জীবনের উৎস তো কাঁচা মাটি - ১০৯

নাট্যমঞ্চের অনবদ্য অভিনয়ের ছাপ ছেড়ে যান উত্তম কুমার - ১১৩

মৃত্যুর ৭৯ বছর পরেও অভিনেতা দুর্গাদাসকে নিয়ে কাজ চলছে - ১১৫

পুতুল নাটক আর সাধারণ নাটকের মধ্যে মেলবন্ধন করছি ঃ সুদীপ্ত - ১১৬

লোকের গান শোনার ধৈর্য কমে গেছে ঃ সুরজিৎ - ১১৮

শংকরের 'চৌরঙ্গী' জীবন দর্শনের এক আশ্চর্য দলিল - ১২০

সত্যজিৎ রায় ও ঋত্বিক ঘটকের ছবির মা গীতা দে - ১২১

পুজোয় খান পেট পুরে.. শর্তাবলী প্রযোজ্য - ১২৩

নদী বাঁচাতে ও জল সংরক্ষণের লড়াই চালাচ্ছেন সাইক্লিস্ট সম্রাট মৌলিক - ১২৫

ভারতের ফুটবলের জনক নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারীকে কেউ মনে রাখেনি - ১২৬

সম্পাদকের কথা —

শারদ উৎসবে সবার জন্যে রইল শুভেচ্ছা

শরতের ঝকঝকে নীল আকাশ দেখলেই মনের মধ্যে এখনো একদল মেঘ খুশিতে হুটোপাটি করে ওঠে। একদিন ভোরবেলা বেজে ওঠে আলোর বেণু। বীরেন্দ্রকৃষ্ণের মহালয়ার চণ্ডীপাঠ ও মহিষাসুরমর্দিনীর মাধ্যমে দেবীপক্ষের সূচনা হয়। আজকের ডিজিটাল যুগে হয়তো অনেক কিছু বদলে গেছে, তবু হারায়নি বাঙালির শারোদোৎসব ঘিরে আবেগ ও উন্মাদনা। ধর্ম যার যার নিজের কিন্তু উৎসব সবার। আর এই উৎসব ঘিরেও রয়েছে অর্থনৈতিক বাজার ও সংস্কৃতি। মা দুর্গাকে আহ্বান জানাতে সবাই নিজের মতো করে উপাচার সাজায়। আমরাও সাধ্যমতো গল্প, কবিতা, উপন্যাস, বিশেষ রচনা, বিনোদন, ও খেলার খবরের নানা উপাচার দিয়ে শারদাঞ্জলি দেওয়ার চেষ্টা করলাম।

পাঠকদের ভালোলাগলে আমরা খুশি। পাঠকই শেষ কথা বলবেন। আমাদের প্রধান লক্ষ্য বাংলা ও বাঙলির সংস্কৃতি, কৃষ্টি আর ঐতিহ্য কে তুলে ধরা। বাঙলা ভাষাকে জীবিকার ভাষায় পরিণত করা। সেই চেষ্টাই নিরন্তর থাকবে। মায়ের আর্শীবাদে আমরা যেন সঠিক দিশা খুঁজে পাই। সবাইকে জানাই শারদ শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা।

দুর্গা ও কালী দু'জনেই শক্তিরূপে আরাধ্য দেবী, তবু পার্থক্য কোথাও

সত্যনারায়ণ দাস

ইয়া দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।

দেবী দুর্গার স্তবের একটি প্রধান অংশ এটি। দেবীকে এখানে আমরা শক্তিরূপে আরাধনা করি। কিন্তু লক্ষ্য করার মতো বিষয় হল, মা কালীকেও আমরা শক্তিরূপে আরাধনা করি। এই দুই দেবীকেই আমরা দেবাদিদেব মহাদেবের স্ত্রীরূপে পুজো করি। তাহলে এই দুই শক্তিরূপের পার্থক্য ঠিক কোথায়, কেনই বা আমরা আলাদাভাবে এই দুই দেবীর আরাধনা করি।

দু'টি পুজোর সূত্রপাত কবে হয়েছিল এইভাবে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখা যাবে দুর্গাপুজো কালীপুজোর অনেক আগেই শুরু হয়েছিল। ১৪৮০ খ্রিষ্টাব্দে (৮৮৭ বঙ্গাব্দে) বাংলাদেশের তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ রায়বাহাদুর প্রথম দুর্গাপুজো করেন একইসঙ্গে গোটা ভারতীয় উপমহাদেশে এই পুজোর প্রচলন করেন।

অন্যদিকে, কালীপুজো শুরু হয় ষোড়শ শতাব্দীতে। বিখ্যাত তান্ত্রিক কৃষ্ণানন্দ আরামবাগীশ নিজে এই পুজোর শুরুয়াদ করেন। এরপর মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় কালীপুজো বঙ্গদেশে প্রসার লাভ করে। এই সময় শ্রীরামপ্রসাদ সেনও আগামবাগীশের পদ্ধতি অনুসারে কালীপুজো করতেন।

এখন প্রশ্ন হল, এই দুই ঠাকুরই অসুর নিধন করেছেন। আমরা শক্তিরূপেণ হিসাবে দুই দেবীরই পুজো করি তবে দুর্গাঠাকুরকে যেন নিজের বড়ো আপন বলে বোধ হয়। ঠিক যেন মায়ের মতন। আর কালীঠাকুর হলেন ভীষণা প্রকৃতি করালবদনা। যাঁকে দেখলে দূর থেকে একবার প্রণাম করে চলে আসি। গৃহস্থ বাড়ির অভ্যন্তরে মা কালীর প্রবেশ সেভাবে নেই, কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া। অথচ সম্পন্ন বা বর্ধিষ্ণু বাড়িতে দুর্গাদালান বা দুর্গামন্দির অবস্থান করে। দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের পর কাঠামো তুলে এনে রাখা হয়। বাড়িতে নিত্য প্রণাম, ধূপধুনোও দেওয়া হয়।

প্রশ্নটা হচ্ছে, দুই দেবীকেই চিন্ময়ী শক্তির মৃন্ময়ী রূপ হিসেবে ভক্তরা ভেবে এসেছে। তাহলে একজনকে শান্তির আশ্রয় আর অন্যজনকে উগ্র প্রচণ্ডরূপী ভাবা কেন? হিন্দুপুরাণ বিশেষজ্ঞ ডেভিড কিংসলে হিন্দু ধর্মে দেবী মাহাত্ম্য সম্পর্কে বলেছেন, পার্বতী শিবকে শান্ত করেন। শিবের অসামাজিক ও ধ্বংসাত্মক প্রবণতাকে প্রতিহত করে দেবী তাঁকে ঘরোয়া, সাংসারিক জীবনে নিয়ে আসেন। পার্বতী নিজের মৃদু দৃষ্টির দ্বারা মহাদেবকে তাঁর তাণ্ডব নৃত্যের ধ্বংসাত্মক দিকগুলিকে সংযত করার জন্য অনুরোধ করেন। আর কালী হলেন শিবের সেই পত্নী যিনি স্বামীকে উত্তেজিত করে তাঁর

পাগল অসামাজিক বিঘ্নকারী অভ্যাসের জন্য উৎসাহিত করেন। (Hindu Goddesses : Vision of the Divine Feminine in the Hindu Religious Traditions by David Kinsley)

কালীর মধ্যে সেই পাগলপারা উন্মাদিনীভাব, যিনি শুম্ভ ও নিশুম্ভ অসুরদ্বয়কে বধ করেও ক্ষান্ত হননি, তাঁর রক্তপিপাসা মেটেনি। তিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে ধ্বংস করতে উদ্যত হন। যা তাঁর সামনে পড়ছে তাই তিনি ছেদন করছেন। দেবতারা এমন অবস্থায় শিবের শরণাপন্ন হন। শিব দেখলেন এই অবস্থায় তিনি যদি কালীর পদতলে শায়িত হন একমাত্র তাহলেই তিনি স্বামীকে দেখতে পেয়ে সম্বিৎ ফিরে পাবেন এবং শান্ত হবেন।

একটা লক্ষণীয় ব্যাপার হল, মহিষাসুর বধ করার জন্য দুর্গা আবির্ভূত হয়েছিলেন, যেমন শুম্ভ ও নিশুম্ভ দুই অসুর নির্ধনের প্রয়োজনে মা কালীর আবির্ভাব হয়। কিন্তু কালী সেখানেই নিজেকেই আটকে রাখেননি। এই দুই চরিত্রের মধ্যে ভীতু, ভিতভিতে, ভাত-মাছখেকো বাঙালি তার স্বভাববশতঃ দুর্গাকে মা হিসেবে আপন করে নিয়েছে। নিজের মনে স্থান দিয়েছে এমনভাবে যেভাবে তার নিজের মেয়েকে, মাকে সংসারে স্থান দেয়। অপরদিকে, কালীকে ভয় পেয়ে দূরে রেখেছে তাঁর প্রলয়কর আচরণের জন্য। সর্বদা এটাই মনে ভয়, যদি কোনও ত্রুটির জন্য মা কালী রুষ্ট হন।

আরও পার্থক্য হল, দেবী দুর্গা অসুরকে তাঁর পদতলে রেখেছেন আর স্বামী ভোলানাথকে মাথায় ঠাঁই দিয়েছেন। কিন্তু মা কালী তাঁর স্বামীকে পদতলে রেখেছেন। এমন উগ্রচণ্ডাকে কি নরম মনের সংসারি বাঙালি নিজের করে নিতে পারে?

এখন প্রশ্ন হল, তাহলে লোকে মা কালীর পুজো করে কেন? কারণ ওই দুর্দমনীয় শক্তিরও যে প্রয়োজন আছে। প্রতিপক্ষ যখন নিকৃষ্ট কালো দুর্ভেদ্য আধার, তখন তাকে ভেদ করতে হলে অর্থাৎ বিনাশ করতে হলে এমনই শক্তির দরকার হয়ে পড়ে যে কোনো দয়ামায়াহীনভাবে রুদ্রতেজে আর অমিত শক্তিতে সামনের সব বাধা চুরমার করে দিতে পারে। রক্তবীজের নিধন করতে পারবে।

আবার পুজোর দিক দিয়ে ধরলে দুর্গাপুজোর ব্যাপ্তি অনেকখানি। সেই মহালয়া থেকে শুরু হয়ে দশমী পর্যন্ত। কত বিচিত্র তার আয়োজন। দেবীর বোধন, কলা বই স্নান, অষ্টমীর পুষ্পাঞ্জলি, নবমীর সন্ধিপুজো ইত্যাদি। বিপরীতে কালীপুজো একরাত্রির পুজো, যাকে রক্ষাকালী পুজো বলে। রাত্রির শুরুতে দেবী মার আগমন আর পুজোর পর শেষ রাত্রে বিসর্জন। আজকাল অবশ্য অনেক সর্বজনীন শ্যামাপুজোয় দেখা যায় আড়ম্বরই সব, তবে পুজো হয় এক রাতেই।

শেষে একটা বিশেষ ঘটনা যা সবারই হয়তো জানা, তার উল্লেখ করব। ১৯০১ সালে স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক বেলুড়মঠে দুর্গাপুজো শুরু হয়। এই পুজোর সূচনা হিসাবে স্বামীজীর মনে যে কারণগুলো স্থান পেয়েছিল তা হল, নারীদের সম্মান প্রতিষ্ঠা। তিনি পাশ্চাত্য দেশে দেখেছিলেন নারীদের সেখানে কতটা শ্রদ্ধা করা হয়। স্বামীজী মনে করতেন ভারতবর্ষ পিছিয়ে পড়ার অন্যতম কারণ হল নারীর প্রতি অশ্রদ্ধা। তিনি বেলুড়মঠে কুমারী পুজোর প্রচলন করেন। যেখানে মৃন্ময়ী দুর্গামূর্তির সামনে কোনো কুমারীকে পুজো করা হয়। এখানে প্রশ্ন, স্বামীজী কালীপুজো না করে দুর্গাপুজো করলেন কেন? যেখানে তাঁর গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণও ভবতারিণীর উপাসক ছিলেন। এর উত্তরে বলা যায় স্বামীজী বাংলার ঘরে ঘরে মাতৃজাতিকে সংসারে পূজিত হতে দেখতে চেয়েছিলেন। এই মাতৃজাতির দীনহীন অবস্থার পরিবর্তনের মধ্যে সমাজের পরিবর্তন বা উন্নতি দেখতে চেয়েছিলেন। তাই একদিকে দুর্গার শক্তিরূপের পুজো করছেন আবার পুত্র-কন্যাসহ দুর্গার যে পারিবারিক রূপ সেটাও ধরে রাখতে চেয়েছেন। শক্তির এই পারিবারিক রূপটাই বাঙালির মনকে টেনেছে মা দুর্গাকে আপন করতে। উমা যে তাঁর পুত্র, কন্যা নিয়ে কদিন আমাদের মধ্যে আসেন এটার মধ্যে দিয়ে একটা স্বর্গীয় আনন্দ উপলব্ধি হয়। সারাবছরের সমস্ত গ্লানি মন থেকে ধুয়ে মুছে যায়। এই আনন্দ করালবদনী, নরমুণ্ডমালিনী মা কালীর কাছ থেকে ভক্ত কোথায় পাবে? কালীও উন্মত্ত হয়ে সমগ্র সৃষ্টি সংহার করে চলেছেন। যে সৃষ্টির মধ্যে সর্বোত্তম সৃষ্টি হল মানুষ। তাই মানুষ দূরে দূরে থেকেছে। অথচ মা দুর্গাকে দশমীতে কৈলাসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়ে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে আপামর বলে, আবার এসো মা।

রামেশ্বরপুরের ঘোষবাড়িতে নিমন্ত্রণের শুটিং হয়

সমুদ্র গুপ্ত

ইছামতী নদীর এপারে বসিরহাটের কাছের শহর হাসনাবাদ আর ওপারে বাংলাদেশের সাতক্ষীরা অঞ্চল। হাসনাবাদের রামেশ্বরপুর গ্রামে ঘোষদের জমিদার বাড়ি। ৫০০ বছরের পুরোনো এই ঘোষবাড়ি শুধু এক ঐতিহ্যশালী জমিদার বাড়ি নয়, এই পরিবারের ঐতিহ্য আর সংস্কৃতি যেমন গৌরবের, তেমনই এই সময়ের নানা সামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে জড়িয়ে এই পরিবারের নাম। জমিদার বাড়ির লোকদেরও গৌরবের কাহিনি কম নয়। ১২৬৪ বঙ্গাব্দে ওই পরিবারে জন্ম নেন প্রতাপ ঘোষ। তিনি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করে হাসনাবাদের রামেশ্বরপুর ও তার আশেপাশে গরিবদের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসাকেন্দ্র গড়ে তোলেন। ইটিণ্ডাতে মন্দির তৈরি করেন তিনি। বাংলাদেশের যশোরে কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের হরিনারায়ণ ঘোষ পরে বসিরহাটের পুরপ্রধান হন। ঘোষবাড়ির দানের জমিতে তৈরি হয় রামেশ্বরপুর স্কুল ও ডাকঘর।

১৯৭১ সালে এই ঘোষবাড়িতে 'নিমন্ত্রণ' ছবির শুটিং করেন তরুণ মজুমদার। নৌকোয় করে ইছামতী পেরিয়ে হিরু চলেছে পুজোয় তার পিসির বাড়ি বেড়াতে। অনুপ কুমার ও সন্ধ্যা রায় অভিনীত ওই ছবিতে রামেশ্বরপুরের জমিদার বাড়ির পুজো ঘিরে দুর্গাপুজোর শুটিং হয়। কাজের সূত্রে এই পরিবারের বেশিরভাগ সদস্যই বিদেশে-বিভুঁইয়ে থাকেন। কয়েকজন অবশ্য এখনও রামেশ্বরপুরেই রয়ে গিয়েছেন। তাঁরা নানা ক্ষেত্রে কৃতি। এঁদের মধ্যে রয়েছেন পলাশ, মিন্টু, প্রসূন, সঞ্জয়, অঙ্কিত, শান্তনু, সুদীপ্ত, গৌতম ও প্রদীপ্ত। পরিবারের প্রবীণ সদস্য নির্মল ঘোষ ও বিশ্বরঞ্জন ঘোষের বয়স ৮০-র কোঠা পেরিয়ে গেছে। ঘোষবাড়ির দুর্গাপুজোর সময় পরিবারের সদস্যরা গ্রামের বাড়িতে মিলিত হওয়ার চেষ্টা করেন। এই বাড়ির দুর্গাপুজোর আবহ অবশ্য কয়েক বছর হল বদলাতে শুরু করেছে। এক বিদেশি ব্যাঙ্কে কাজ করা তরুণ সদস্য তুহিন ঘোষ ছোটো থেকেই রামেশ্বরপুরের বাইরে। তুহিনের কথায়, 'দীর্ঘ ১৯ বছর আমি গ্রামের বাড়ির পুজোয় যেতে পারিনি। দু'বছর আগে পুজোয় রামেশ্বরপুরে গিয়ে প্রথমে 'ঘোষদের পুজো' নামে একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খুলে সবাইকে পুজোয় যোগ দিতে ডাক দিই। দারুণ সাড়া পাই।' একটা পারিবারিক ট্রাস্ট তৈরি করে জমিদার বাড়ির সংস্কার ও তাকে পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছে জমিদারবাড়ির উত্তর প্রজন্ম। তুহিন জানান, 'আমাদের বাড়ির ছাদে উঠলে ইছামতীর ওপারে বাংলাদেশের লোকরা নদীর পার ধরে হেঁটে-চলে বেড়াচ্ছেন তা দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের বাড়ির প্রায় পেছন থেকেই সীমাসুরক্ষা বাহিনীর ক্যাম্প শুরু। ইছামতী নদীতে ঠাকুর ভাসানের সময় মাঝ নদীতেই দুই বাংলার মিলন উপভোগ করার মতো। জমিদার পরিবারের সবাই একসঙ্গে হলে এই গ্রামের উন্নয়ন করা সম্ভব আর তাই-ই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।' সম্প্রতি সারা গ্রামে কংক্রিটের রাস্তা তৈরি হয়েছে।

এটা এখন আর শুধু জমিদার বাড়ির পুজো নয়, সারা এলাকার বাসিন্দাদের পুজো। উত্তরপুরুষদের হিসাব অনুযায়ী, ৩০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই পুজো চলছে। এই পুজোর কিছু বিশেষত্ব রয়েছে যা পরিবারের রোজকার আচার পালনের সঙ্গে জড়িয়ে। প্রতিপদে (মহালয়ার পরের দিন) লক্ষ্মীর আসন পাতা দিয়ে পুজো শুরু হয়। তারপর ষষ্ঠী পর্যন্ত চণ্ডীপাঠ চলে। ফল বলি দেওয়া হয় প্রতিদিন। তুহিন ঘোষের কাছ থেকে জানা গেল, রথের দিন কাঠামো পুজো করে জমিদার বাড়ির একচালার দুর্গাপ্রতিমা তৈরির কাজ শুরু হয়। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষে পিতলের গামলায় বর্ষার জল ধরে রাখা হয় আর ওই জল দিয়ে পুজোর সময় মা দুর্গাকে স্নান করানো হয়। তবে এই ক'দিন মায়ের কাপড় বদল করা হয় না। দশমীর দিন উমা যখন শ্বশুরবাড়ি রওনা দেন তখন রীতি হল তিনি স্নান না করে খেয়ে যাবেন। শুধু বাড়ির ছেলেরাই মাকে কাঁধে করে নিয়ে গিয়ে ইছামতীতে বিসর্জন দেবেন। সেই রীতি মেনে ঘোষ পরিবারের সব বিবাহিতা মেয়েরা এখনো শ্বশুরবাড়ি যান স্নান না করেই। দুর্গাপুজো-সহ যেকোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে ঘোষ পরিবারের পুরুষদের সঙ্গে মহিলাদের সক্রিয় অংশ নেওয়া এই পরিবারের সংস্কৃতি। ঘোষ পরিবার চিরকাল নারীশক্তির জয়গান করে। এই পরিবারের চোখে নারীশক্তি দেবীরই রূপ, তাই সব শুভ কাজে পরিবারের মেয়েদের সামনে রাখা হয়। এখানে পরিবারের মেয়েদের সামনে রেখে রথ টানা হয় আর দুর্গা প্রতিমা গড়ার সময়ও নারী-পুরুষের মিলিত প্রয়াস দেখা যায়।

স্থানীয় বাসিন্দাদের বিশ্বাস, ঘোষবাড়ির মা দুর্গা খুবই জাগ্রত। এখানে প্রচুর লোক মানত করেন। তাঁদের সেই মনস্কামনা পূর্ণ হলে দণ্ডি কাটেন বা সাধ্যমতো গয়না দেন দেবীকে। কথিত রয়েছে, আগে শূন্যে বন্দুকের গুলি ছুড়ে জমিদার বাড়ির পুজোর সূচনা হত। যদিও এখন আর সেই রীতি নেই। বিজয়া দশমীতে ঘোষবাড়ির মেয়ে-বউরা মেতে ওঠেন সিঁদুর খেলায়। তারপর আন্তর্জাতিক সীমানায় ইছামতীতে নৌকায় করে প্রতিমা ঘুরিয়ে সূর্যাস্তের পর বিসর্জন দেওয়া হয়। এবছর ঘোষবাড়ির ঐতিহ্যময় পুজোকে থিম করে পুজোর গান লিখেছেন গীতিকার তন্ময় চক্রবর্তী। গানের সুর করেছেন ও গেয়েছেন সপ্তক সানাই। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন আরেক প্রতিভাময়ী শিল্পী রূপা চ্যাটার্জি দাস। গানের থিম 'মায়ের চোখে ভবিষ্যৎ'। এই উদ্যোগ বসিরহাট মহকুমায় এই প্রথম হচ্ছে। দুর্গাপুজোর পাশাপাশি জমিদার বাড়িতে সাড়ম্বরে রাস ও রথ উৎসব হয়। ওই সময়ে এখানে রীতিমতো মেলা বসে যায়।

রামেশ্বরপুর ঘোষ জমিদার বাড়ির তুহিন ঘোষ বলেন, 'আমাদের একটাই লক্ষ্য, এলাকার উন্নয়ন ও জমিদার বাড়িকে হেরিটেজ ও পর্যটনকেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা।' তাই জমিদারবাড়ির সংস্কারের লক্ষ্যে চলছে কর্মযজ্ঞ।

বিপ্লবীদের জমায়েতের উদ্দেশ্যেই প্রথম সর্বজনীন পুজোর শুরু

কলকাতার সিমলা অঞ্চলের মহেন্দ্র গোস্বামী লেনে বিপ্লবী অতীন্দ্রনাথ বসুর বাড়ি। তাঁর বাড়িতে মাঝেমধ্যেই থাকতেন সুভাষচন্দ্র বসু। তাঁর নির্দেশেই এই বাড়িতে শুরু হয় কলকাতার প্রথম সর্বজনীন দুর্গোৎসব। পুজোর ঐতিহ্য বেড়েছে। শুধু আড়ালে থেকে গিয়েছেন বিপ্লবী অতীন্দ্রনাথ বসু। লিখেছেন — সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯২৬ সাল। ব্রিটিশ শাসনে পরাধীন ভারত। দেশ স্বাধীনের লক্ষ্যে সক্রিয় বিপ্লবীরা। নানা গোপন আস্তানায় চলছে ব্রিটিশ বিরোধী কাজ। ঠিক তখনই কলকাতাতেও বিপ্লবীদের জোটবদ্ধ করতে একটা কনভেনশনের দরকার ছিল। কিন্তু ব্রিটিশদের ফাঁকি দিয়ে জমায়েত কার্যত অসম্ভব। ফন্দি আঁটলেন স্বয়ং নেতাজী। তাঁর নির্দেশেই বিপ্লবী অতীন্দ্রনাথ বসুর বাড়িতে শুরু হয় কলকাতার প্রথম সর্বজনীন দুর্গোৎসব। এতে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জমায়েতও সহজ হয়। সঙ্গে দেশমাতৃকার জন্য মাতৃ আরাধনা শুরু।

সিমলা স্ট্রিটের যুবকদের স্বাস্থ্যচর্চায় জোর দিয়েছিলেন বিপ্লবী অতীন্দ্রনাথ বসু। নেতাজীর নির্দেশে তিনি পুজো আয়োজনের দায়িত্ব নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। পুজোর খরচ উঠল বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাঁদা তুলে। তখন এই ভাবনা ছিল একদম নতুন। হোগলা পাতার বেড়া দিয়ে তৈরি হয় সিমলা ব্যায়াম সমিতির মণ্ডপ। এভাবেই অতীন ঘোষের হাত ধরে যাত্রা শুরু হয় কলকাতার প্রথম সর্বজনীন পুজোর। পুজোয় এসে সবার সঙ্গে পাত পেড়ে খেয়েছিলেন নেতাজী। একবার বিপ্লবীদের জমায়েত টের পেয়ে পুজো বন্ধ করে দেয় ব্রিটিশ সরকার। বেশিদিন নয়, দু'বছর পর ফের চালু হয় পুজো। একচালা দুর্গামূর্তি থেকে পাঁচটি চালচিত্রে আলাদা করে ভেঙে দেবীমূর্তির প্রচলন ওই সময় থেকে। দেবীমূর্তির চালচিত্র বদলে দেওয়ায় রক্ষণশীলদের ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়ে পুজো কমিটি। সমালোচনা থামাতে ১৯৩৯ সালে ফের নেতাজী পুজোর উদ্বোধন করেন। সব কাজের নেপথ্যে ছিলেন একজন কারিগর অতীন বসু। জমিদারবাড়ি, বারোয়ারি পুজো পেরিয়ে সর্বজনীন পুজোই এখন মেইনস্ট্রিম। তবু আড়ালে থেকে গিয়েছেন, কলকাতার সর্বজনীন পুজো সংস্কৃতির প্রবর্তক বিপ্লবী অতীন্দ্রনাথ বসু।

ক্লীব সমাজ

সুবিমল সরকার

সামাজিক জীবনযাপনে কেবলমাত্র স্বার্থবোধের দ্বারা আমরা পরিচালিত হই। সত্য চিরকাল আমাদের বোধের অন্তরালে থাকে। অন্যের মহানতা আমরা পছন্দ করি, সেটা নিয়ে সরবও হই, কিন্তু কোন মহান কর্মে আগ্রহী হওয়ার আগে বুঝে নিই আপন স্বার্থ সুরক্ষিত রাখার হিসেব।

কিছু লোক নিশ্চিতই সমাজের স্বার্থে কিছু করেন, সেটা শতাংশের হিসেবে নগন্য। সরকারি কর্মচারি থেকে রাজনৈতিক নেতা, শিক্ষক থেকে ডাক্তার, ব্যবসাদার থেকে পুলিশ, উকিল থেকে বিচারক-সর্বত্র সবাই আপন স্বার্থ সুরক্ষিত রাখায় ব্যস্ত। এই ব্যস্ততার অন্যতম কারণ হল, মৌলবাদী শক্তির দ্বারা পরিচালিত বিশ্বে সকলেই বিপন্ন। এই বিপন্নতা মানুষকে বিচ্ছিন্ন করেছে আদর্শ নামক মূল্যবোধ থেকে।

সম্প্রতি সলমন রুশদির ৩৬ বছর আগে লেখা একটা বইয়ের বিবরণের কারণে যে আক্রমণ সংঘটিত হল, তাতে কি ওপরের কথাগুলোর সমর্থন মেলে না? আমি নিশ্চিত যাঁরা বইটি পড়েছেন অর্থাৎ সামান্য কয়েকহাজার লোক, তাঁরা সকলেই যথার্থ অনুধাবন করেছেন। আর যাঁরা পড়েননি সেই মৌলবাদী কোটি কোটি লোক দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছেন। একদল বলছে ফাঁসি চাই, অন্যদল বলছে মুক্তি চাই। এরা কেউ বইটা পড়েনি। অথচ সকলেই নির্বিবাদে মৌলবাদী শক্তির কাছে নত হয়ে আছে।

পশ্চিমবঙ্গের অগণিত প্রগতিশীল মানুষ প্রতিদিন হাজার হাজার পত্রিকায় আপন মহানতা প্রকাশ করেন। হোয়াটসঅ্যাপ ও ইউটিউবে এরা মহানতা প্রচার করেন নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে।

২০০৮ সালে প্রগতিশীল বাম সরকার, যারা কোনো দুর্নীতিতে জড়িত ছিলেন না, তারাই তসলিমাকে চুলের মুঠি ধরে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বের করে দিয়েছিলেন।

আজও তিনি বন্দি জীবনযাপন করেন। কোনও প্রগতিশীল মহান মানুষকে প্রতিবাদ করতে দেখিনি। অথচ এই ভদ্রমহিলা সারাজীবন আপন লোকের মধ্যে দিয়ে মানবতার প্রতিষ্ঠার কথাই লিখে গেছেন। ভণ্ডামি হল আমাদের জাতীয় চরিত্র, মিথ্যাচার আমাদের স্বপ্নগত। অজুহাত আমাদের অবলম্বন।

অন্যকে মহান হতে বলার শিক্ষায় আমরা শিক্ষিত। কেবলি অন্যের মহানতার উদাহরণ তুলে ধরে, নিজের মহানতা প্রকাশের চেষ্টা করি। যে মানুষ ভাত, কাপড়, চিকিৎসা, শিক্ষা, বাসস্থানের নিশ্চয়তা পায় না, সে স্বাধীনতা ধুয়ে কি জল খাবে? মহানদেশের মহান ৭৫তম স্বাধীনতা দিবসে যারা উদ্বেল তারা তো সবাই গুছিয়ে নিয়েছে। বিবেকের দেখা পাওয়া যেত যাত্রাদলের পালায়। সে কারণে বোধহয় যাত্রা দলও বিলুপ্তির পথে। সবাই অন্যকে বলছে ভালো থাকুন, অথচ বিপন্ন এক শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তনে যে সেটা কতটা সম্ভব, সে কথা কেউ মুখেও আনছি না।

প্রেমিক কখনও মারা যায় না

সুবোধ সরকার

যতদিন চন্দ্রদোষ থাকবে
যতদিন চাল ডাল থাকবে
যতদিন জ্যোৎস্না থাকবে
যতদিন কালোজিরে থাকবে
যতদিন শিউলি থাকবে

ততোদিন আমি বেঁচে থাকব। ততোদিন ততোদিন ততোদিন
ততোদিন আমি ভালোবাসব।
যে ভালোবাসে সে কখনও মারা যায় না।

বাংলা ভাষা

অনিমেষ ভট্টাচার্য

ইছামতীর দুপারে দুটো প্রাচীন বট
ঝুরি নামিয়েছে দুই বটই
আঁধারে ঠাওর করে দেখি
এপারের জল ওপারে ছুঁয়েছে তট।

এপারে বাউল, ওপারে হয়তো সারি
টিয়ার ঝাঁক যায় ফিরে আসে
সীমানা তো নেই দুই আকাশে
আয়েশা এপারে, ওদিকে অপর্ণার বাড়ি।

বাংলায় তারা ভালোবাসে, ঘর বাঁধে
দুপারেই 'জল পড়ে পাতা নড়ে'
একুশের ভোর ওপারে, এপারে
দুখজাগানিয়া গেয়ে দুপারেই কেউ কাঁদে।

ওদিকের রোদ এদিকে কুয়াশা মাখে
এদিকে সন্ধ্যে মনসার থানে
ওদিকে সকাল ভোরের আজানে
বাংলার চোখে বাংলাই চোখ রাখে।

আমার শেফালী

নিতাই দে

কনের সাজে সন্ধ্যা বেলায়
বসে আমার শেফালী
সঙ্গে আছে সঙ্গীরা সব
জুঁই, টগর মালতী
কাছে যেয়ে আদর করি
সুগন্ধে ভরপুর
মাঝে মাঝে কানে আসে
সানাইয়ের সুর।।
লগ্ন আছে শেষ রাতে
থাকতে হবে বসে
ধন্য হলো আমার জীবন
তোমায় ভালোবেসে।
রাতের নিঝুম কেটে
ব্রহ্ম মুহূর্ত এনে
কি হলো শেফালীর আমার
ঢলে পড়ে মায়ের কোলে
বিধাতার নিঠুর বিচার
কে বুঝিতে পারে
সে তো নেই একা হলাম
ভালোবেসেছিলাম যারে
দু-হাতে নিলাম তুলে
অশ্রু ঝরে নয়নে
শেফালীকে নিবেদন করি
দেবতার চরণে।

সোহাগ স্মারক

শুভম চক্রবর্ত্তী

চুমু
অমলিন আস্তরণ
পরাজিত সৈনিক তবু ভালো
পাহাড়ি নদীর কাছে স্থবির সমর্পণ
এক অভেদ্য চক্রগুহে অকাতর প্র
সময়ের বোঝাপড়া ক্ষীণ
আপ্রাণ আবেগমেঘ
চির নবীন
চুমু
প্রেম বাজারে মজবে হরিণ মণ
তোমার আমার-সোহাগী আদিম সুখযাপন।

রাতের পৃথিবী

শতাব্দী চক্রবর্তী

রাতে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে
এমনকি তারারাও যখন বালিশে মাথা দেয়
ঝিঁঝিঁপোকাগুলিও ঝিমোয়,
ডানা দিয়ে আগলে পাখির মাও ঘুমোয়
তখন আমি জেগে থাকি।

আশ্চর্য এক নেশা ধরায় এই রাত,
সারাদিনের ব্যস্ততায় পৃথিবীটাকে তেমনভাবে
ছুঁয়ে দেখা হয় না চোখ দিয়ে।
তাই রাতে অনুভব করার চেষ্টা করি--
পৃথিবীর ঘুর্ণনের গতি।

গাছের দল সারে সারে দাঁড়িয়ে সব নিদ্রামগ্ন,
একটি পাতাও নড়বড়ে নয়।
সমস্ত বাড়ী-রাজপথ-গলি নীরবে রাত্রিযাপনে ব্যস্ত।
রাতে জানালাভরা আকাশ যখন দেখি
তখন সেই সুধারস আমাকে নেশা ধরায়।
মাতাল চোখে এযেন অন্য এক,
পৃথিবীর সাথে মোলাকাত।

রাতের এই পৃথিবী আমার ভীষণ প্রিয়,
এর সাথে বন্ধুতা অনেকদিনের।
তখন কলেজবেলায় কত গল্প করেছি এই রাতের সাথে
চারদিক শুনসান, নিঝুম।
এই রাত বয়ে আনে কত ভাবনা, কত রোমন্থন
লতিয়ে ওঠে কত কবিতা, কত ছন্দ।

আসলে আমরা দিনকে সময় দিতে গিয়ে
রাতটাকে শুধুমাত্র আরামের সময় হিসাবে ধার্য করি।
কিন্তু রাতের পৃথিবী বড়ই মনমোহনী,
আবার যদি রাতখানা হয় বৃষ্টির।

হৃদয় হর্ষ

পূবালী চট্টোপাধ্যায়

জানালার রেলিঙ বেয়ে
ঝরে পরে টুপটাপ বৃষ্টির জল
দুহাতের তালুই ঘসে মেখে নিই মুখ অবয়বে
হৃদয়ের প্রকোটে জড়ো হয় 'নাদ'
জীবনের বিন্যাস্ত সোপানে
ভীর করে আসে অতীতের 'কঙ্কাল' কখনও বা
হিসেবের খাতা! সে তো চিত্রগুপ্ত জানে—
আমি শুধু জানি অর্বাচিত বর্তমান,
আর জানি মায়ের হাতের মাখা ভাত!

ধাঁধা

শুভ্রাংশু শেখর পাত্র

দেখছি ঐ খররোদ্রে আকাশ।
চোখ ঝলসে যাওয়া প্রান্তরে,
বর্বর লু'র নাচন।

পড়ন্ত রোদে শোক বা আনন্দের
আসরে শীতবৃষ্টি;
পাল্টে যায় না ঋতুর অনুভূতি!

শীতের তপ্ত আলয়ে গজিয়ে ওঠা
একরাশ অহংকারী মেঘ
ডানার ছায়া, আর সপাৎ সপাৎ।

অন্ধকারের গায়ে, জোনাকিরা আসে
বিভীষিকার কোল ঘেঁষে পার হয়
বড়ো মায়াময় ।।
সব রঙ্গের স্বাদ নিতে
কর্মব্যস্ত বেপরোয়া অন্দরের,
হাতে সময় কম।
সহস্র উজান ঠেলে, প্রশ্নের পিচ্ছল তীরে,
সব অনুভূতি যদি এক হয় !
তবে সে কে !

কথন

অমিতাভ সরকার

আপনি কেমন আছেন? অনেকদিন
আপনার সাথে কথা হয় না। শরীর
ভালো আছে তো! শেষবার বলেছিলেন
কিছু ভালো লেখা লিখে গুছিয়ে রাখতে

যাতে শারদীয়া সংখ্যায় দিতে পারি।
পুজোটা আসছে। লিখেই চলেছি আমি।
কিছু কথা বলবার দরকার ছিল।
রিংটোন সে তো বেজে ওঠে থেমে গেল।
আমার এই এক দোষ। যা বলতে চাই
বোঝাতে চেষ্টা করি নানাবিধ সম্ভারে
কথাটা না বলে থাকতে পারি না তাই
ভুল করে ফেলি শব্দের ব্যবহারে
আপনি নিজেও বোঝেন সেই সময়,
কথা বলা ভুল বোঝা ভুলো দুনিয়ায়।

হয়তো কবিতা নয় তবু

কাজল আচার্য

হয়তো আঙ্গুলের ফাঁকে শেষ হয়ে যাবে জল।
নদীর গভীরতা মাপতে মাপতে
সাঁতার ভুলে যাবে নাবিক
তবু চরাচরে প্রচলিত নাম থেকে যাবে এক।
বর্ষার ইচ্ছা নিয়ে মাঠ, মুঠো ভর্তি বীজসহ
ঘুমোবে শরতের মেঘ।
অবাক ইচ্ছার ঠিক নীচে আছড়ে পড়বে ঢেউ।
একদিন জাহাজ আসবে
নোঙর ফেলবে ঘাটে
চিন্তায় চিন্তায় ছোটো নদী
গা ধুয়ে দিয়ে যাবে প্রাত্যহিক পূজারীর।
শাখা পরিষ্কার করতে করতে
বর্ষা জল বাড়ে পরিশ্রমী জনপদে।
সন্ধ্যার সামান্য আড়ালে
হারানোর অভিপ্রায় লিখবে যুগল।
(কারেক্টেড)

অভিমান

রুমকী দত্ত

যখন,
তোর অভিমান আকাশ ছুঁয়ে যায়
আমি তখন স্তব্ধ হয়ে থাকি
অসহায় মন ভীষণ কান্না পায়
আদরবাসায় জড়িয়ে তোকে রাখি।
রাখতে রাখতে দিন কেটে যায় বেশ
সকাল হলেই কাজের ভীষণ তাড়া
প্রেমিক মনের আবেশমাখা রেশ
ছড়িয়ে পড়ে দুয়ার থেকে পাড়া।
পাড়ায় পাড়ায় শিক্ষার ঘোরপ্যাঁচ
মাথায় ঢোকে না, চুপটি করে রই
ইডেন গার্ডেনে সন্ধ্যার কোনো ম্যাচ
দেখতে যাবি আমার সাথে সই?
সইতে সইতে ক্লান্ত হয়েছে নদী
একাকীত্ব হারিয়েছে পথ বাঁকে
অনিচ্ছাতেও হাতটা ধরিস যদি
সাদা কালো ছবি রামধনু রঙ আঁকে।
আঁকবে আবার জীবনের জয়গান
প্রেম খুঁজে নেবে দীপান্বিতার আলো
ভুলে থাকি চল দু'জনেই অভিমান
ভালোবাসাময় বাসাটুকু হোক ভালো।

রূপকথার রক্ষিতা

তমাল লাহা

এখন সময় নয়, হে ক্রুদ্ধ, শোনো, এখনই যুদ্ধে যেও না।
পৃথিবীর অপার্থিব রূপকথা, তারা,
দেখো, সব সত্যি হয়ে গেছে।

কেউ আর কাল্পনিক বিশ্বাসের মৌতাতে নেই।

মুগ্ধতা, অবাক হয়ে আর যেন কোনোদিন উদাত্ত হবে না,
টপ টপ করে জল ঝ'রে পড়ে গরীব পাতায়,
মুড়ে রাখা সভ্যতার ছাতা এক কোণে নষ্ট হয় রোজ,

কেউ তাকে আজ আর ভুলেও খোঁজে না।

তবুও যুদ্ধে তুমি আদৌ যেও না। বলি শোনো,
তার চে' না হয় এসো, মুখোমুখি প্রত্যয়ে বসি,
অন্ধকারে দু'জনের দুইচোখ বাঁধা।
মাঝখানে বিষাক্ত পতাকা, থাক গাঁধা,

যেন এক অবিশ্বাস্য সম্পর্কের ধাঁধা।

দেখি, কে আগে ছিঁড়ে নেয় জয়?
কার কাছে রক্ষিতা হবে, আসলে যে নয়!

জাহাঁপনা

অমিতাভ রায়

তুমি নাবালিকা সদ্য ফুলের সম্ভার
বাগিচায় ফোটা রেশম দরদী শীতে
আকাশের থেকে চোখ লেগে বিধাতার
এভাবেই প্রেম খুন হয় পৃথিবীতে
আমি চিরকাল ভণ্ড, ডাকাত, ঈশ্বর
মিথ্যা মিথ্যা চোখে ধুলো দিই জনতার
আমাকেই মানে যত চাটুকার, শিষ্য
এখনও অনেকে পুজো করে জড়তার
আমি বিনিময়ে ছুড়ে দিই মদ, মাংস
জাগতিক যত পাপে তুলে নিই মানা
জবাইকে বলি সবচেয়ে বড় পুণ্য
বিধাতার চোখে আমিই কী জাহাঁপনা!

চেনা জানা

কাজল সেন

করোনাকালে মানুষ চেনা হল কত
কত রকমের মানুষ
কিছুটা জানা হল নিজেকেও
চেনা ও জানার বিপ্রতীপে এতটা যে
অচেনা ও অজানাও ছিল
চেনা জানা হয়ে গেল তার সাথেও

অন্ধকারে কাটে আমার দিন
অন্ধকারে কাটে আমার রাত
শুধু দিন ও রাতের সন্ধিকালে
জ্বলে ওঠে যে আলো
সেই আলোয় চেনা হয়ে গেল
কত শত মুখ
মুখোশের আড়ালে মুখ
মুখেরও আড়ালে থাকে
আরও কত যে মুখ

করোনাকালে অনেক মানুষ জানা হল
নিজেকেও জানা হল অনেকটা
প্রতিপক্ষ হয়ে নিজের বিরুদ্ধেও
যুদ্ধ ঘোষণা করা হল

সুখ পাখি

মধুমিতা হালদার

এই ভাবেই কি ভিজে যাওয়া মন,
পাখির ডানার মতো ঝটকায়?
মন্দবাতাস কোণঠাসা হাওয়ায় এক নিমেষে
ইচ্ছেদের লোপাট করে দেয়।
হঠাৎ আগুন জ্বলে ওঠে বুকে, ঘৃণ্য দাবানলের
লাল টকটকে ফুলঝুরির মতো।
আষাঢ়ের মেঘে, বিদ্যুৎ চমকায় পুকুরের পাড়
ভেজে সুখ বৃষ্টির দাপটে।
হতাশায় বৃষ্টিরা, খেলে বেড়ায় ঘুমিয়ে থাকা খড়ের চালে।
ভালোলাগা জেগে উঠে খুঁজে বেড়ায় এক
ভালোবাসার বাসর ঘর।
দুঃখেরা আড়ালে থেকে নিজেদের বন্দী করে
শখের খেলাঘরে আসন পাতে।
আশা জাগে বেদনাকে বিদায় জানিয়ে খুশির
বাগানে গোলাপের চাষ করতে।
স্মৃতিগুলো বার বার সত্যেকে খুঁজে নিজের
কষ্টকে বিদায় জানায়।

শুধু তোমার জন্যে

প্রদীপ আচার্য

শুধু তোমার জন্যে কন্যা আমার
বিষণ্ণ ভুবন
শুধু তোমার জন্যে কন্যা আমার
ভাবনা অনুক্ষণ।
শুধু তোমার জন্যে কন্যা আমার
কষ্ট নিরবধি
চোখের গভীরে গোপন রাখি
অশান্ত এক নদী।
শুধু তোমার জন্যে কন্যা আমার
অপেক্ষা অনন্ত
যাক না ফিরে হিরণ্ময়ী
হাজারো বসন্ত।

হাওয়ার ঘর

সুরভী চ্যাটার্জী

আমি আছি আমার শরীরের বর্ণমালায়
আর আত্মা মৃদুসূর্যের দেশে
তৃণের আগায় ছিল জীবন
আর কোমলতাশূন্য তুমি নিখুঁত হাতে ধনুকের
ছিলায় মৃত্যু পেতে দিলে।

রক্তের টাটকা গন্ধে বেহুশ হলাম আমি।

কালো চাঁদ
আর আমি নিখোঁজ হলাম নৈঃশব্দ্যের ভরাটবুকে
মাথা রেখে।

থেমে গেল ট্রেন শেষ স্টেশন চত্বরে
আর শেষমেষ শুরু হল জাঁকহীন
জীবনের পুনরুত্থান আগুন ফেলে ছুটন্ত ধোঁয়া
মেঘের হেফাজতে।

আকাশের গ্রামে হাওয়ার সংশ্লেষ
অশরীরী অভ্যুত্থান
হাওয়ার ঘর হাওয়ার বাসর
আর আমার অতীতের কোনো চাবি ছিল না।

ঝঞ্ঝার ঝঙ্কার

তানিয়া হাজরা

চম্পক বনপথ, জৈষ্ঠ্যের বায়,
অজগর নিঃশ্বাস, তপন বিলায়,
স্তম্ভিত পিকদল, মূর্ছিত বনতল,
তাপক গ্রীষ্ম, ধ্বজা শূন্যে উড়ায়---
তৃষিত অক্ষি, মেঘ ডম্বরু চায়।

অম্বরে ঘনদল , সম্বরে ক্রন্দন,
স্তম্ভিত হিল্লোল, নাই বায়ু স্পন্দন।
নিশাকর সজ্জিত গম্ভীর গগনে----
শঙ্কিত কম্পিত গ্রহকূল মগনে।
তিমিরবিদারি বারি হও অবতীর্ণা,
তৃষিত শিহরপ্রাণ বিরহে তে দীর্ণা।
এসো নব সঞ্জীবে এসো নব হরষে,
আষাঢ় বিদায়ী রথে, শাওনের পরশে।

উৎত্রাসে ঊদ্বাহু বনরাজি কুঞ্জ,
শঙ্কিত সম্বৃত, গ্রহ - তারা - পুঞ্জ।
কুরঙ্গ লাঞ্ছিত চন্দ্রিল দৃষ্টি,
সংসৃত অবিরত, অবিরল বৃষ্টি।
ঝংকৃত সঙ্গীতে, মন্দ্রীত ছন্দে,
মৃত্তিকা উত্থিত, উন্মনা গন্ধে।

মৃদঙ্গে মন্দ্রিত অম্বর ধরণী,
বিধৌত বনপথ, পশুপতি ঘরণী---
আশ্বাসে বিশ্বাসে মাভৈ মা চিন্তঃ,
বরাভয় সম্পাতে, মূর্ত অচিন্ত্য।
নটরাজ জাগ্রত প্রলয় আনন্দে,
চন্দ্রমা বসুমতী, অর্য্যমা বন্দে।।

নবম ধাঁধা

হাননান আহসান

ভাবতে ভাবতে কত কী যে, কত খেলা
কত পাখি উড়ন্ত, দূর
এপাশ-ওপাশ করতে করতে বৃহন্নলা
সবুজ সবুজ দস্যু ময়ূর।

নাচতে নাচতে রঙিন চুড়ি, কত ফেনা
ভোরের হাওয়া, আলতা মেদুর
আকাশ-মাখা গন্ধ জাগে, চমৎকরণ
বেঁধে দিচ্ছে নিঘন্টু, সুর।

হাসতে হাসতে কখন গেলাম, পৌঁছে গেলাম
নড়ানির মাঠ, খেজুর পুকুর
হৃদয়জুড়ে ভাসতে ভাসতে নবম ধাঁধা
চোখের সামনে জঙ্গুলে সুর।

চলো পাল্টাই

তনুশ্রী চক্রবর্তী

মনের মাঝে উথালপাথাল
চলছে খেলা মেঘবালিকা
ধূসর রঙের ঘোমটা পড়ে
এড়িয়ে গেল সেই বাহিকা ।।

সবার সাথে চলছে যে তার
সারাদিনের ঝোড়ো হাওয়া
হাতের কাছে এলোমেলো
হয়ে আছে নতুন পাওয়া ।।

সে যে আছে সুদূর পারে
আকাশ মেঘের সুরলোকে
তারই সাথে জড়িয়ে আমি
পড়ছি বাঁধা কবির ছকে ।।

পুরাতনও ছিল নূতন
হাতের কাছের ছবিগুলি।
কেন এমন ঘনঘটা?
ছন্দপতন হচ্ছে খালি।।

আকাশ কালো মেঘে ঢাকা
বাতাসও তাই কালি মেখে
ইচ্ছে করে আড়ি ক'রে
আছে যে সে দূর আলোকে ।।

এবার বুঝি হাত বাড়াবে
সুয়োরানি --- দুয়োরানি।
শিউলি ঝরা প্রভাত রবি
আসছে যে গো আগমনী।।

মন খারাপের দিন বুঝি শেষ
কথার পিঠে শুধুই কথা ।
যে কথাটি বললে প'রে
চমকাবে মন, পাবে ব্যথা ।।

সে কথাটি পাল্টে এবার
চলো গো সব সহজ পথে।
হাতে হাতে হাতটি ধরে
এগিয়ে চলি রূপকথাতে।।

বধূ

সুপ্রীতি দত্ত

সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন,
গৃহকর্মে নিপুণ পাত্রী।
শুভবিবাহ সুসম্পন্ন,
সংসার পর্ব আরম্ভ।
কর্পোরেশনের বাঁশি,
কলিংবেল এর শব্দ,
রান্নার ছেকছুক,
চুড়ির ঝনঝন,
সব শব্দেরা,
নিত্যদিনের সঙ্গী।
চতুর মানুষ সব,
বোঝেনা ভালোবাসা।
অপমান অবহেলায়,
বেঁচে থাকে জীবন।
দূরত্বে বসে,
শরীর থেকে মন।

সে বুকেতে

শান্তিব্রত চট্টোপাধ্যায়

একটা অমল বুক
একটা কমল বুক
সে বুকেতে বারিধারা
সে বুকেতে সৃষ্টিসুখ।
একটা নদীর বুক
একটা যদির বুক
সে বুকেতে সাঁঝতারা
সে বুকেতে ধুকপুক।
একটা গভীর বুক
একটা স্থবির বুক
সে বুকেতে টুপটাপ
সে বুকেতে মলোমাস।
একটা নারীর বুক
একটা ঝারির বুক
সে বুকেতে এপিটাফ
সে বুকেতে সর্বনাশ।

সমানাধিকার

দেবাশিস দত্ত

সমানাধিকার নিয়ে আজকে নারী ও নারীবাদীরা
হয় সোচ্চার প্রতিবাদ
এই বিষয়ের ওপরই তাহলে উপস্থাপন করি
কিছু প্রতিবেদন ও সংবাদ।

আপনাদের কাছে আজকে আমার আছে কিছু প্রশ্ন
একটু ভেবে উত্তর দিন, চিত্ত করে শান্ত
সমানাধিকার হলে তবে কেন
বাসের সিটে মহিলা সংরক্ষণ
আবার তারাই জায়গা না পেলে পুরুষ সাধারণ সিটে
জায়গা দখল করেন যখন -তখন ।
তাহলে কি বলতে পারেন একই কাজের পৃথক ফলের
বিভেদ- বৈষম্য কেন হবে এমন?

চাকরিক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য আছে সংরক্ষণ
মিষ্টি কথায় বসের সাথে ঘনিষ্ঠতায় আবার হবেই 'প্রমোশন '।
আক্ষরিক অর্থে পুরুষেরা হল শোষণের এক উদাহরণ
বাড়িতে চাহিদা পূরণ না হলে নিঃসঙ্গ জীবন
কর্মস্থলে পারফরম্যান্স করলে তবেই 'প্রমোশন'।

বিবাহ পরবর্তীকালে শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তিসহ সমস্ত কিছুতে
নারীরা করায়ত্ত করে তার অধিকার
অথচ একজন পুরুষ কেন সব বিলিয়ে দেবে অকাতরে।
কেন সেই পুরুষ তার শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তিসহ সবকিছুতে
পাবেনা তার সমানাধিকার?
কেন এমন নিয়ম-কানুন, কেন এমন মহিলা তোষণ
তাহলে কি বলতে পারেন একই কাজের পৃথক ফলের
বিভেদ - বৈষম্য কেন হবে এমন?

বিয়ে আসলে একটা চুক্তি, যেখানে মেয়েদেরি অধিকার
পুরুষ আসলে আবেগপ্রবণ। জীবনের হয় জেরবার।
৪৯৮ এ মিথ্যে মামলায় স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ি, জেলের ভেতরে
একটা আইন এরকম হোক, মিথ্যে ষড়যন্ত্রকারী মহিলাদের বিরুদ্ধে
পুরুষরাও রুখে দাঁড়াতে পারে।
বিভেদ- বৈষম্যই বাধা হচ্ছে বারবার
তাহলে কোথায় সমানাধিকার?

বিবাহবিচ্ছেদে নারী তাঁর এবং সন্তানের খোরপোষ দাবি করে
হয়তো তাঁর পুরুষ স্বামী চাকরিটা হারিয়েছে চিরতরে
হয়তো স্ত্রীর চাকরি থাকা সত্ত্বেও দাবি করছে সবকিছু
কই কেউ তো বলেন না, আমার স্বামীর চাকরি নেই আমার
উপার্জিত অর্থ থেকে খোরপোষ বাবদ
আমি ওনাকে দেব কিছু।

পুরুষকে কি তাহলে কলুর বলদ, সুখ- স্বাচ্ছন্দ- আতিশয্য -
বৈভবের জন্য
পেষিত হবে তার জীবন।
তাহলে কি বলতে পারেন একই কাজের পৃথক ফলের
বিভেদ- বৈষম্য কেন হবে এমন?

নারী বিদ্বেষী নই আমরা কেউ
নারীদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে
আনতে হবে নতুন বিপ্লবের ঢেউ
নারীর জ্ঞান বুদ্ধি সুচিন্তিত মতামত দিয়ে
করতে হবে এর প্রতিকার
তবেই তো নারী-পুরুষ নির্বিশেষে পাবে সমানাধিকার।

একমুঠো ভাত চাই

প্রীতম মোদক

দূর থেকে দেখা যায় নাকো চাঁদের মুখ
ল্যামপোস্টের নীচে শুয়ে আছে সর্বসুখ,
নাইকো তাদের বাড়ি নাইকো তাদের ঠাঁই
তবুও ওরা ভিক্ষা করে একমুঠো ভাত চাই।

কেউ দেয় একটি আনা কেউ বা দেয় আধটি
সংসারেতে অনেকগুলো পেট এটাই তাদের ঘাটতি,
শহর কিবা পল্লি, গাছের নীচে ঠাঁই
তবুও ওরা ভিক্ষা করে একমুঠো ভাত চাই।

বাবুরা থাকেন মস্ত ঘরে, চিন্তা নাইকো তাদের
ঝড়-বৃষ্টিতে তারাই কাঁদে ঘর নাইকো যাদের,
কিবা শীত কিবা গ্রীষ্ম, ফুটপাতেই ওদের ঠাঁই
তবুও ওরা ভিক্ষা করে, একমুঠো ভাত চাই।

কোলের ছেলে কেঁদে ওঠে, দুধখানি তার চাই
পাগলী মা ভিক্ষা করে, এটাই সমাজের ছাই,
সকলে আমরা লক্ষ্য করে, এড়িয়ে চলে যাই
তবুও ওরা ভিক্ষা করে একমুঠো ভাত চাই।

তুমিও মহান, আমিও মহান, মহান সর্বজনে
এগিয়ে এসো যুগের নবীন ফুটপাতের ওই কোণে।

নির্বাণ

অরুণাংশু ব্রহ্ম

পড়ন্ত বিকেলের আলোয় কী লেখা হবে?
শব্দহীন লেখা হবে, না আলো-অন্ধকার
প্রদীপ্ত সূর্যালোকে প্রাত্যহিক রোজনামচা,
না জরা ব্যাধি মৃত্যু নিয়ে ব্যথিত জীবন,
পৃথিবীর মায়াময় জীবন, না চির নীরব দেশ,
কী লেখা হবে বিকেলের সুদীর্ঘ ছায়ায়?
এত সব ভাবনার মাঝে সে এসে দাঁড়ায়
আমার ব্যাধিগ্রস্ত অর্ধচৈতন্য শরীরের পাশে,
তার প্রচ্ছন্ন দু'হাতের শীতল কোমল স্পর্শে
মুহূর্তে জাগে অজানা অপার্থিব শিহরণ,
তখনি থেমে যায় মাটির সকল কোলাহল,
থেমে যায় বস্তুগত জীবনের সকল মায়া
অনিরুদ্ধ মনে কত কিছু ছেঁড়ে আপন খেয়ালে
খুলে যায় স্নেহ-মায়া-মমতার অটুট বন্ধন
ভালোবাসা মেলায় যন্ত্রণার কোলাহলে।
ভেসে যাচ্ছে মহানীল
শূন্যের ছায়া পথ বেয়ে
সেই অপার্থিব অনন্তে,
জন্ম নেই, জরা নেই,
ব্যাধি নেই, মৃত্যু নেই।
নেই শোক, মনস্তাপ
হতাশার বিফল ক্রন্দন অবিরল,
গ্রহ নক্ষত্রহীন অন্ধকার মহাকাশ
জীবনের গতিপথ রুদ্ধ সেখানে
না মায়ার জাল, না স্বপ্ন অন্বেষণ
না বস্তুগত পৃথিবীর মায়াময় টান,
শুধু সেই কোমল শীতল স্পর্শ অনুভব।
আলো অন্ধকারের মায়াবী খেলায়
আলো ফিরে আসে বারবার,
বস্তুবাদী পৃথিবীর মাটির টানে
রহস্যময় শীতলতার স্বস্তি অনুভব
ফিরে যায় অন্য কোথা অজানা সন্ধানে।

ব্যথিত ছন্দে ছিঁড়ে যাওয়া সব স্বপ্ন
অস্থির আগ্রহে ফিরে ফিরে আসে,
যা কিছু গোছানো ছিল একান্ত আমার
মাটির যা কিছু সুখ যা কিছু স্নেহ সম্বল,
অমোঘ সত্যের কাছে চায়না কিছুই।
অবশিষ্ট পথের আনন্দকণা মেখে
দুরন্ত আকুল প্রত্যয়ে সেই স্বপ্ন অন্বেষণ,
সায়াহ্ন-প্রহরে সূর্য্য-সুষমা খুঁজে খুঁজে
সঙ্গ সুধায় লেখা হবে ব্যথিত জীবন।

গুচ্ছ কবিতা

তাপস বৈদ্য

আস্থায়ন

আবহমানের সংস্কারে প্রেম এক মন্দির।
প্রবেশ-পথে আস্থা ও বিশ্বাস দুই দ্বাররক্ষী,
আর গর্ভগৃহে তোমার আবাস চিরকালীন।
আস্থা অর্জন ও বিশ্বাস ভঙ্গের টাগ অব ওয়ারে
আমি রেফারি সেজে বাঁশি বাজাতে ভুলে যাই।
ভালোবাসার অন্তরতম সত্যের ভিতর
বিশ্বাস জাগানিয়া সুর রপ্ত করতে চেয়ে
তোমার শরণাপন্ন হলে তুমি পাথর হয়ে যাও।
আমি নীরব শ্রোতা হয়ে শুনতে থাকি :
'পাষাণের বুকে লিখ না আমার নাম'।

আত্মায়ন

জঙ্গলের উদাস হাওয়ায়,
পাতা-মাড়ানো পথের গানে যখন
তোমাকে নিয়ে হৃদয়ের কাছে যাব,
তখন চোখ ছাড়া কোনো অলঙ্কার
তোমার শরীরে থাকবে না।

চোখই তো সেই দরজা
যার সামনে আলোর সাগর,
আর পিছনে অন্ধকারের তুমুল বৈভব।
সেই আঁধারমহিমায় তোমার আমার
দেখা হওয়া মানেই আত্ম-অনাত্মের মিল।

বর্ণায়ন

সৌন্দর্যর জন্য রঙের কাছে ঋণ স্বীকার করি।
রংদহন ও রংসহনের বেদনক্ষেত্রে অদৃশ্য সেতুর
নিজের হাতেই ভাঙা ও গড়ার বরাত আছে বলে
রংযাপনের প্রতি পলের হৃদঘাতে প্রেম টের পাই।

প্রেম আর কিছু নয়, শুধু কল্পলোকে তোমাকে
বারংবার না-পাওয়া ও হারানোর হৃদয়-সন্তাপ।

প্রেমায়ন

লুকানো পথের হদিশ জেনে নিয়ে
তোমার খোঁজে মনাঞ্চলে বেমালুম ঘুরি...।
সেখানে মনদেবী ও তোমার মিশে যাওয়া অস্তিত্বের আবহে যে গান বাজতে থাকে
হৃদয়ের মর্মরে সেটাই সত্যি বলে মেনে নিলে আবছা হয়ে আসে তোমার স্নানের দৃশ্য।
এখানেও তুমি নিরাভরণ, শুধু আকাশের মতো একটা মনই তোমাকে সালাঙ্কারা
করে রেখেছে।

অনেক অর্থ-অনর্থের মাঝে প্রেমযাপন শুধু
তোমার পথের অন্ধপর্দা সরিয়ে যেতে থাকে...।
খোঁজ অব্যাহত রেখে জীবনাট্যের কোলাজে
শুধু প্রেমের জন্য রঙের কাছে ঋণী হয়ে যাই।

অপেক্ষায়ন

অপেক্ষার দুটো দিক--
তার একপাশে যে তুমি আছো
তা বলার মধ্যে এখনও
নতুনত্ব খুঁজে পাই বলে
আমার নাবিক স্বভাব আর গেল না।

প্রেমিকদের হাতে পারানি থাকে না।
থাকলেও থাকে জীবনের কিছু
সহজ বাউন্ডুলে বোধ।

খেয়া নৌকা তোমার।

এখন বলো তা ছুঁয়ে দেখব কীনা।

বোতলের জিন

তনিমা সাহা

লাল্টুর মনটা আজ একদম ভালো নেই। মন ভালো না থাকার অনেকগুলো কারণ আছে। তবে তার মধ্যে সবচেয়ে মূল কারণ হল, জেসমিন।

আসলে হয়েছে কী, ওই যে মেইন রোডটার ওপারে যে লাল-নীল রঙয়ের বড়ো বাড়িটা আছে সেখানেই থাকে জেসমিন। সাদা-খয়েরি লোমে ঢাকা, পুরুষ্ঠ লেজ, ঝোলানো দুটো কান। সবচেয়ে আকর্ষণীয় হল তার হাঁটার স্টাইল। আর হবে নাই বা কেন জেসমিন হল একটা স্প্যানিয়েল। আর লাল্টু তো রাস্তার নেড়ি কুকুর।

রোজ যখন জেসমিনের মালকিন তাকে নিয়ে পার্কে বেড়াতে যায় তখন পেছন পেছন লাল্টুও লেজ নাড়তে নাড়তে যায়। কিন্তু গেলে কী হবে! জেসমিন তার দিকে ফিরেও তাকায় না। জেসমিনের চোখ তো সারাক্ষণ জার্মান শেফার্ড জেকবের দিকেই সেঁটে থাকে। জেকব চৌমাথার কোণায় যে সবচাইতে বড়ো বাড়িটা আছে, সেই বাড়িটায় থাকে। লাল্টু গিয়ে দেখে এসেছে একবার।

জেকবের বাবা খুব খতরনাক লোক। লাল্টু শুধু জেকবের বাড়ির গেটটা, গেট লাগোয়া পাঁচিল শুঁকছিল। কী সুন্দর একটা মিঠা মিঠা গন্ধ। তাদের আখড়ায় শুধু বাসি, পচা খাবারের দুর্গন্ধ, চারদিকে নোংরা, আবর্জনা ছড়িয়ে থাকে। মাঝেমাঝে তার নিজের গা-ও গুলিয়ে ওঠে ওই দুর্গন্ধে। আর এই বাড়িটার চারদিকে কী সুন্দর একটা গন্ধ! পাঁচিলের চারপাশ এমনকী পাঁচিল লাগোয়া রাস্তাটাও কী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। লেজটাকে ধীরে ধীরে নাড়াতে নাড়াতে চোখ বন্ধ করে আমেজ নিচ্ছিল লাল্টু। হঠাৎ অভ্যাসবশত বাঁ পা-টা পাঁচিলের দিক করে উঠিয়ে যেইমাত্র হিসু করতে যাবে ঠিক সেই সময়ে জেকবের মালিক এই এত্ত মোটা একটা ডাণ্ডা এমন জোরে কোমড়টায় মারল যে পরের দিন পর্যন্ত একটু উঠে দাঁড়ালেও লাল্টু যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠছিল। লাল্টু বুঝতে পারছিল যে ওর বাকি জীবনটা হয়তো পঙ্গু হয়েই কাটাতে হবে। কিছুদিন পর যন্ত্রণা খানিকটা কমলেও প্রাত্যহিক কাজগুলো করতে তার বেশ কষ্ট হত। খুব বেশি নড়াচড়া করলেই কোমড়ের যন্ত্রণাটা চাগাড় দিয়ে ওঠে।

বেশ অনেকদিন ধরে খাওয়া-দাওয়াও ঠিক মতো করতে পারছে না। এমনিতে রোগাসোগাই ছিল লাল্টু; এখন একদম হাড়-গিলগিলে হয়ে গেছে। এখন তো তার শ্বাস নিতেও কষ্ট হয়। মিনতি মাসি আর আখড়ার বাকিদের যত্নে এখন লাল্টুর শরীর কিছুটা ভালোর দিকে। স্বাস্থ্যও একটু ঠিক হয়েছে।

মাঝেমাঝে নিজের এই জীবনটার ওপরে লাল্টুর খুব রাগ হয়। কেন, কী দোষ করেছিল সে; যে তাকে এরকম একটা জীবন কাটাতে হল। মিনতি মাসি বলেছিল, লাল্টুর মা নাকি অনেক বড়ঘরের মেয়ে ছিল। লাল্টুর চোখদুটো আর সুন্দর লেজটা নাকি ঠিক ওর মায়ের মতো। একথা অবশ্য ঝিন্টি, মন্টিরাও বলে। লাল্টু অবশ্য সেসব অত পাত্তা দেয় না। ঝিন্টি, মন্টি বড্ড গায়ে পড়া মেয়ে-কুকুর। কোথায় জেসমিন আর কোথায় এই ঝিন্টি-মন্টি!

মাকে খুব একটা মনে পড়ে না লাল্টুর। তবে মায়ের আওয়াজটা এখনও কানে বাজে। চোখ বন্ধ করলে মায়ের কথাগুলো শুনতে পায়। খুব ছোটো বয়সে কিছুলোক খাঁচায় করে মা সহ আরো কিছু আখড়ার কুকুরদের ধরে নিয়ে গিয়েছিল। লাল্টুকে আস্তাকুঁড়টার পেছনে লুকিয়ে রেখেছিল লাল্টুর মা। আখড়ার কিছু কুকুরও লুকিয়ে পড়েছিল এদিক-ওদিক। পরে শুনেছিল এই লোকগুলো নাকি হঠাৎ করে আসে, আর আশেপাশে যত নেড়ি কুকুর থাকে তাদের তুলে নিয়ে চলে যায়। কিন্তু তাদেরকে তুলে নিয়ে গিয়ে কী করে সেটা জানে না কেউ। তবে যাদের তুলে নিয়ে যায় তারা আর কখনোই ফিরে আসে না। লাল্টুর মা-ও কখনও ফিরে আসেনি। এই আখড়ার মা-কুকুরই তাকে বড়ো করেছে।

রাস্তা দিয়ে হাঁটতে গেলে গাড়ির নীচে, বাইকের নীচে পড়ে মরে যাওয়ার সম্ভাবনা। এই ওদের আখড়ারই ওই ষণ্ডাগণ্ডা মতো দেখতে মন্টু ; সে-ও তো ওরকম একটা বড়ো গাড়িতে ধাক্কা লেগে মরে গেল। বাকিরা বলছিল ওটা নাকি মালবাহী ট্রাক ছিল। রাস্তা কাঁপিয়ে গর্জন করতে করতে আসে। পালিয়ে যাওয়ারও সময় দেয় না। লাল্টু অবশ্য খুব একটা বড়ো রাস্তার কাছে যায় না। মন্টুর ঘটনার পর তো আরও-ই যায় না। অলিতে-গলিতে ঘোরে ফেরে। খাবারের অভাব হয় না। ঠিক কিছু না কিছু পেয়েই যেত লাল্টু। মহল্লার বাকি কুকুরগুলো বলতো ওই গলিগুলো নাকি বড়লোকদের গলি। লাল্টু 'বড়লোক' মানে জানে না। তবে এইটুকু জানে যে ওসব জায়গায় খাবারের অভাব নেই। এরকমই একটা গলিতে ঘোরার সময়ই জেসমিনকে প্রথম দেখেছিল লাল্টু। তারপর থেকে জেসমিনের বাড়ির সামনে গিয়ে রোজ বসে থাকে। এদিক-ওদিক ঘুরে খেয়েদেয়ে সন্ধ্যার পর আখড়ায় ফেরে। তবে স্বভাব বড়ো বাজে জিনিস। সহজে পিছু ছাড়ে না! একদিন ওরকম ঘুরে খেতে গিয়ে একটা দেওয়াল দেখে পা তুলে যেইমাত্র হিসু করতে যাবে অমনি পিঠে একটা জোর লাথি খেল। সাথে সাথে চোখ-মুখ অন্ধকার।

পিঠটাতে বড্ড ব্যথা। একটু নড়লেই যন্ত্রণায় যেন প্রাণটা বেরিয়ে যাচ্ছে। সেদিন জেকবের মালিক ডাণ্ডা দিয়ে পিঠে মারার পর ; আবার জেসমিনের মালিকের লাথিটা ঠিক সেই একই জায়গায় খেলো। সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে এসেছিল ঠিকই আখড়াতে। কিন্তু তখনও ব্যথাটা বুঝতে পারেনি। আখড়াতে পৌঁছোনোর পরপরই আস্তাকুঁড়টার পেছনে গিয়ে হড়হড়িয়ে বমি করল লাল্টু। মাথাটাও কেমন ঘুরে গিয়েছিল। বমি করে দু'পা এগোতে না এগোতেই লাল্টু অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। যখন জ্ঞান ফিরল তখন থেকেই এই ব্যথাটা শুরু হয়েছে। জেকবের মালিকের মারটা খেয়ে একটু সুস্থ হয়ে উঠলেও জেসমিনের মালিকের লাথিটা লাল্টু হজম করতে পারল না।

পিঠের ব্যথাটা দিনদিন বেড়েই যাচ্ছে। কতদিন যে খাবার পেটে পড়েনি! তেষ্টায় গলাটা শুকিয়ে কাঠ। লাল্টু বুঝতে পারে তার সময় ফুরিয়ে আসছে। গতকাল সারারাত ধরে বৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টির জলটা চেটে খেয়ে লাল্টু তেষ্টা মেটায়। তারপর যন্ত্রণায় জর্জরিত শরীরটাকে কোনোক্রমে টেনে একটা ভাঙা ছাউনির দিকে নিয়ে যায়।

আজ গা থেকে পচা গন্ধ আসছে। নাকটা একটু উঁচু করে শুঁকে বুঝতে পারল গন্ধটা তার পিঠ থেকে আসছে। গতরাত থেকে শরীরটা খুব খারাপ। আখড়ার এক-দুটো কুকুর এসে দেখে গেছে তাকে। সবার চোখেই হতাশা। যেন সবাই বলতে চাইছে, লাল্টুর এখানেই ইতি। হতাশা এবং যন্ত্রণায় কাতর লাল্টু চোখ বুঝে একটা কোণায় শুয়ে রইল। হঠাৎ একটা চেনা গন্ধে ধীরে ধীরে চোখ মেলে লাল্টু দেখে একটা আধ টুকরো পাউরুটি রাখা রয়েছে। আর সামনে বসে আছে চুমকি। চুমকি ওদের আখড়াতে নতুন এসেছে। আখড়ার মতীপিসি চুমকিকে নিয়ে এসেছিল। বড়ো রাস্তায় গাড়ির নীচেই নাকি প্রায় চলে এসেছিল চুমকি। মন্টি, ঝিন্টির সাথে খুব ভাব চুমকির।

কিন্তু লাল্টুর সাথে কখনও কথা বলেনি। শুধু বড়বড় চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকত।

এখন চুমকি ঠিক ওভাবেই তাকিয়ে আছে। খেতে খেতে হঠাৎ লাল্টু লক্ষ্য করল যে চুমকির চোখে জল। লাল্টুর সেই অবস্থায় নেই যে এগিয়ে এসে চুমকিকে জিজ্ঞেস করবে যে তার কী হয়েছে, সে কেন কাঁদছে! খাওয়াটা শেষ হতেই লাল্টুর চোখ জুড়ে রাজ্যের ঘুম এল। সে ভাবল যে হয়তো অনেকদিন পর পেট পুরে খেয়েছে বলে ঘুম পাচ্ছে। চোখ বন্ধ করতে করতে সে দেখে দু'জন মানুষ তার দিকে একটা ঝোলা নিয়ে এগিয়ে আসছে। মুহূর্তেই তার ঘুম পাওয়ার কারণটা বুঝতে পারল লাল্টু। চুমকিই তাহলে মানুষগুলোকে ডেকে এনেছে। যেমন করে প্রতিবার এরা গাড়িতে করে আখড়ার কুকুরগুলোকে তুলে নিয়ে চলে যায়, তেমন লাল্টুকেও তুলে নিয়ে যেতে এসেছে। ঘৃণা ভরে সে চুমকির দিকে তাকায়। চুমকিকে তখন একটা মানুষ কিছু খাবার দিচ্ছে। বকশিস নিশ্চয়ই! লাল্টু সমস্ত জোর একসাথে করে পালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু পালানো তো দূর সে একফোঁটা নড়তে পর্যন্ত পারে না। ধীরে ধীরে ঘুমে লাল্টুর শরীরটা ভারী হয়ে ওঠে।

চোখ খুলেই লাল্টু নিজেকে অন্য একটা পরিবেশে আবিষ্কার করে। একটা বড়ো ঘর। খুব পরিপাটি করা সাত/আটটা উঁচু জায়গা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, দিব্যি আরাম করে ঘুমোনোর মতো জায়গা। কিন্তু এটা তার আখড়া নয়। অন্য একটা জায়গা। কান পেতে কিছু চেনা শব্দ শুনতে পায়। ধীরে ধীরে উঠে বসে। দাঁড়াতে একটু কষ্ট হচ্ছে। কারণটা খুঁজতে গিয়ে দেখে যে তার পিঠে সাদা রঙয়ের একটা কাপড় বাঁধা আছে। শুঁকে দেখল অচেনা গন্ধ আসছে। তবে পিঠের সেই ব্যথাটা নেই। সে দাঁড়াতেও পারছে। আর অল্প অল্প হাঁটতেও পারছে। আস্তে আস্তে হেঁটে সে ঘর থেকে বাইরে এসে দেখে চুমকি মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে। প্রচণ্ড বিরক্তিতে 'গররর' আওয়াজ করে চুমকিকে তার রাগটা জানিয়ে দিল। লাল্টু আরেকটু এগোতেই সেদিনের দু'জন মানুষের মধ্যে একজন এগিয়ে আসল। লাল্টু ভয়ে দু'পা পিছিয়ে গেল। কিন্তু ওই মানুষটার স্নেহের স্পর্শে বুঝতে পারল যে সে তার খারাপ কিছু চায় না।

লাল্টুর এখানে দিন ভালোই কাটছে। আখড়ার সব কুকুররা এখানেই থাকে। মতীপিসিও থাকে। লাল্টুকে সুস্থ দেখে পিসি খুব খুশি। বলে, 'ভাগ্যিস চুমকি ছিল! নইলে তোকে বাঁচাতে পারতাম না।' লাল্টু বুঝতে পারে না কেন মতীপিসি একথা বলছে।

এখানে ওর মতো আরো অনেক কুকুর আছে। যাদের হয় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল বা অসুস্থ ছিল। কিছুজনের সাথে লাল্টুর বন্ধুত্বও হয়েছে। সেখান থেকেই লাল্টু জানতে পারে যে এটা ওদের মতোদের জন্য একটা সংরক্ষিত জায়গা। নাম 'বোতলের জিন। এখানে ওদের রাখা হয়, যত্ন করা হয় এবং ট্রেনিং দেওয়া হয়। 'ট্রেনিং' কথাটার মানে লাল্টু বুঝতে পারে না। চুমকিকে সবসময় দেখে অপরাধীর মতো মুখ করে বড়বড় চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে। আজ লাল্টু নিজেই ভাবল চুমকিকে এব্যাপারে জিজ্ঞেস করবে।

তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাক কেন? সেদিন কী তুমি এদেরকে আখড়ায় নিয়ে এসেছিলে?

হ্যাঁ (মাথা ঝুঁকিয়ে)।

কেন?

বিশ্বাস করো, আমি তোমার বা তোমাদের কোনও ক্ষতি করতে চাইনি। আমাদের এখানে ট্রেইন করা হয় স্ট্রে ডগ মানে রাস্তায় যেসব কুকুর ঘুরে বেরায় তাদের খুঁজে আনার জন্য। কারণ রাস্তায় জীবন খুব বিপজ্জনক। আমার মাকেও তো এই রাস্তাতেই হারিয়েছিলাম। তখন কতই বা বয়স আমার! তখন এই 'বোতলের জিন' সংস্থার লোকেরাই আমাকে বাঁচিয়েছে, বড়ো করেছে, ট্রেইন করেছে। তোমাদের আখড়ার খবরটা পেতেই আমি তোমাদের সাথে কথা বলতে আসছিলাম। তখনই গাড়ির নীচে পড়তে পড়তে বেঁচে যাই। তারপর মতীপিসি আখড়ায় নিয়ে আসে। মতীপিসিকে সব বলি। সকলে রাজি হয়। কিন্তু তখন তুমি খুব অসুস্থ। পিসি বলে যে তুমি মানুষকে বিশ্বাস করো না। তোমার সাথে যে ঘটনা ঘটেছে তার থেকে তোমার মানুষের ওপর বিশ্বাস শেষ হয়ে গেছে। আর এদিকে তোমার শরীর দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তাই তোমাকে ওভাবে এখানে আনা হয়েছে।

হমমম, বুঝলাম। কিন্তু তুমি আমার দিকে ওভাবে বড়বড় চোখে তাকিয়ে থাক কেন?

ও তো..ও তো..।

আর কিছু না বলেই চুমকি সেখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে যায়। লাল্টু ভাবতে থাকে চুমকি হঠাৎ চলে গেল কেন? হঠাৎ একটা চেনা ঠ্যালা খেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে মতীপিসি। লাল্টু মতীপিসির সাথে অনেক খেলাধুলো করল। কথায় কথায় মতীপিসি জানায়, চুমকি নাকি লাল্টুকে পছন্দ করে। তবে লাল্টু এখন এসব নিয়ে আর ভাবছে না। জেসমিনের মুখটা এখনও স্পষ্ট তার মনে। আর জেসমিনের মালিকের মারটাও ভোলেনি সে।

এখানে অনেকদিন হয়ে গেছে লাল্টুর। এখন বাকি কুকুরগুলোর মতো লাল্টুর গলাতেও একটা বেল্ট। সংস্থার লোকেরা রোজ সব কুকুরদের গল্প শোনায়। কিছু কিছু লাল্টুর শোনা গল্প। লাল্টুর মনে হয় তার মা-ও হয়তো এভাবেই বড়ো হয়েছিল। বড়ঘরের কুকুর ছিল কিনা! তাই হয়তো মা তাকে এই গল্পগুলো শোনাতে পারত। লাল্টু এখন বেস্ট ট্রেইন্ড ডগ। অনেক অসুস্থ, আহত রাস্তার কুকুরকে লাল্টু খুঁজে বার করেছে। ওরা লাল্টুকে 'হিরো' বলে ডাকে। আর চুমকিকে 'হিরোইন'। কী জানি ওরা কি তবে লাল্টুর মনের ভাবটা বুঝে গেল!

চুমকিকে যত চিনছে ততই লাল্টুর চুমকিকে আরো ভালো লাগছে। জেসমিনের মুখটা এখন আবছা। সে জায়গাটা এখন চুমকি দখল করেছে অজান্তেই। লাল্টুর মাঝেমধ্যেই মনে হয় ভাগ্যিস 'বোতলের জিন' ছিল। মায়ের থেকে শোনা ভালো জিনের গল্পের মতোই তার ভাঙাচোরা জীবনটাকে আবার সাজিয়ে সুন্দর করে দিয়েছে।

লাল্টুর এখন মন খুব ভালো থাকে। আর কোনও দুঃখ তার মনে নেই।

মিনির রথ দেখা

প্রবীর ব্যানার্জী

মিনির আজ বড্ড মন খারাপ। আজ রথযাত্রা কিন্তু সে যেতে পারবে না। সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে, একটুও বিরাম নেই। রথ অবশ্য ওদের মজা গাঁয়ে আসতে দুপুর গড়িয়ে যাবে। কিন্তু আকাশের যা অবস্থা তাতে আজকে বৃষ্টি কমবে বলে মনে হচ্ছে না। আগে মিনি যখন আরও ছোটো ছিল তখন মা বাবার সঙ্গে যেত। এখন ওর চোদ্দ বছর এখন একাই যেতে পারে। কিন্তু মা-ও সঙ্গে যায়। গোড়া থেকেই বলি। নদীর ধারে আছে ঘোড়া গঞ্জের গাঁ। শোনা যায়, অনেক আগে এখানে ঘোড়া কেনাবেচা হত। সেই থেকেই এই নাম। মিনিদের গ্রামে একটা মস্ত দিঘী ছিল। সেটা অবশ্য মিনি কেন ওর বাবাও দেখেনি কারণ দিঘী মজে গেছে। তাই নাম হয়েছিল মজা দিঘীর গ্রাম। এখন শুধু মজা গ্রাম। বাঁ পাশের গ্রামটা উলু খাগড়ার জঙ্গল কেটে তৈরি হয়েছে তাই নাম উখড়া গ্রাম। প্রত্যেক বছর ঘোড়া গঞ্জের মন্দির থেকে ওদের গ্রামের রাস্তা দিয়ে রথ যায় উখড়া গাঁয়ের কালীমন্দিরে। উল্টোরথের দিন আবার একই পথ ধরে জগন্নাথ দেবের রথ ফিরে যায় আগের জায়গায়। আগে মিনি মা ওবাবার সঙ্গে ঘোড়াগঞ্জেও গেছে রথের যাত্রা দেখতে। সেখানে একটা মস্ত বাড়ি আছে যেটা লোকে বলে রাজবাড়ি। আসলে ওটা জমিদার বাড়ি। এখন জমিদার বংশের ভগ্নাংশ বাস করে ওখানে। রথের খরচ চালাবার ক্ষমতা তাদের কারোর নেই। চাঁদা তুলে গঞ্জের লোকেরাই খরচা দেয়। তবে রথটা থাকে ওই বাড়ির একদা ঘোড়াশালের চত্বরে। যখন প্রভুর রথযাত্রা শুরু হয় এবং বাড়ির সিংহদুয়ার দিয়ে পথে নামে তখন সকলে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে দু'পাশে দাঁড়িয়ে জয়ধ্বনি দেয় এবং একে একে সারিবদ্ধ হয়ে রথের রশি ধরে টানতে টানতে এগিয়ে চলে। সেটা দেখতে মিনির খুবই ভালো লাগত। রথ এগিয়ে ক্রমশ মজা গাঁয়ের দিকে এগোলে সেখানকার মানুষজন রথের রশি ধরে নেয়। এইভাবেই নিয়ম মেনে রথ চলে যায় উখড়া গ্রামের কালীমন্দিরে। মিনি জানে, এখন আর ঘোড়াগঞ্জে যাওয়া সম্ভব নয়। মিনির মা কুন্তী মুড়ি ভাজে, মুড়কি তৈরি করে গুড় বা তালপাটালি করে বিক্রি করে। ওর বাবা সেই সব জিনিস দূরের হাটে গিয়ে বিক্রি করে আসত। বাবা শিবু ঘরামিকে চারপাশের গ্রামের লোক একডাকে চিনত। শিবুর মতো ঘরের চাল ছাওয়ার লোক আর কেউ ছিল না। চাল ছাওয়া আর কুন্তীর তৈরি জিনিস বিক্রি করা ছাড়াও শিবু নানারকম কাজ করত। অন্য কাজ হাতে না থাকলে জেলেদের সঙ্গে নদীতে মাছ ধরতেও যেত। দু'বছর আগে এক জ্যৈষ্ঠের রাতে এমনই মাছ ধরতে গিয়ে শিবু নিখোঁজ হয়। শোনা যায়, ঝড়ে নৌকোডুবি হয়েছিল। বাকিরা সাঁতার কেটে ফিরে এলেও শিবু আজও ফেরেনি। পুলিশ অবশ্য আশা দিয়েছে, যেহেতু লাশ পাওয়া যায়নি হয়তো কোনও দূর জায়গায় ভেসে গেছে। শিবুর মতো দক্ষ সাঁতারু ডুবে যেতে পারে না। সেই আশাতেই মিনি আর কুন্তী বুক বেঁধে পথ চেয়ে আছে। নানান সমস্যা ওদের নিত্যসঙ্গী। তাতে ওরা অভ্যস্ত, কিন্তু আজ সমস্যাটা একদম অন্যরকম। শিবু ঘরামির ঘর আজ অস্তিত্ব সঙ্কটে। কয়েকদিনের টানা ঝড়-বৃষ্টিতে মিনিদের বাড়ির পাতা আর খড় দিয়ে ছাওয়া চাল ভেঙে পড়ার মতো অবস্থা। বাবা হারিয়ে যাওয়ার পর থেকে মিনি মায়ের সঙ্গে একই ঘরে শোয়। ওই ঘরে মিনির গোপাল আছে। যতই সমস্যা থাকুক গোপালের সেবায় কখনও কোনও গাফিলতি মিনি করে না। আয়োজন অবশ্য সামান্যই- বাতাসা আর জল। রাত্রে গোপালকে শয়ান দেওয়ার কাজটাও মিনি নিজের হাতে করাই পছন্দ করে। আজ দুপুরের আগেই ছাদটা আস্তে আস্তে নীচে নামছিল। হঠাৎ বিকট শব্দ করে একটা খুঁটি ভেঙে গেল আর ঘরের চালটার এক কোণ প্রায় মাটির কাছে নেমে এল। মিনি নজর রাখছিল। বিপদ বুঝে তাড়াতাড়ি গোপালকে বুকে জড়িয়ে ঘর থেকে বার করে এনেছে। পিতলের এই গোপাল মিনিকে গ্রামের বামনদিদা দিয়ে বলেছিলেন - 'নে এটা তোকে দিলাম। নিজের ছেলে মনে করে সেবা করবি, যত্ন করবি। নিজের মনের কথা গোপালকে বলবি। মন থেকে কিছু বললে দেখবি গোপাল তোর কথা ঠিক শুনবে।' বামনদিদা ছিলেন গ্রামের কথক ঠাকুরের মা। গত বছর চৈত্র মাসে দিদা অবশ্য দেহ রেখেছেন। কিন্তু মিনি তাঁর কথার অন্যথা কখনও করেনি। কুন্তী অবশ্য তোষক, চাদর, বালিশ ও অন্যান্য দরকারি জিনিস আগেই সরিয়ে এনেছে।

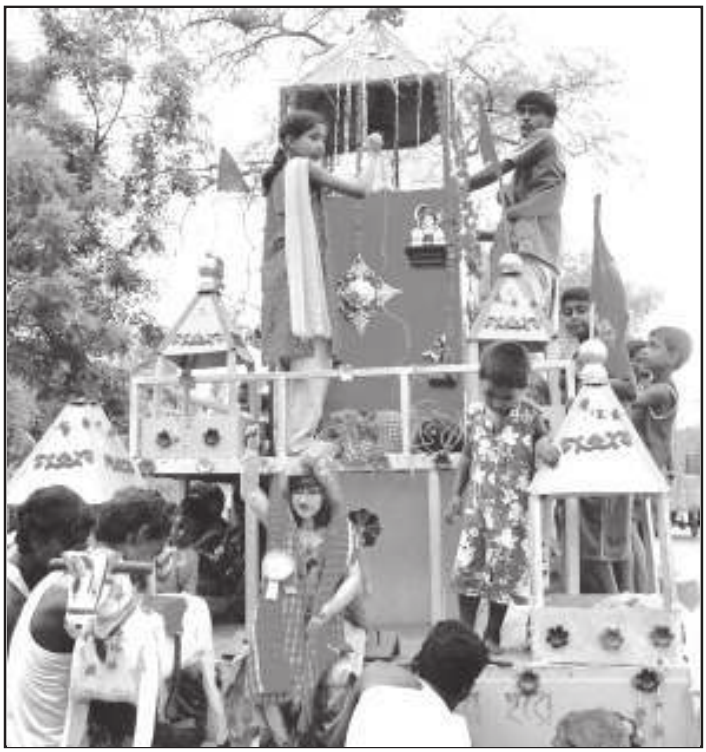

মিনিদের বাড়ির সামনের দিকের দাওয়াটা বেশ চওড়া আর বড়ও। দাওয়াটা টিনের চাল দেওয়া তাই বৃষ্টি তেমন ক্ষতি করতে পারেনি। দাওয়ার একদিকে কুন্তীর রান্নাঘর যেখানে মুড়ি ভাজা, বাতাসা, মুড়কি প্রভৃতি করা হয়। এখন কুন্তী নিজেই ভাজে আবার নিজেই গিয়ে হাটে বিক্রি করে আসে। ওটাই তাদের রুজি রোজগার। মিনির মনে ক্ষীণ আশা ছিল, যদি বৃষ্টি কমে আর মিনি অন্তত একবার গিয়ে ওদের গাঁয়ের রাস্তার প্রান্তে দাঁড়িয়ে প্রভুর রথ যাওয়াটা দেখতে পারে। গোপালকে সেকথা সে সকাল থেকেই বলছে। কিন্তু বিকেল পর্যন্ত অবস্থার কোনও উন্নতি হয়নি। ধীরে ধীরে নীলচে বিকেল কালচে হল। আঁধার গভীর হয়ে এল। মিনি বুঝল রথ দেখার আর কোনও আশা রইল না। গ্রামে রাত্রি তাড়াতাড়ি নামে। হালকা কিছু খেয়ে মা ও মেয়ে শোওয়ার আয়োজন করতে লাগল। দাওয়ায় শোওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। তাই দু'জনে সেখানেই মাদুরের ওপর চাদর বালিশ নিয়ে শুয়ে পড়ল। ঠিক হল, পরদিন সকাল হলেই গ্রামের লোকজনকে ডেকে ঘরটা খাড়া করার চেষ্টা হবে। এব্যাপারে এখানকার মানুষজন পরস্পরের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল ও সাহায্যও করে। মিনি ঠান্ডা আবহাওয়ায় তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমের মধ্যেই মিনি শুনল, একটা মিষ্টি বাঁশির সুর যেন কানে বাজছে। রাত তখন ক'টা হবে মিনি জানে না। কারণ ওদের কাছে ঘড়ি নেই, মিনির ঘুমটা ভেঙে গেল। ওর মনে হতে লাগল কেউ যেন ওর পাশে বা খুব কাছে ঘোরাফেরা করছে। মিনি উঠে বসল। ওর মা পিঠে হাত বুলিয়ে বলল —'নতুন জায়গায় শুয়ে ঘুম আসছে না। তুই শুয়ে পড়, আমি তোর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।' মিনি অল্প সময়ের মধ্যেই আবার ঘুমিয়ে পড়ল। আবার সেই বাঁশির শব্দ, এবার যেন আরও কাছে আরও স্পষ্ট। কতক্ষণ এভাবে কেটেছে মিনি জানে না, আবার উঠে বসল। দেখল, মা অঘোরে ঘুমাচ্ছে। সারাদিন মা যা পরিশ্রম করে রাতে আর জেগে থাকতে পারে না। মিনি চোখ বন্ধ করে ঘুমাবার চেষ্টা করল। 'আমায় রাতটা একটু তোমার কাছে থাকতে দেবে গো; শুনছো, একটু সরে শোওনা। আমি তোমার পাশে একটু বসব'। এমনটা শুনে হঠাৎ মিনি চোখ খুলল। অন্ধকারে চোখটা সয়ে যাওয়ার পর দেখল ওরই বয়সী একটা মেয়ে দাওয়ার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। করুণ মুখে আকুতি জানাল, রাতটুকু শুধু বসতে দাও আলো ফুটলেই চলে যাব। মিনি বুঝতেই পারছে না যা দেখছে সেটা স্বপ্ন না সত্যি! সম্বিত ফিরলে বুঝল সত্যি। অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, তুমি কে গো? এত রাত্রে এলে কী করে! তোমাকে এই গাঁয়ে আগে কখনও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না। সে বলল, আজই এসেছি গো, কদিন পরেই চলে যাব। আমরা বিকেল বেলায় এসেছি। তারপর একটু ঘুরে দেখছিলাম। ঘুরতে ঘুরতে এখানে চলে এসেছি, আমার দাদারাও আছে। যা বৃষ্টি একটু বসতে পারলেই হবে। কুন্তীর কখন ঘুম ভেঙে গেছে। মিনি খেয়াল করেনি। হঠাৎ পাশ থেকে বলল, তোমরা এ গাঁয়ে কার বাড়িতে এসেছিলে বাছা? মেয়েটি শান্ত স্বরে উত্তর দিল, না গো পিসি, আমরা এ গাঁয়ে থাকি না, থাকি অনেক দূরে। পাশের একটা গাঁয়ে এসেছিলাম। তারপর হাঁটতে হাঁটতে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এখানে পৌঁছে গেলাম। মিনি আগেই ওকে দাওয়ায় উঠে আসতে ইঙ্গিত করেছিল। মেয়েটি এবার গুছিয়ে বসল। 'পিসি' সম্বোধনে কুন্তীকে খুবই খুশী করেছিল। কুন্তী বলল, তা বাছা, তোমার দাদারা কোথায়, এত বৃষ্টিতে বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? মেয়েটি পিছন ফিরে ডাক দিতেই মা, মেয়ে দু'জনেই দেখল ষোলো-সতেরো বছরের একটা ছেলে এগিয়ে আসছে। মাথায় পাগড়ি বাঁধা। খালি গায়ে কাপড় জড়ানো। দূরে গাছের তলায় আরেকটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। কাছে এসে পাগড়িধারী বলল, পিসি বোনের কাছে সবই শুনেছো। আমরা দুই ভাই। তোমার বাড়িটা ঘুরে দেখলাম। পিছনের দিকে খুঁটি ভেঙে চাল নেমে এসেছে। আমি কানু ঘরামি, দাদার সঙ্গে মিলে তোমাদের চালটা ঠিক করে দেব। তোমরা শুধু বোনটাকে একটু বসতে দাও। কুন্তী ব্যস্ত হল—না না, এত রাতে তোমরা ওসব পারবে না। সামনের জঙ্গল থেকে গাছ কেটে খুঁটি বানাতে হবে। রাতে জঙ্গলে শিয়াল তো আছেই সাপও আছে। ছেলেটি হেসে দু'হাত তুলে আশ্বাস দিল। তারপর দাদাকে ডেকে নিয়ে জঙ্গলের দিকে চলে গেল। যাওয়ার আগে কুন্তীর কাছে কাটারি আর কুড়ল চেয়ে নিয়ে গেল। দাওয়ায় বসে ওরা গাছ কাটার শব্দও পেল। কুন্তীর দুশ্চিন্তা দেখে মেয়েটি ভরসা দিল-ওদের জন্য ভেব না, ওদের কোনও বিপদ হবে না। একটু পরেই দু'ভাই ফিরে এল। তিনজনে শব্দ পাচ্ছিল বাড়ির পিছনদিকে কিছু কাজ হচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ পরে ছেলে দুটো সামনে এসে দাঁড়াল- পিসি হয়ে গেছে, এখন আর কোনও ভয় নেই। এই ঘর আর পড়বে না। বড় ভাই আস্তে বলল, পিসি কিছু খাবার আছে আর একটু জল। কুন্তী ব্যস্ত হয়ে পড়ল, একে অতিথি তায় খুব বড়ো উপকার করেছে। বলল, রান্নাঘরে মুড়ি, বাতাসা আর মুড়কি আছে তাই খেতে হবে বাবা। সকলেই বলল খুব ভালো। মিনিকে বলল, থালা এনে দিতে। মিনি গোপালকে সঙ্গে নিয়ে শুয়েছিল। তাই গোপালকে একটা চৌকির ওপর রেখে তবে উঠল। মেয়েটির প্রশ্নের উত্তরে মিনি জানাল, ওদের ঘরটা বিপজ্জনক অবস্থায় ছিল আর যেখানে সে নিজে নিরাপদ নয় সেখানে সে গোপালকেও রাখতে পারে না। শুনে কানু বলল, তোমার ভক্তি, তোমাকে সব বিপদ থেকে রক্ষা করবে। থালায় করে মুড়ি বাতাসা দিয়েছিল কুন্তী। তিনজনে কিছুটা খেতে খেতেই ভোরের আলো দেখা দিল। ওরা ব্যকুল হল ফেরার জন্য। একটা নতুন গামছা চেয়ে নিয়ে খাবারটা বেঁধে নিল। যাওয়ার আগে কানু মিনিকে বলল, আমাদের আশ্রয় দিলে, খেতে দিলে তোমাদের সব ভালো হবে। কোনওদিন অভাব হবে না। আর তোমার বাবাও ঠিক ফিরে আসবে। এই বলে ওরা জঙ্গলের পথে রওনা দিল। মিনিও মাকে নিয়ে উখড়া চলল রথ দেখতে। পথে প্রিয় বন্ধু ঝুমার সঙ্গে দেখা। চোখ বড়ো বড়ো করে সে বলল- জানিস, ভোর রাতে বামুনকাকা উঠে রথ ঠিক আছে কিনা দেখতে গিয়ে দেখে, রথে দেবমূর্তি নেই। হইহই কাণ্ড, খোঁজাখুঁজি চলছে। আমি যাচ্ছিলাম তোকে বলতে। মিনি জানাল, সে রথ দেখতেই যাচ্ছে। সবাই মিলে রথতলায় এসে দেখল খুব ভিড়, গাঁয়ের প্রায় সব লোকেই হাজির হয়েছে দেখতে কোথায় জগন্নাথদেবের মূর্তি। মিনিরা কাছে এসে দেখল, দুই ভাই বোনের সঙ্গে জগন্নাথদেব রথের ওপরেই বিরাজমান। বামুন কাকা বোঝোবার চেষ্টা করছে যে সত্যিই দেবমূর্তি ভোরের সময় ওখানে ছিল না। মিনি কাছে গিয়ে প্রণাম করল। ওর নজর গেল রথের উপর ছড়ানো কিছু মুড়ি আর ভাঙা বাতাসার দিকে। মিনি একদম রথের গা ঘেঁষে দেখল পিছনের চাকার কাছে কী একটা পরে আছে। কাছে গিয়ে দেখল, আরে এযে সেই গামছাটা যেটা করে কানু মুড়ি বাতাসা বেঁধে এনেছিল। মিনি সব বুঝতে পারল। সাজো হয়ে তিন ভাইবোনকে নমস্কার করে গামছাটা তুলে নিয়ে চলে এল। মনে মনে গোপালকে বলল, আজ তোমায় সন্দেশ দেব। তুমি এলে কিন্তু আমি চিনতে পারলাম না।

ইন্দ্রিয় কথন

সুবল দত্ত

আমার দেহ নদীর বেগ থাকে না
আমি কেমনে বাঁধব কয় মোহনা
কাম জ্বালাতে জ্বলে মরি
কই হোলো রে উপাসনা
— লালন ফকির

চোখের পলক ফেলতেই এবার দীর্ঘ এক পথের সীমানায়। আমার মতোই অজস্র কাতারে কাতারে নতুন পথে নেমে পড়ছে। এই পথের নাম বার্ধক্য। পথের শেষে পারাবার। এই পথ দিয়ে এক-একটি অঙ্গ ত্যাগ করতে করতে যেতে হবে, এই নিয়ম। তবু হুঁশ নেই। চোখ ধেয়ে যাচ্ছে পর্ণোতে, মুখের ওপর নিষ্কাম পর্দা। নিম্নঅঙ্গে উচাটন। কিডনি লিভার হৃদয় ত্রাহি ত্রাহি তবু জিভে বিশ্বখেকো রসনা। এমনিই রসালো তৃপ্ততামুখী কান চামড়া ও নাক। মন খুঁজে বেড়ায় এমন রসালো সুখ যেটা চুষতে চুষতে শেষটায় অব্যর্থ গাটার মল। কিন্তু সে বোঝে না। একেই কি বলে মায়া?

কিন্তু মানুষ বিবশ। প্রকৃতি আমাদের এইভাবেই তৈরি করেছে। আমরা এই দেহের কথা শুনতে বাধ্য। অর্বুদ অর্বুদ জীবন্ত কোষগুলি শুধু কথা বলতে পারে না বাকি সব বোঝে। প্রতিটি কোষ সময় গুনতে জানে। দেখে শোনে মনের সাথে কথা বলে কাম কামনা বোঝে। আর বোঝে অনুতাপ, আনন্দ ভয় শেষ হয়ে যাবার আক্ষেপ। শুধু মানুষ কেন, পৃথিবীর তাবড় প্রাণীর এই অনুভূতি সিস্টেম। আমরা জিভ দিয়ে রসনা বুঝি, প্রজাপতি স্বাদ বোঝে পা দিয়ে। ক্যাটফিসের চামড়ায় থাকে রসনা। আমরা চোখ দিয়ে দেখে কাম রসনা ভয় লোভ আনন্দ বুঝি, তারামাছ পুরো শরীরটা জুড়ে দেখতে পায়। বাদুড় নাক দিয়ে দেখতে পায়। তাদের চাওয়া পাওয়া স্বজন হারানোর বেদনা কিছু প্রাপ্তির আনন্দ সব সব নাক দিয়ে। চিল ও বাজপাখিরা চৌম্বক ক্ষেত্র দেখতে পায়।

কিন্তু অনুভূতির বিস্ময়কর জৈবিক যন্ত্রগুলি একটি একটি করে অসাড় বা শেষ হলেও একটি বিশেষ অমূর্ত যন্ত্র আমরণ আমাদের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে, সেটা হল মন। স্পর্শকাতর মন যখন খুব একাগ্র থাকে, তখন বিশেষ কোনো শব্দ শুনে কেউ বলে দিতে পারে, তার কাছে কী রঙের ফুল আনা হচ্ছে। একধরনের স্নায়ুর দোষ হলে সেই মানুষ রঙ দেখে বলে দিতে পারে খাবারটা মিষ্টি নাকি তেতো। অবাক কথা এই, যে মানুষটা অন্ধ, তার অনুভূতির যন্ত্র মানে, চোখ, চামড়া, কান কিছুই বস্তুর সংস্পর্শে নেই, হাতের লাঠির আগায় ঠেকতেই বুঝে যায় বস্তুর আকারপ্রকার, শক্ত-নরম, জীব-জড়। আমরা সাধারণ মানুষ অন্ধকারে কারোর গায়ে বা কোনো বস্তুতে হাত ঠেকলে বুঝে যাই, সেটির ব্যাকরণ। যে সব অনুভূতির জন্যে ওইসব বিভিন্ন যন্ত্র, আমাদের সিস্টেম মানে প্রকৃতি দিয়েছে, সেইগুলিকে মানুষ ইন্দ্রিয় নামে ডাকেন। এই ইন্দ্রিয় নামটি এখন কেউ উচ্চারণ করে না। ব্যবহারও করে না। তবে বিদেশে নার্ভ রিসেপ্টর বলে কথাটা চালু আছে। আমরা ইন্দ্রিয় নিয়ে খুব একটা ভাবি না। পাঁচটি ইন্দ্রিয়-চোখ, নাক, কান, জিভ ও ত্বক নিয়ে আমরা খুশি থাকি। বিদেশের গবেষক বাইশটি ইন্দ্রিয় নিয়ে চর্চা করেন। যেমন, সময়েন্দ্রিয়, আত্মোন্দ্রিয়, তাপেন্দ্রিয়, ভারসাম্যেন্দ্রিয় ইত্যাদি। শুধু তাই নয়, আমাদের প্রত্যেকের ভেতর অতিন্দ্রিয় ক্ষমতা আছে। যাকে ইনটুইশন বলা হয়। এটি দর্শনেন্দ্রিয় বিভাগে পড়ে। দর্শন চোখ দিয়ে হয়। আমাদের শাস্ত্রে চোখ চার রকমের। দেখার চোখ, জ্ঞানচোখ, অন্তর্চোখ, দিব্যচোখ। একটিই সার কথা, অন্তরেন্দ্রিয় জাগলেই জীবনের আসল উদ্দেশ্য সফল হয়।

বহিরেন্দ্রিয় চোখ, কান, নাক, জিভ ও ত্বক, তাদের ক্রিয়া ও স্পর্শকাতরতা চাহিদা আমরা জানি। সেসব এখানে আলোচ্য বিষয় নয়। কিছু কিছু বিশেষ অন্তরেন্দ্রিয় নিয়ে সামান্য আলোচনা করছি।

সময়েন্দ্রিয়

মনে পড়ে, আমার মা'র চোখে গ্লুকোমা হতে শেষ বয়সে বহু বছর অন্ধ হয়ে বেঁচে ছিলেন। টিভিতে তখন রামায়ণ সিরিয়াল চলত। সিরিয়াল শুরু হবার ঠিক সময়ে তিনি বলতেন টিভি চালাতে। একজন অন্ধ মানুষের এই সময়জ্ঞান কী করে হয়? বিদেশে এখন প্রাণীদের সময় অনুভূতি নিয়ে খুব জোর রিসার্চ চলছে। sense of time chronoception কী? কেমন করে সময় প্রাণীদের বিশেষ করে মানুষের ওপর প্রভাব ফেলে? সময়ের জন্য কোনো বিশেষ স্নায়ুতন্ত্র না থেকেও তা মস্তিষ্কে সাড়া জাগায়? সময়ের অনুভব এখনও বিতর্কের বিষয় এবং এসব নিয়ে অনেক রিসার্চ চলছে। কোনও সময়মাপক যন্ত্রের সাহায্য না নিয়ে সময়ের সঠিক অনুভব মানুষের কী করে হয় তেমন সঠিক আবিষ্কার এখনও হয়নি। তবে সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষের যে যথাযথ সময়ের অনুভূতি আছে তা জানা গেছে। আমরা সময়ের অনুভূতি কোনও বহিরেন্দ্রিয় দিয়ে নয়, সরাসরি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রগুলির মাধ্যমেই অনুভব করি। এর মধ্যে সেরেব্রাল কর্টেক্স, সেরেবেলাম ও বেসাল গ্যাংলিয়া উল্লেখযোগ্য। দেখা গেছে, ওই স্নায়ুকেন্দ্রের কয়েকটি অংশে বর্তমান সময়ের তথ্য সংগ্রহ করে রাখা থাকে আর কিছু অংশে ভবিষ্যতের বিশেষ কোনও সময়ের অ্যালার্ম দেওয়া থাকে। অবশ্য আমাদের শরীর অর্বুদ অর্বুদ কোষ দিয়ে তৈরি, যেসবের ভেতরে সময় ঘড়ির ব্যবস্থা আছে। তবে ওই সব

স্নায়ুকেন্দ্রগুলোতে এমন সব ঘড়ির ব্যবস্থা আছে যেগুলি সেকেন্ড মিলি সেকেন্ডের হিসেব রাখতে থাকে। কয়েকটিতে তো যুগের হিসেবও সঞ্চিত থাকে।

কিন্তু এইসব হিসেব কেমন করে, কীভাবে রাখা হয় এখনও তা আবিষ্কার হয়নি। কেননা এই ঘটনা বস্তুভিত্তিক নয়। সময়েন্দ্রিয় এতই সূক্ষ্ম ও স্পর্শকাতর যে, এর সঙ্গে ইনটুইশন বা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের তুলনা করা যেতে পারে। যে মানুষ যত সেন্সিটিভ মানে সজাগ তার তত বেশি এই ইন্দ্রিয়ের গ্রহণশীলতা। অবশ্য বয়স বাড়া, নেশাগ্রস্ত হওয়া, ভয়, উৎকণ্ঠা, ডিপ্রেশনে এই গ্রহণশীলতা কমে যায়। আলস্য, লোভ, লালসা, জ্ঞানহীনতা, অহংকার ও অতিকামও সময় জ্ঞানের বিরোধী। হেরোইন, ভাঙ, গাঁজার মতো নেশাগ্রস্ত মানুষের কাছে সময় জ্ঞান দীর্ঘ হয়ে যায়। সুখের সময় যেন দ্রুত চলে যায়। এই ধরনের অনুভূতির বাইরে সজাগ থাকলে আসল মহাজাগতিয় সময়ের জ্ঞান প্রজ্ঞাবান মানুষের হয়।

ভারসাম্যেন্দ্রিয়

ধরুন, আপনি দু'চাকা বা চারচাকা বাহন চালাচ্ছেন, দ্রুত বেগে। আপনার সামনে হঠাৎ একটা সঙ্কীর্ণ মোড়। কিংবা সামনে একটা বেগবান গাড়ি। সেটা আপনার কোনদিকে আসবে, কোনদিক দিয়ে পাশ কাটাবে তারপরেও কিছু বিপদ আছে কিনা সেটা দ্রুত এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশে বুঝে গিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া, এই ব্যাপারটি আপনার কোন ইন্দ্রিয় করে? এটাই ভারসাম্যেন্দ্রিয়। ইংরেজিতে Equilibrioception। এই ইন্দ্রিয়টি আমাদের শরীর ও মনের ব্যালেন্স রাখতে সাহায্য করে। আমাদের বেগ, ত্বরণ ও দিক পরিবর্তন, কন্ট্রোল ও সিগন্যাল দেয় মস্তিষ্কে। এই ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই আমরা মার্ধাকর্ষণ অনুভব করি। আসলে এই ব্যালেন্স ইন্দ্রিয়টি কানের ভেতরে একটি রসপূর্ণ বিশেষ কেন্দ্রতে রয়েছে। এটি দৃষ্টি, জ্ঞান ও শরীরের স্থিতি (স্থির বা বেগবান) চিন্তা শ্রবণ এইসবের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাজ করে। কিন্তু তার সিদ্ধান্ত স্বতন্ত্র। এখানেও সে মুহূর্তের সঙ্গে একীভূত হয়ে কাজ করে।

চৌম্বকেন্দ্রিয়

আমাদের অনেকের মধ্যেই এমন গুণ রয়েছে, কোনো কিছুর উচ্চতা, কত ওজন, কত মিটার বা কিলোমিটার এই পথ কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে ইত্যাদি আন্দাজে একেবারেই ঠিক ঠিক বলে দিতে পারি। কিছু কিছু বিজ্ঞানী বলেন, এটি আমাদের মধ্যে একধরনের ইন্দ্রিয়ের উপস্থিতির জন্য সম্ভব। এটি চৌম্বকেন্দ্রিয় বা magnetoceptor। আসলে ক্রিপ্টোক্রোম একধরনের প্রোটিন যৌগ অনু। যেটি নানা রূপে প্রায় সব প্রাণীর মধ্যেই বর্তমান যা প্রাণীদেহের চলন, বলন হাবভাব ইঙ্গিত ছন্দ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে। সোজা কথায় জীবনযাপনের রিদম এই প্রোটিনটি দেখাশুনো করে। এবং মানুষের মধ্যে যে ধরনের ওই প্রোটিন অনু আছে তা আমাদের দেহঘড়ি (body clock) নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। শঙ্খচিল ও উঁচুতে উড়তে পারা পাখিদের চোখে এই প্রোটিনের উপস্থিতির কারণে তারা পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র অনুভব করতে পারে। যার ফলে পাখিরা অনেক উঁচু থেকেও পরিষ্কার সবকিছু দেখতে পায়। আমাদের কিছুটা হলেও যা চৌম্বকক্ষেত্রের অনুভূতি রয়েছে, সেটার এখনও পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে। এখনো পুরোপুরি জানা যায়নি।

ক্ষুধা ইন্দ্রিয়

চক্ষু ,কর্ণ, জিভ, স্পর্শ, জনন অঙ্গ এইসব ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি পেতে আমাদের শরীরে যেমন ইচ্ছে জাগে, তেমনি খাবার খেতে বা খাবার না খেতে ইচ্ছে হওয়ার জন্যে যে ইন্দ্রিয় দায়ী সেটা হল, Esurioceptor ক্ষুধা ইন্দ্রিয়। খিদে লাগলে যেমন খাওয়ার ইচ্ছা জাগে তেমনি পরিতৃপ্তির ফলে খাওয়ার ইচ্ছে চলে যায়। খিদে পাওয়া ও খাবার খেয়ে তৃপ্ত হওয়ার কাজ আমাদের শরীরের ভিতর দুটি গ্ল্যান্ড ghrelin ও leptin করে। ঘ্রেলিনকে বলা হয় খিদে গ্রন্থিরস এবং লেপটিনকে পরিতৃপ্তির গ্রন্থিরস। এই ঘ্রেলিন ও লেপটিন রক্তের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে মাথার ভিতরে হাইপোথ্যালামাসে লেপটিন-গ্রাহকে যুক্ত হয়। তার ফলে খিদে বা পরিতৃপ্তির উদ্রেক করে।

দেখা গেছে কয়েক ঘণ্টা না খেয়ে থাকলে রক্তে লেপটিনের মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায় ও ঘ্রেলিন নিঃসৃত হয়, তাতেই আমাদের খিদে পায়। এই লেপটিনের লেপটিন-গ্রাহকে যুক্ত হওয়ার হার কোনো ত্রুটির কারণে কমে গেলে সবসময় খিদে পায়। তাই মানুষ খেতে থাকে আর তার ফলে ওবেসিটির মতো রোগের শিকার হয়। ঠিক উল্টোটা হয় ঘ্রেলিন যদি কোনো ত্রুটির কারণে বেশি নিঃসৃত হয়।

তৃষ্ণা ইন্দ্রিয়

তেষ্টা পেলে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায় এই অনুভব আমাদের সবারই। আমাদের মস্তিস্কে এই তৃষ্ণার অনুভূতি জাগায় আর মূত্রত্যাগের কোনও তাগিদ থাকে না। কিন্তু আমাদের শরীর কী করে জানতে পারে যে শরীরের ভেতর তরলের ঘনত্ব, আয়তন, অসমোটিক প্রেসার ইত্যাদির পরিবর্তন হয়েছে? বিজ্ঞানীরা বলেন, এই ক্ষেত্রে একটি ইন্দ্রিয় আমাদের দেহ অভ্যন্তরে কাজ করে। যার নাম osmoceptor বা তৃষ্ণা ইন্দ্রিয়। বিশেষজ্ঞরা বলেন, শরীরের ভেতরে জল কমে যাওয়ার মতো পরিবর্তন দেখা ও তৃষ্ণার অনুভূতি জাগানোর কাজ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের হাইপোথ্যালামাসে অবস্থিত থদ্দন্চ এবং ত্রণ্ঠথ নামের দুটি প্রধান রিসেপ্টর বা গ্রাহক করে। এরাই দেহাভ্যন্তরের তরলের উপরোক্ত পরিবর্তনগুলো রক্ত পরিবহণ ব্যবস্থা থেকে শনাক্ত করে এবং আমাদের তৃষ্ণার অনুভূতি জাগায় ও সেসঙ্গে আর্জিনিন ভেসোপ্রেসিন নিঃসরণের সংকেত প্রদান করে। সুতরাং এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই গ্রাহক অঙ্গ দুটিই প্রধানত আমাদের তৃষ্ণেন্দ্রিয়ের কাজ করে।

মলমূত্র ত্যাগের ইন্দ্রিয়

আমরা যাকে নেচারস কল বলে থাকি, বড়ো কিংবা ছোটো বলে বা আঙুল তুলে ইশারা করি সেই কর্মটিরও অনুভূতি না আসলে টয়লেটে যাই না। মলমূত্র ত্যাগ করার ইচ্ছা জাগার জন্যেও আলাদা একটি ইন্দ্রিয় রয়েছে তার নাম excretioceptor, দেখা গেছে মূত্র ও মল ত্যাগের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক বিদ্যমান; যেমন- মূত্র নিষ্কাশনের ঐচ্ছিক নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত পেশী এবং মল নিষ্কাশনের ঐচ্ছিক নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত পেশী একসঙ্গেই সংকোচন হতে পারে। কিন্তু মূত্র নিষ্কাশনের সময় একসাথে দুটিই শিথিল (relax) থাকে। যখন urinary bladder ভর্তি থাকে না তখন তার মধ্যে চাপ কম থাকে। কিন্তু যখন মূত্রথলি প্রায় পূর্ণ হয়ে যায় তখন তার ভেতরে চাপের ফলে

পেশীগুলোর স্বাভাবিক সংকোচনে ব্যাঘাত ঘটে ও মূত্রথলির দেওয়ালে অবস্থিত স্নায়ুগুলি সংজ্ঞাবহ নিউরোনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে সেরিব্রাল কর্টেক্সে ম্যাসেজ পৌঁছোয় এবং মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা হয়। ঠিক তেমনই যখন মলাধার প্রায় পূর্ণ হয়ে যায় তখন তার ভেতর উচ্চচাপের উদ্ভবের ফলে পেশীগুলোর স্বাভাবিক সংকোচন কর্মকাণ্ডে ব্যাঘাত ঘটে যার ফলে মূত্রথলির দেয়ালে অবস্থিত নার্ভগুলোতে স্টিমিউলেশান হয় এবং নিউরোনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে পৌঁছায় এবং আমাদের মল ত্যাগের ইচ্ছা হয়।

রসায়নেন্দ্রিয় কিছু খাবারের গন্ধ বা স্বাদ পেয়ে আমরা তাকে গ্রহণ বা বর্জন করি। তার কারণ তা থেকে কিছু রসায়নিক পদার্থ আমাদের শরীর সনাক্ত করে এবং এই কাজটি করে রসায়নেন্দ্রিয় বা Chemoceptor এর মাধ্যমে। রসায়নেন্দ্রিয় আসলে কিছু রিসেপ্টর যেগুলো রাসায়নিক পদার্থের উদ্দীপনা সংকেতে পরিবর্তন করতে পারে। ঘ্রাণেন্দ্রিয় এবং স্বাদেন্দ্রিয়ের গ্রাহকগুলোই হচ্ছে প্রধান দুই শ্রেণির রসায়নেন্দ্রিয়। তবে এছাড়াও আমাদের দেহের অভ্যন্তরীণ কিছু সংজ্ঞাবহ নিউরোন রাসায়নিক সংকেতকে ক্রিয়া বিভবে পরিবর্তনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের মেডুলা (medulla) অঞ্চলকে নির্দেশ প্রদান করে থাকে যেটি স্টেরয়েড, ওষুধ, লবণ, কার্বনডাই-অক্সাইড ইত্যাদির পরিমাণও মাপতে পারে। বমির উদ্রেকের সাথেও রসায়নেন্দ্রিয় জড়িত। আরেকটি অন্তরেন্দ্রিয় আছে যা আমাদের অগোচরে ব্রেনের ভিতরে স্বইচ্ছায় আসে। কারো কারো জীবনে একেবারেই আসে না কারোর বা এক-আধবার আসে তবে সেটা তার বিষয়প্রাপ্তির জন্যে। সারা বিশ্বে এটি ইনটুইশন নামে পরিচিত। তবে কেউ কেউ একে অন্তর্জ্ঞান অন্তর্দৃষ্টি বলে। কেউ বলে gut feeling, বাস্তব প্রমাণ বা সচেতনতা ছাড়া অন্তরের অনুভূতি দিয়ে কোনো বিশেষ জ্ঞান যা মস্তিষ্ক থেকে আপনাআপনি বেরিয়ে আসে তা হল অন্তর্জ্ঞান। এই অন্তরেন্দ্রিয়ের অবস্থান ব্রেনের বিশেষ অনুভূতি কেন্দ্র এমিগডালাতে বলে জানা গেছে। জ্ঞানীরা একে অন্তর্দৃষ্টি বলেন আর এই শব্দটিকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেন। যেমন অজ্ঞাত জ্ঞান, অভ্যন্তরীণ অনুভূতি, সচেতন যুক্তির প্রয়োজন ছাড়াই সহজাত কিছু বোঝার ক্ষমতা। কিছু গণিতবিদ, জাদুকর, অধ্যাত্মিক গুরু যারা পরহিতের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন, চিরস্মরণীয় কবি ও চিত্রকারের এই অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা দেখা গেছে। অবশ্য আমাদের প্রত্যেকের এই ক্ষমতা রয়েছে, আমরা কখনোই বুঝিনা বা অনুশীলন করিনা।

উপরোক্ত ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়ে সজাগ হয়ে তাদের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আমরা যদি নিয়ন্ত্রণে রাখি তবে আমরা সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠতে পারি।

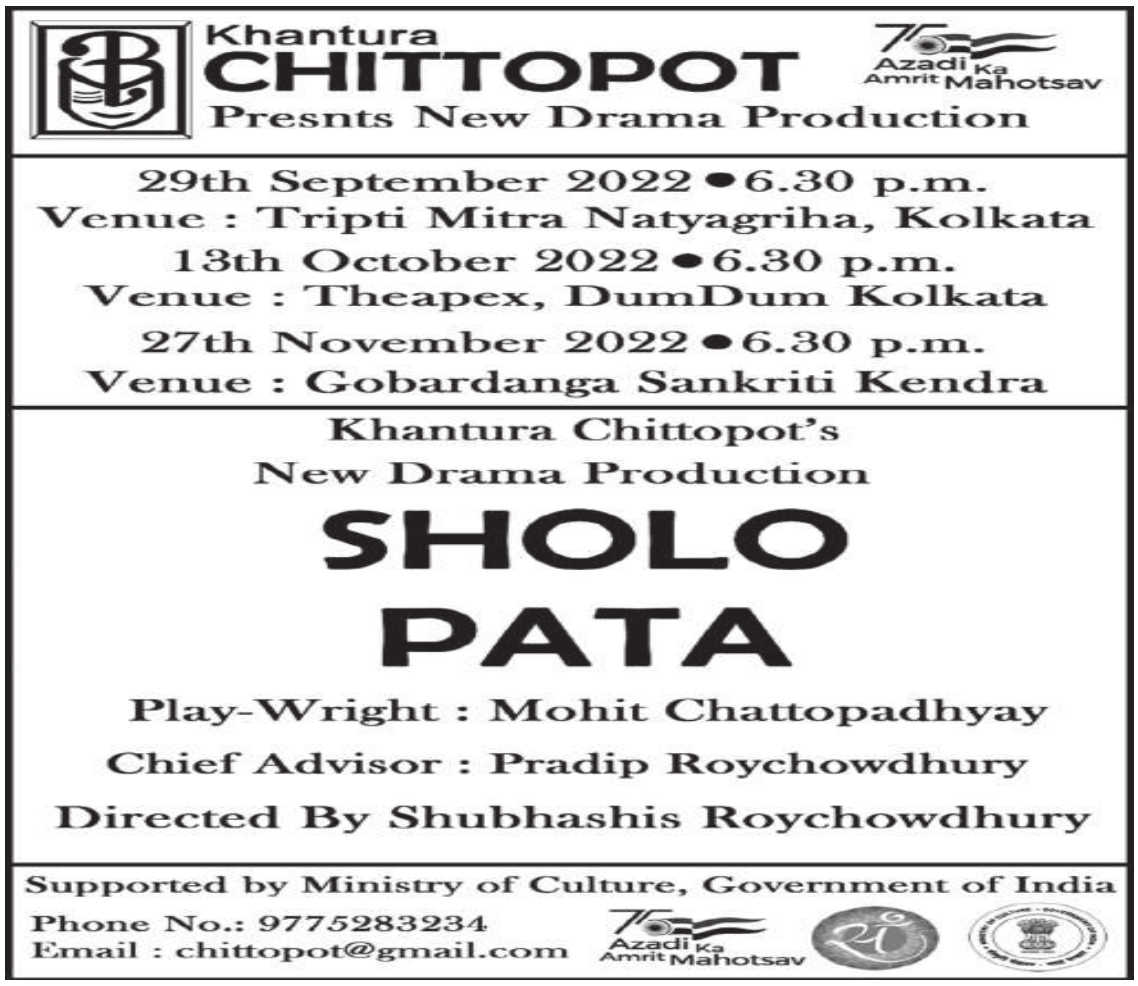

র‍্যাট ট্রাপ

ভূপাল চক্রবর্তী

শ্রীকান্তর লম্বা চেহারাটা বাঁদিকে সামান্য কাত হয়ে থাকে। ব্যাপারটা স্বাভাবিক। খুবই স্বভাবিক। কারণ তার বাঁদিকের কাঁধে ঝোলে একটা কালো চেনকাটা ঝোলা ব্যাগ। ব্যাগের ভেতরে ছোটো ছোটো প্যাকেটে ভরা বিষের চাঁদমালা। ইঁদুর, ছুঁচো, পিঁপড়ে, আরশোলা, টিকটিকি এমনকী মশা, মাছি সবার মৃত্যু তার ব্যাগে গুছিয়ে রাখা আছে। ব্যাপারটা মানুষের নজরে আনার জন্য ওই বাঁ কাঁধেই অনেকটা বাঙালিবাবুর শাল ঝুলিয়ে রাখার কায়দায় প্যাকেটের নমুনাও ঝোলে পিঠের পেছন থেকে সামনে বুকের পাঁজর অবধি। আবার ওই বাঁ হাতেই শ্রীকান্ত একটা ব্যাটারিচালিত মাইক বাগিয়ে শহরের এ মাথা থেকে ও মাথা, এই লেন থেকে সেই লেন অথবা বাইলেন থেকে বাইলেন চক্কর কাটে যখন, তখন তার চটির বাঁ দিকের খয়ে যাওয়া অসমান পদক্ষেপে একটা ঘষটানির শব্দ হয় এবং তাকে দেখলে পথচলতি মানুষের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে শ্রীকান্ত বাঁদিকে কাত হয়ে আছে ঈষৎ।

তার মাইকের ব্যাটারি কমে আসে ইদানিং যখন সূর্য মাথা ঝুঁকিয়ে খানিক গঙ্গার দিকে হেলে যায়। ব্যাপারটা হালে শুরু হয়েছে। ব্যাটারির আয়ু বুঝি কমে আসছে। চার্জ দিলেও বেশিক্ষণ থাকে না। অনেকদিন ব্যাবহার না করার ফলেও হতে পারে। লকডাউনের সময় দিনের পরদিন বাড়ি বসে কেটেছে। এখন ব্যাটারি কেনার পয়সা নেই। কোনো ইঁদুর বা ছুঁচো বিষ খাবার পর মৃত্যুর আগে যেমন ঝিমিয়ে আসে, ঠিক তেমনই ব্যাটারি কমে এলে মাইকটা সেরকম হয়ে যায়। সমস্যাটা হয় অন্য জায়গায়। ব্যাটারি কমে এলে শ্রীকান্তর গলাটা কেমন খনা শোনায়। তারই ফল কিনা কে জানে, ক'দিন ধরে লক্ষ্য করছে সে, বিকেলের পর বিক্রিবাটা বেড়ে যায় আচমকা। যদিও বিরাট কিছু বিক্রি যে সারাদিনে হয় তা নয় তবু বিকেলের পর থেকে বিক্রি বাড়ে। হিসেব করে দেখলে ছুঁচো বা ইঁদুর বিকেলের পরই আস্তানা থেকে বেরোয়। ক্রেতাদের ওই সময়েই বিষের কথা বেশি করে মনে পরার কথা। এটা তার বাস্তব অভিজ্ঞতা। শ্রীকান্ত অগত্যা মাইকটা ব্যাগে ঢুকিয়ে নেয় সূর্য হেলে যাচ্ছে দেখে। এবার খালি গলায় চিৎকার করে বিক্রি করার পালা। দিন পনেরো হল এভাবেই চালাচ্ছে শ্রীকান্ত। লঞ্চঘাটের দিকে জায়গাটা সরু হয়ে জেটিতে মিশেছে। শ্রীকান্ত সেখানেই বাড়তি মাইকের ভারে আর একটু বেশি বাঁদিকে কাত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। ঘিঞ্জি জায়গাটায় লোকের ভিড় বেশি। নদী পার হয়ে যাতায়াত করা মানুষের ভিড়ে শ্রীকান্তর খালি গলা মানিয়ে যায়।

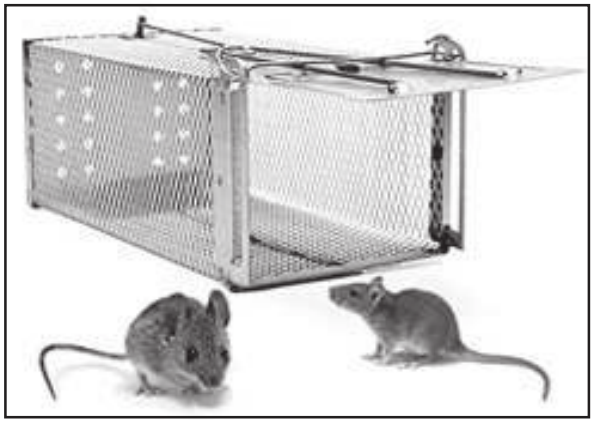

মাত্র পাঁচ টাকায় ইঁদুর মরবে, ছুঁচো মরবে, আরশোলা মরবে, টিকটিকি মরবে। কথাগুলো ভিড় হওয়ার সাথে সাথে শ্রীকান্ত মুখস্থ বলার মতো আউরে চলে, তবে নীচু গলায়। পথচলা মানুষের মুখ দেখলে সে বুঝতে পারে কে কিনবে কে কিনবে না। যে কিনবে তাকে শ্রীকান্ত বিষ প্রয়োগের নিয়মটা বাতলায়। বলে, ছোটো ছোটো আটার গুলি করে কিম্বা পাউরুটির সাথে একটু মেখে ঘরের কোণে রেখে দেবেন। পরদিন সকালে দেখবেন সব শেষ। একটা শুকনো চেহারার লোক শ্রীকান্তর কাছে এসে দাঁড়ায়, পাঁচটা প্যাকেট দেন দেখি। ঘরের বাইরে মরবে তো? শ্রীকান্ত বলে, বেশিরভাগ বাইরে গিয়ে মরে তবে নেংটি ইঁদুরগুলো অনেক সময় ঘরেই মরে পড়ে থাকে। ওরা গেরস্থ বাড়িতেই থাকে তো, তাই। কিন্তু আপনাকে দুটোর বেশি দেওয়া যাবে না। পুলিশের নির্দেশ আছে। লোকটা অবাক হয়ে তাকায়, মানে? মানে কিছুই না অনেকে ভুল করে ফেলে তাই। শ্রীকান্ত লক্ষ্য করেছে, হোমড়া-চোমড়া গোছের লোক কেউ এসব কেনে না। কেন? তাদের বাড়িতে কি ইঁদুর, ছুঁচো কিছুই নেই! ক'দিন আগে শ্রীকান্ত কাগজে পড়েছে বাকিংহাম প্যালেসের কিচেনে নাকি প্রচুর ইঁদুরের উৎপাত হয়েছে। সেগুলো নাকি সব কাছাকাছি খেত খামার থেকে আসছে। বাকিংহাম প্যালেসে ইঁদুরের উৎপাত নিষ্পত্তি করার উপায় তার কাঁধে অথবা চেনকাটা ব্যাগে আছে এটা ভেবেই শ্রীকান্ত'র বেশ তৃপ্তি হয়েছিল মনে মনে। কাগজের খবরটা বিমলাকে শুনিয়ে শুনিয়ে পড়েছিল। তারপর কাগজটা যত্ন করে রেখে দিয়েছিল। বিমলা মুখ টিপে শুকনো গালের গর্তে টোল এনে বলেছিল, দেখ, হয়তো এবার তোমার ডাক আসবে রাজপ্রাসাদে। শ্রীকান্ত শুকনো চেহারার লোকটাকে প্যাকেট দুটো দিতে দিতে হঠাৎই কথাগুলো মনে পড়ে গেলে আপন মনে হেসে ফেলে।

হাসলেন কেন?

নাহ্, তেমন কিছু না। আপনি বাকিংহাম প্যালেসের নাম শুনেছেন? ইংল্যান্ডের রাজপ্রাসাদ?

শোনা শোনা লাগছে। কেন বলুন তো?

সেখানেও ইঁদুর আছে জানেন।

শুকনো চেহারার লোকটা কথাটায় খুব একটা গুরুত্ব দেয় না। বলে, ওসব রাজা উজিরদের ব্যাপার। আমার জেনে কী হবে? ওদের ইঁদুর মারার বিষও আলাদা। সে সব মাল পাঁচ টাকায় মেলে না। লোকটা আপন মনে বকতে বকতে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যায়। শ্রীকান্ত ভাবে,

বিষের আবার হেলদোল আছে নাকি! সামান্য বিষেই কত কী হয়ে যায়।

সন্ধ্যে পরে গেলে শ্রীকান্ত বাড়ির পথে যখন পা চালায়, এসবের বিক্রি তখন বাড়ে আলো-আঁধারি শহরের গলিতে। তাছাড়া বাজারে নানারকম র‍্যাট কিলার থাকতেও তার মাল লোকে এখনও কেনে। লকডাউনের পর দিনসাতেক একটু চাহিদা বেড়েছে। ওষুধের অভাবে বার-বৃদ্ধি ঘটেছে ক্ষতিকারক প্রাণীগুলোর। অবশ্য প্রতিদিন কুড়িটা বেচতে পারলেই শ্রীকান্ত খুশি। তার চেয়ে বেশি হয় কখনও কালেভদ্রে। জীবনে সে কত ইঁদুর, ছুঁচো, আরশোলা, টিকটিকি মেরেছে তার কোনো গোনাগাঁথা হিসেব নেই শ্রীকান্তর কাছে। শুধুই কি ছুঁচো, ইঁদুর? কত মানুষ গোপনে খেয়ে ফেলে। কেন খায়, কীজন্য খায় শ্রীকান্ত কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না। এই যেমন কমলাদিদিমণি। তার কথা মনে হলে শ্রীকান্তর সব হিসেব গুলিয়ে যায়। কমলাদিদিমণিই তার দেওয়া বিষে মারা যাওয়া প্রথম মানুষ বলে মনে হয়।

একটা কথা ছিল।

আচমকা ডাকে শ্রীকান্ত মাথা ঘুরিয়ে তাকায়। কেউ কোথাও নেই। গলির মুখটায় তেলেভাজার দোকানের সামনে কিছু মানুষের রোজকার জটলা। তাদের কেউ শ্রীকান্তর দিকে তাকাচ্ছে না। ডানহাতি রাস্তার ওপরে একটা পাঁচিল ঘেরা জমি। ক'টা সাইকেল আর পথচলতি মানুষের অলিখিত পেচ্ছাপখানা। শ্রীকান্তর অবাক লাগে, সে যে স্পষ্ট শুনতে পেল তাকে কেউ ডাকল! দুটো প্যাকেট বিক্রির আশায় সে এদিক-ওদিক তাকায়।

এই যে দাদা, এ'দিকে। এবার শ্রীকান্ত ডানদিকে তাকাতে লোকটা পাঁচিল ঘেরা আঁস্তাকুড় থেকে বেরিয়ে আলোয় আসে। শ্রীকান্ত তাকে দেখেই থমকে যায়।

আপনাকে লঞ্চঘাটে দেখলাম না? আমার কাছ থেকে পাঁচটা প্যাকেট চাইলেন?

হুম। দেবেন? খুব দরকার।

শ্রীকান্ত আমতা আমতা করে, কিন্তু আমি যে আপনাকে বললাম...

কথা শেষ করতে না দিয়ে লোকটা বলে, হ্যাঁ, জানি। কিন্তু ...আমার যে খুব দরকার। কাউকে বলব না, প্লিজ, আর পারছি না দাদা!

লোকটা আলো আঁধারিতে শ্রীকান্ত'র সামনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে। কয়েক মুহূর্তের জন্য শ্রীকান্তর নিজেকে বড়ো অসহায় লাগে। লোকটা মরার জন্য হাত পাতছে! যেন তার হাতেই মরা-বাঁচার জিয়নকাঠি। বুঝতে পারে শ্রীকান্ত, তাকে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে এখনি। লোকটাকে হাতছাড়া করতে মন চায় না।

শ্যামরোড ধরে দু'পা এগিয়ে ডানহাতি খালের রাস্তায় শ্রীকান্ত'র বাড়ি। খালের রাস্তায় ঢোকার ঠিক দুটো বাড়ি আগে কমলাদিদিমণির বাড়ি। বয়সে ছোটো হলেও ভদ্র ঘরের মেয়েদের শ্রীকান্তর মতো মানুষরা দিদিমণি বলেই ডাকে। কমলাদিদিমণি একটা সুন্দর দেখতে ছেলের সাথে ঘুরত। শ্রীকান্তর শহর চষে বেড়ানো চোখে এড়িয়ে যায় না কিছুই। একদিন স্বপ্নবীথি পার্কের কাছে তাদের দেখে শ্রীকান্ত'র মনে হয়েছিল ওরা ঝগড়া করছে। এর বেশি কিছু জানে না শ্রীকান্ত। নিজের মাইকের শব্দে নিজেই কিছু শুনতে পায়নি। অবশ্য তার শোনার কোনও দরকার ছিল না। বড়ো মানুষের প্রতি তাদের মতো চুনোপুঁটির আগ্রহ দেখাবার আহ্লাদ তার নেই। এর কিছুদিন পর একদিন কমলাদিদিমণি শ্রীকান্তকে ডেকে বিষ কিনেছিল একসাথে আট প্যাকেট।

এত প্যাকেট কেন দিদিমণি?

ও তুমি বুঝবে না। অনেক ছুঁচো আর ইঁদুর। সবাইকে একসাথে মারতে হবে।

শ্রীকান্ত খুশিই হয়েছিল। আটটা প্যাকেট বেচতে তার সারাদিন লেগে যায়। এ তো মেঘ না চাইতেই জল। আটটা পাতা দিদিমণির হাতে দিয়ে টাকাটা নেওয়ার সময় কমলাদিদিমণি তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলেছিল, হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালার গল্প জানো?

না তো।

বাঁশি বাজাতে জানলে তোমাকে আর বিষের বোঝা বয়ে বেড়াতে হত না! সব ইঁদুর আর ইঁদুরের মতো সবাই তোমার কাছে চলে আসত। র‍্যাট ট্রাপ গল্পটাও যদি পড়া থাকত তাহলে বুঝতে দুনিয়াটাই একটা র‍্যাট ট্রাপ তোমাকেও একদিন ট্রাপে পড়তে হবে।

শ্রীকান্তর এসব পড়াশোনা করা দিদিমণিদের কথায় পেট ভরবে না। সে মুখ বুজে প্যাকেটের দাম বুঝে নিয়েছিল। আর তার পরেরদিনই কমলাদিদিমণিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মারা যায়। ঘটনাটা ঘটে যাওয়ার পর দু'দিন শ্রীকান্ত মার্কেটে বেরোয়নি। একটা ভয় তাকে পেয়ে বসেছিল। কমলাদিদিমণির কথাটা কানে বাজত সারাক্ষণ, তোমাকেও একদিন ট্রাপে পড়তে হবে। প্রায় একমাস বাদে সে নিজেই একদিন থানায় গিয়েছিল। গিয়েছিল বিমলার কথায়। রাস্তাঘাটে সবসময় তার মনে হত তাকে কেউ দেখছে। কমলাদিদিমণির সাথে যে ছেলেটা ঘুরত সে যেন ঘুরে ফিরে শ্রীকান্ত'র সামনে এসে দাঁড়াত। মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত কিছু বলার জন্য। শহরের দু-একটা গলিতে চোরের মতো ঘুরতে ঘুরতে সে দেখতে পেত রাস্তায় পড়ে থাকা মরা ছুঁচো অথবা ইঁদুরের দেহ। একরাশ শূন্য দৃষ্টি সম্বল করে ঘরে ফিরে তার মনে হত কমলাদিদিমণিও ওইরকম মরে থেঁতলে যাওয়া ইঁদুরের মতো শুয়ে আছে পথের পাশে। বিমলাই তাকে বলেছিল, তুমি তো কোনও অন্যায় করনি। কমলাদিদিমণি তোমার কাছ থেকে মাল কিনেছে তুমি পয়সার বিনিময়ে দিয়েছ, তোমার দোষ কোথায়! শ্রীকান্ত নিজেই একদিন থানায় গিয়েছিল অপরাধীর মতো।

স্যার কমলাদিদিমণি মারা যাওয়ার আগেরদিন আমার কাছ থেকে আট প্যাকেট ইঁদুরের বিষ কিনেছিল।

তাতে কী হয়েছে?

ওই বিষ খেয়েই হয়ত...।

তাতে তোর কী? তুই মাল বেচেছিস। মিটে গেছে। তোর কোনও দায় নেই। যাহ্ পালা।

কিন্তু স্যার আমার বিক্রি করার সময় মনে হয়েছিল দিদিমণির কোনও একটা মতলব আছে। আমাকে অনেক কথা বলেছিল সেদিন। কোন এক বাঁশিওয়ালার গল্প। আমি কিছুই বুঝিনি। একসাথে এতগুলো প্যাকেট বিক্রির লোভ সামলাতে পারিনি স্যার।

এভাবে কতজনকে মরতে সাহায্য করেছিস?

শ্রীকান্ত চুপ করে থাকে মাথা নামিয়ে। অনেকেই তার কাছ থেকে একাধিক প্যাকেট কিনেছে অনেকবার। তাদের কাউকেই শ্রীকান্ত চেনে

না। তারা কি ইঁদুরের মতোই নিজেদেরকে শেষ করে দিতে চেয়েছিল? ইঁদুর মারার বিষ খেয়ে মৃত্যুর খবর তো আকছার কাগজে বেরোয়। সেগুলোর সবই কি শ্রীকান্তর বিক্রি করা বিষ! কমলাদিদিমণি কি তাহলে তার বিষে মারা যাওয়া প্রথম মানুষ নয়!

কী হল? চুপ করে গেলি? হিসেব করছিস? ওসব না ভেবে বাড়ি যা। তোর এগেইনস্টে কোনও কেস হবে না। তবে কেস কোর্টে উঠলে তুই বলতে পারিস যে মেয়েটি সেদিন তোর কাছ থেকে আট প্যাকেট বিষ কিনেছিল। তাতে সেলফ সুইসাইড কেস হিসেবে বাড়ির লোকের হ্যাপা কিছুটা কমবে। সেখানেও বিপদ আছে। তুই সত্যি বলছিস কিনা সেটা বিশ্বাস নাও করতে পারে। তুই যে টাকা খেয়ে মিথ্যে সাক্ষী দিচ্ছিস না তার কী প্রমাণ? শ্রীকান্তর মাথা গুলিয়ে যায়। ব্যাপারটা যে এত জটিল সেটা সে বুঝতে পারে না। বোবার মতো দাঁড়িয়ে থাকে। পুলিশকর্তা মুচকি হেসে বলে, যা পালা এখান থেকে! এরপর থেকে শ্রীকান্তর মনটা আর কখনও এত দুর্বল হয়নি।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটাকে শ্রীকান্ত প্রশ্ন করে, কোথায় থাকেন? ভারতমাতা ক্লাবের পেছনের বস্তিতে। বউ বাচ্চাটাকে নিয়ে চলে গেছে। আমার কোনও রোজগার নেই।

আমার সাথে কাজ করবেন? মরণ ফেরি করার কাজ। খুব বিরাট কিছু লাভ হয় না, তবু পেট চালানোর মতো টাকা উঠে আসে। ঘরে ঘরে ভালো বিক্রি আছে। আমিই আপনাকে মাল দেব। লোক বুঝে বেচে দিলে আরও লাভ। কথা বলতে বলতে শ্রীকান্ত বিষের চাঁদমালা থেকে পাঁচটা প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে বলে, টাকা লাগবে না, ধরুন। কাল এখানেই দেখা করবেন, আরও কিছু মাল দেব। নেমে পড়ুন। আপনাকে দিয়ে কাজ হবে। আপনার সাথে আমার বেশ মিল আছে।

বাড়ি গিয়ে বিক্রিবাটার হিসেব লিখতে হয় শ্রীকান্তকে। সেখানে প্রতিদিন বিক্রি হওয়া প্যাকেটের হিসেব লিখে রাখে সে। মহাজনকে হিসেব বোঝাতে হয়। শ্রীকান্ত খাতাটা খোলে। কমলাদিদিমণির হিসেব লেখা রয়েছে শেষ পাতায়, এক প্লাস এক প্লাস আট। তার আগের পাতাগুলো এবার চোখ বোলায় সে। প্রায়ই ছ'প্যাকেট, সাত প্যাকেট, আট প্যাকেট বিক্রির হিসেব ছড়িয়ে রয়েছে খাতা জুড়ে। এতদিন খেয়ালই করেনি শ্রীকান্ত! প্রথম থেকে গুনে দেখে শ্রীকান্ত। প্রায় শতাধিক! এতগুলো মানুষকে সে ছুঁচোর মতো, ইঁদুরের মতো মরে যেতে সাহায্য করেছে নিজের অজান্তে! তারা কারা, কোথায় থাকে, কেনই বা শ্রীকান্তকেই তারা বেছে নিয়েছিল নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে। খাতার মাস তারিখ মিলিয়ে শ্রীকান্ত দু-একজন ছাড়া কাউকেই চিহ্নিত করতে পারে না। দু'মাস আগে একজন অন্তঃসত্ত্বার বিষ খেয়ে মারা যাওয়ার সাথে তার ছ'প্যাকেট বিষ বিক্রি করার একটা সূত্র প্রায় পরিষ্কার। আর একটা হিসেব থেকে তার আবছা মনে পড়ছে একটি বালকের কথা।

খাতাটা হাতে নিয়ে বোবার মতো শ্রীকান্ত বসে থাকে। খুব বেশিদূর লেখাপড়া না করলেও কমলাদিদিমণির বলা র‍্যাট ট্রাপ শব্দটার মানে সে এখন পরিষ্কার বুঝতে পারছে।

নিভে আসা ফানুসের মতো হালকা হয়ে যাওয়া শ্রীকান্ত দিনের হিসেবটা লিখে ফেলে। এক প্লাস পাঁচ, ব্রাকেটে লেখে ধার। হিসেব তার নখদর্পণে। লোকটা কাল আসবেই। শ্রীকান্তর তাকে দেখেই মনে হয়েছে, লোকটা আসবে। মরণ ফেরি করার নেশা বড়ো সাঙ্ঘাতিক! শ্রীকান্ত সেটা ভালোই জানে।

শারদ শুভেচ্ছায়

M : 9831119958
Whatsapp : 8240883054

PROPRIETOR PIONEER GROUP

JOYDEEP BHATTACHARYA

Email : joy_deepkolkata@yahoo.co.in

বটগাছের থান

শুভ্রজিৎ সরকার

সরকারি নোটিশ আসার আগে খবরটা লোকাল নেতাদের মুখে মুখে ফিরছিল। ধীরে ধীরে মানুষের মনে চারিয়ে দেওয়ার জন্য টুকটাক আলোচনাও চলছিল। নেতারা খবরটা হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে দূর থেকে জল মাপছিল। রাস্তার সম্প্রসারণ হবে। ছিল দশ ফুট। আরও ছ'ফুট বেড়ে চওড়া হবে দু'ধার। দু'ধারের জায়গা নিয়ে মাথাব্যথা নেই, আশঙ্কা ছিল বটগাছের থান নিয়ে। একবুক শঙ্কা নিয়ে নোটিশ এল। সরকারি লোকজন সাদা অ্যামসেডারে চেপে এসে নোটিশ বিলি করে গেল। আর একটা সাঁটিয়ে দিল বটগাছের গোড়ার কাছে থানে। সরাতে হবে থান আর কাটা পড়বে বটগাছ।

অনেক আলোচনা হল, জমায়েত হল। হাজার লোকের ভাবপ্রবণতা নিয়ে আবেদন জমা পড়ল পঞ্চায়েত প্রধান, এমএলএ, এমপি'র কাছে। তার কোনো সদুত্তর এসে পৌঁছোল না। দিনের দিন সরকারি অফিসার এল, এল হাতুড়ি, শাবল, গাইতি, করাত নিয়ে একদল লেবার। তার আগেই তিনপাড়ার জনগণ-নারী, পুরুষ, শিশুরাও এসে জড়ো হয়েছে বটগাছতলায়। তারা শান্ত ও অহিংসভাবে মানববন্ধন রচনা করল তিন-চারটে স্তরে তাদের থান আর বটগাছ ঘিরে। প্রাচীন বটগাছ

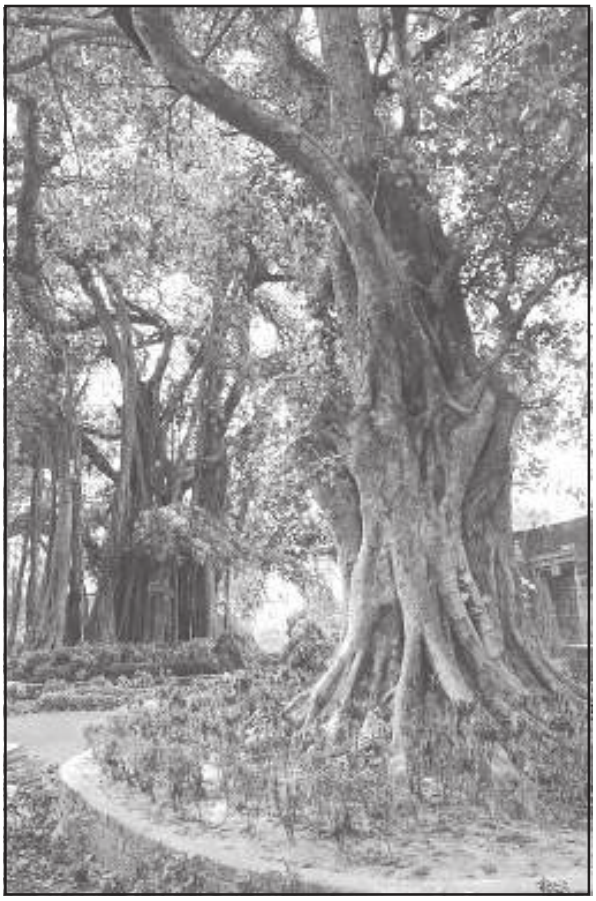

মিটিমিটি করে উপভোগ করতে লাগল সকলের উজাড় করা ভালোবাসা।

দুই

তে'মাথার মোড়ে বটগাছটা অতিপ্রাচীন তবে থানটা কত পুরোনো হবে সেটা কেউ ঠিক বলতে পারে না। কেউ বলে পঞ্চাশ-ষাট, কেউ বলে আশির বেশি হবে হয়তো। এর বেশি শোনা যায় না। কারণ, এর থেকে প্রবীণ লোকজন আর এ তল্লাটে কেউ বেঁচে নেই। থাকলেও এসব আবহমান কাল ধরে থাকা জিনিসের হিসেব কেউ রাখতে পারে না। সবচাইতে বেশি বয়স্ক বনমালী দাদুর কাছে থানের কথা জানতে চাইলে বড়ো হ্যাপা হয়। দাদু আগে কানে কম শুনত, ঠিক সময়ে চিকিৎসা করায়নি ফলে এখন একেবারে বদ্ধকালা হয়ে গেছে। তাই সামনে গিয়ে 'থান' বললেই-- গান, বান, ডান এইসব আনসান শোনে। তখন আসল প্রশ্নটাই গুবলেট মেরে যায়। ওর থেকে কমবয়সী লোকেরা অনুমান করার চেষ্টা করে। আন্দাজ করে কিছু বলতেও পারে। তবে বেদ-এর মতো বংশপরম্পরায় শুনে যেটা অধিকাংশ মানুষ জানে, একবার গঙ্গাসাগরমেলা থেকে ফেরার পথে একদল সাধুবাবা এখানে ক'দিনের জন্য ডেরা গেড়েছিল। সে ক'দিন সাধনভজন, 'বোম ভোলে' আওয়াজ আর গাঁজার গন্ধে মুখরিত হয়েছিল এস্থান। তার কিছুদিন বাদে সবাই চলে গেলেও একজন বৃদ্ধবাবা কী কারণে আরও কিছুদিন রয়ে গিয়েছিলেন। বটগাছটা তখন সদ্যযৌবনে কল্লোলিত। 'বাবা' সকাল-সন্ধ্যায় ধুনি জ্বেলে নিজের মতো সাধনা করতেন। রাত বাড়লে আগুনের আংরা বাড়ত আর উচ্চকিত আওয়াজে বাড়ত সাধনার তেজ। সেই সাধুবাবা আরও কিছুদিন ছিলেন। সেই সময়কালে অনেকগুলো লৌকিক- অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল। দু'বছর খরার পরে সেবার ভরা বর্ষা হয়ে মাঠে ফসল উপচে উঠেছিল। বটগাছটি লাফিয়ে বেড়ে মহীরুহ রূপ নিয়েছিল। ওয়াসিমের বাঁজা বউ পোয়াতি হয়েছিল। ওদের গ্রামে একটা পোস্টঅফিস আর হাইস্কুলের অনুমোদন পেয়েছিল। পূব আর পশ্চিমপাড়ায় অনেক বাড়িঘর তৈরি হয়ে লোকসংখ্যা বেড়েছিল। উত্তরপাড়ার অনেক মিস্ত্রি, মজুর অনেকদিন ধরে নির্মাণকাজ পেয়ে ল্যাজ বেশ মোটা হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ এলাকার সকলের মনে এধারণা জন্মেছিল যে, সকাল-সন্ধ্যে সাধুবাবার সাধনার জোরে তাদের এই কল্যাণময় ঘটনা ঘটেছিল। কেউ কেউ নিয়ম করে পুজোর সময়ে এসে দাঁড়াত। প্রণাম করত, প্রণামী দিত ফলমূল, সন্দেশের বাক্স, টাকাপয়সা। তবে সাধুবাবা খাবার জিনিসগুলোই নিতেন, অর্থ খুব একটা ছুঁতেন না। কেউ কেউ দুপুরে ভোগ রান্না করেও পাঠিয়ে দিত। তা তিনি গ্রহণও করতেন। সাধুবাবার মাথার সামনের দিকে চুল কম থাকায় নেড়া মতো লাগত। আর মাথার মাঝখান থেকে সব চুলেই জট পাকিয়ে বটগাছের ঝুরির আকারে পিঠময় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

এজন্য ওই স্থানের নাম হয়ে গেল 'নেড়া বাবার থান'। লোকজনের বিশ্বাস, নেড়াবাবা শূন্যে বিলীন হওয়ার আগে তাঁর জট বটগাছকে দান করে গেছেন যা পরে ঝুরি হয়ে নেমে এসেছে। দেখতে নাকি সেরকমই লাগে অনেকটা।

ভক্তি যখন বেশ জমে উঠেছে, হঠাৎ একদিন গভীর রাতে সাধুবাবা উধাও হয়ে গেলেন। ফেলে গেলেন আংরার আগুন, সেটাও একসময় নিভে গেল। খালি পড়ে রইল দৈর্ঘ্যে- প্রস্থে ফুট দুয়েকের চৌখুপীর একটা থান। ইট সাজিয়ে কাদা লেপে বানানো, বটগাছের গোড়ায় দু'আড়াই ফুটের উচ্চতার। তাতে ছড়ানো কিছু শুকনো ফুল, আধপোড়া কাঠ, গাঁজার কল্কে আর সাধুবাবার ফেলে যাওয়া সাধনা ভক্তি। যা ছড়িয়ে পড়েছিল এখানকার হিন্দু, মুসলিম, দুলে, বাগদি সব স্তরের মানুষের মধ্যে।

তিন

এ থান নিয়ে খুব আতান্তরে পড়ল এলাকার মানুষ। সেসময় এলাকার মানুষের দৈনন্দিন জীবনে তেমন স্বচ্ছলতা না থাকলেও সুখ ছিল। মনে আমোদ ছিল প্রচুর। আর মিলমিশ ছিল মেলার মতো অবাধ। সামনেই ছিল ভরা অমাবস্যা। চৈত্র মাস, শনিবার। সেসময়কার কিছু প্রবীণ মান্যবর মিলে ঠিক করলেন রক্ষাকালী পুজো দেওয়া হোক। সেইমতো আয়োজন হল। আড়ম্বর করে ভক্তিভরে সারারাত পুজো সারা হলে ভোরবেলা প্রতিমা বিসর্জন হল। উত্তরপাড়ার ঝুনাই, গণেশ, বসির, পচা- ওয়াসিম, তৌফিক-সুকুমাররা কাজ কামাই দিয়ে গায়ে গতরে খুব খাটলো। তাই সারারাত ফিরির চুল্লু খেয়ে মা মা বলে ডেকে রাস্তায় গড়াগড়ি দিল। বরাদ্দ করেছিল পুজো কমিটি। জোয়ান বটগাছ চুপ করে সবই লক্ষ রাখছিল।

এরপর এল নীলষষ্ঠি। থানে ভোলেবাবার পুজোর আয়োজনের কোন কসুর হল না বাবার আশীর্বাদে। চড়কের মেলাও বসল তিনদিকের রাস্তার দু'পাশে। সে রীতি আজও চলে আসছে ফি বছর।

তবে এবছর মেলার রাজনৈতিক দখল নিয়ে তার ঐতিহ্য টুকরো টুকরো হয়ে তিন পাড়ার সাথে চলে গেল। মেলা তেমন জমল না। এক গাছ ভর্তি দুঃখ নিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল বটগাছ।

বটগাছের ডানদিক আর বাঁদিকের অর্থাৎ মুখোমুখি দু'পাড়ার অথনৈতিক হাল কালে কালে বেশ ভালো হয়ে গেছে। রেল, ব্যাঙ্ক, পোস্টঅফিস, স্কুলমাস্টার। এছাড়া আছে বেসরকারি বহুজাতিক সংস্থার মোটা মাইনের পরিবারের বাস। পূব আর পশ্চিমে নতুন গড়ে ওঠা ফ্ল্যাটগুলোতেও কেউ কেউ এসেছে বাইরে থেকে। সেখানে দু'-চারজন স্বচ্ছল ব্যবসায়ীও থাকেন। খালি উত্তরপাড়ার টালির চালের গতানুগতিক বস্তি জীবনে কোনও পরিবর্তন নেই। দুলে, বাগদি আর আইমাদার মুসলিম সমাজের কাছাকাছি বাস। তাদের কাছাকাছি সহাবস্থানে বিস্তর চুলোচুলি, মারামারি, হানাহানি হলেও সম্প্রীতির মজবুত দড়িতে কখনও টান পড়েনি। তাই থানের রক্ষাকালী পুজো, চড়কে যেমন ওরা এসেছে আবার খুশির ঈদে এরাও দল বেঁধে গেছে লাচ্চা সিমুই এর নিমন্ত্রণে।

চার

বটগাছের হয়েছে বড়ো জ্বালা, সে এখন কালের নিয়মে ঝুরি নামিয়ে, ডালপালা মেলে চারতলা ফ্ল্যাটকেও খানিকটা ছাড়িয়ে গেছে। উচ্চতার সঙ্গে বয়সেও সে এখানকার সবচাইতে প্রবীণ। তিনদিকের পাড়ার ভালোমন্দ সবই স্বচক্ষে অপলক দেখে দিনরাত। এখন 'নেড়াবাবার' জট জ্ঞানে ওর ঝুরিও পুজো পায়।

তিন নম্বর ফ্ল্যাটের একজন মহিলার ওপর দখল নিয়ে মারামারি বাধল দুই যৌনতাড়িত পুরুষের। যৌনতার গন্ধে শরতের এক নরম সকালে সে চুলোচুলি তাড়িয়ে উপভোগ করল ঘুমভাঙা প্রতিবেশীর দল। বস্তির লোকজনই বেশি জড়ো হয়েছিল ফ্ল্যাটের বড়লোকদের বস্তির চুলোচুলি দেখতে।

রাত গভীর হলে ফ্ল্যাটের ছাদে বটগাছ দেখেছে ওই মহিলার গোপন অভিসার। দিন ভেদে ভিন্ন পুরুষের সাথে ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গন, রতিক্রিয়ার শীৎকার। পাতার আড়ালে চোখ, কান ঢেকে ফেলেছে বটগাছ।

বটগাছের গোড়ায় থানের ডানপাশ, বাঁপাশে এখন বসার বেঞ্চি হয়েছে সিমেন্ট বাঁধিয়ে। সেখানে এখন দলে দলে আড্ডা বসে। বুড়োরা বিকেলবেলা। পড়ুয়ারা বেলায় আর সন্ধ্যায়। চাকুরেরা আসে শুধু রোববার, বেলায়। রাত বাড়লে আসে নেশাখোরদের দল। প্রত্যেক দলের ক্লাস আলাদা, ভাবনা আলাদা, গল্পও আলাদা। বটগাছ ওদের গল্প মন দিয়ে শোনে। বুড়োর দলে সংখ্যা সাকুল্যে সাতজন। সবাই রোজ আসতে পারেও না। আজ হাঁটু ব্যথা, কারোর ছেলেবউ বেড়াতে গেছে তাই ফাঁকা বাড়ি পাহারা দেওয়া। ডাক্তারের অ্যাপয়েনমেন্ট, কারোর গিন্নির অসুখ এসব নানান সমস্যা। তবে বিজনদা না এলে এদের গল্পের মান বেশ উঁচু। দেশের হাল হকিকত, রাজনীতি, ক্রিকেট, ফুটবল, সামাজিক অবক্ষয় ইত্যাদি। পরনিন্দা-লোকাল চর্চা বেশি হয় বিজনদা থাকলে। উনি হলেন স্টাফ রিপোর্টার। পাড়ার, পাড়া ছাড়িয়ে এলাকার সব ধরনের কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি, ষড়যন্ত্র, কমবেশি সব খবরই তার ঝুলিতে থাকে। কোনও রসালো কেচ্ছা আদিরসে ফেটিয়ে এমনভাবে পরিবেশন করবে যে উপস্থিত বাকি বুড়োরা ধুতি খামচে ধরবেই। বটগাছ মুখ টিপে হাসে।

কমবয়সী পড়ুয়াদের আলোচনায় থাকে ক্যারিয়ার- নতুন কোর্স দিল্লি, ব্যাঙ্গালোর, বিদেশ। মুখে হিন্দি, ইংরেজি বুলি, মাতৃভাষা চরম অবহেলিত। প্রেমালাপ হয়ইনা প্রায়, হলেও তা খুবই সংক্ষিপ্ত। আবেগে

ভাটার টান প্রকট হচ্ছে ক্রমশ। বটগাছ লম্বা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ে।

চাকুরেদের গল্পে থাকে সাংসারিক পাঁচালি। বউয়ের সাথে মনোমালিন্য আর ডুবে ডুবে পরকীয়া। সমাজের অবনমন ভেবে বটগাছের দীর্ঘশ্বাস আরও গাঢ় হয়। পাড়ার মহিলামহল এখানে এসে গল্প ফাঁদার সুযোগ বড়ো একটা পায় না। বটগাছের গোড়ায় জল ঢালতে এলে অথবা থানে পুজো দেওয়ার সময় কারোরই তেমন ফুরসত থাকে না। উনুনে ভাত চাপানোর তাড়া থাকে। তাই ওদের সংক্ষিপ্ত গল্প কানে আসে বটগাছের। তবে ওদের মনস্কামনা নিবেদনের সময় ছেঁড়া ছেঁড়া ছবি জুড়ে একটা আস্ত গল্প হয়ে ওঠে। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনায় অনেক জীবন্ত সত্যি, কেচ্ছারূপে আত্মপ্রকাশ ঘটে যায়। যা শুনে বটগাছের কানে ডালপালা গোঁজা ছাড়া উপায়ান্তর থাকে না।

কারোর আলোচনা ভালো লাগলে বটগাছ দু'দশটা পাতা খসিয়ে হাততালি দিয়ে ওঠে। আর অন্যায্য, অসভ্য আলোচনা শুনলে আবার রেগে উঠে কখনও শুকনো ডালের টুকরো ছুড়েও মেরে বসে। লোকে হাওয়ার ঝাপটায় পড়া শুকনো ডাল ভাবলেও, বটগাছের বেশ আশ মেটানো আরাম হয়।

রাত বাড়লে নেশাখোরদের ফিসফিসানিতে কান পাতলেই অনেক তথ্যবহুল, গোপন খবর বোধগম্য হয়।

আজ একটু বেশি রাত করেই নেশার সদস্যরা একে একে জড়ো হল। ওরা মোট পাঁচজন, এসে বটগাছের গোড়ালির কাছে ঠেস দিয়ে বসল। উত্তরের বস্তির হারান আর রহমান, দু'জনেই নামকরা দোকলাবাজ। নেশার জ্বালায় চারটি পয়সা পেলে ঘরদোর বেচে দিতে পারে। নিজের বউকে ভাড়ায় খাটিয়েছে বারকয়েক। বাকি তিনজন এল আগেপিছে, ওরা ইদানিং উঠতি নেতার ফেউ ধরেছে। বাবলু ধীরেন খন্দকার। সিগারেটের মশলা তার খোল থেকে বেরিয়ে গাঁজায় মিশল। পলিথিন কাগজে ডেনড্রাইট আঠা নিয়ে বুকভরে, আশ মিটিয়ে গন্ধ নিল। শুরু হল ওদের ষড়যন্ত্র।

উত্তরের বস্তিতে দুই ধর্মের লোকেরা প্রায় দু-তিন বিঘা জমিতে বংশ পরম্পরায় মিলেমিশেই আছে। এখন শাসকদলের জমি হাঙরের নজরে পড়েছে এই অরক্ষিত স্থানে। যে জমির দখলদারী স্বত্ব ছাড়া উপযুক্ত কোনও দলিল প্রমাণের কাগজ নেই। তাই আগুনই হল প্রধান অস্ত্র। ভস্মীভূত হয়ে সব হারানোর দল স্বল্প প্রলোভনের ফাঁদে পড়বে সহজেই। গুজগুজ করে দিন ঠিক হল, সময় নির্ধারণ করল। এমন সর্বনাশা ফন্দি শুনে বটগাছ শিউরে উঠল। নিষ্পাপ নিরীহ মানুষগুলোর জন্য অন্তর কঁকিয়ে উঠল তার। দমবন্ধ করা অন্ধকার রাতে হিলহিলিয়ে উঠল উদ্ভিদ শরীর, রাগে ধিক ধিক করে ভেতরে জ্বলতে লাগল নেড়াবাবার আংরার আগুন।

পাঁচ

বস্তির বিপদের দিন ঘনিয়ে এসেছিল। নির্ধারিত সময়ে তুচ্ছ ঝামেলার নাম করে অগ্নিসংযোগ হয়েছিল প্ল্যানমাফিক। কিন্তু ওদের চালে সামান্য ভুল হয়েছিল। গরিব মানুষগুলোর মন ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারেনি।

বটগাছ এ অপরাধের কথা জানার পর থেকে বড়ো অস্থির হয়েছিল। সামান্য হাওয়া পেলেই শূন্যে ছুড়ছিল ওর মোটা ডাল, শুকনো পালা। তখন গ্রীষ্মের প্রবল দাবদাহ চলছে। একটু বৃষ্টির আশায় থানে পুজো দিচ্ছে, মানত করছে সব পাড়ারই অনেক মানুষ। মানত বোধহয় ফলল- ঘনিয়ে আসা দিনের নির্ধারিত সময়ের আগেই উঠল ক্ষণিকের কালবৈশাখী। নিমিষে সব ওলট পালট করে দিল। বটগাছের মোটাডাল ভেঙে পড়ল বস্তির টালির চালে। অল্পবিস্তর আহত হল বটে কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ায় লাগানো আগুনে কিছু ঘর ভস্মীভূত হল। প্রাণে মরল না কেউ। নিরীহ প্রাণ সুরক্ষিত থাকায় খিলখিলিয়ে উঠল বটগাছ। তার ঝরানো পাতায় সুসজ্জিত হল নেড়াবাবার থান।

খবর পেয়ে ওই ক'বিঘার পরিকল্পিত ধ্বংসস্তূপে শাসকের বড়ো বড়ো নেতা এলেন। বিরোধীরাও দলবল নিয়ে হাজির হলেন ঘোলাজলে কই মাগুরের আশায়। রাশিরাশি 'আহা রে', 'উহু রে'র সমবেদনায় বাতাস ভারী হয়ে উঠল। ত্রিপল এল, বটতলায় খাটানো হল। কড়াই কড়াই খিচুড়ি ফুটল ওই গাছতলায়। সেসময়ই বটগাছের নীচে এক ত্রিপলের তলায় সম্প্রীতি যেন বটগাছের স্থায়িত্বের মতো আরও মজবুত হল। ঝুরির মতো দৃঢ়তা পেল। সূচাগ্র জমি ছাড়ব না এ অনমনীয় পণ করে বসল ওরা। অসহায় মানুষের দুর্দিনে উত্তরপাড়ার পাশে একে একে বটতলার থানে এসে দাঁড়াল বাকি দু'পাড়ার সমব্যথী জনগণ। হিলহিলে আনন্দে ভরে উঠল বটগাছ, দূরে দাঁড়িয়ে রোষে গজরাতে দেখল সে জমি হাঙরের দলকে।

এরপর সরকারি নোটিশ আসতেই সকলে নড়েচড়ে বসল।

শেষ

পুনশ্চ - শহিদ অমৃতাদেবী বিষনোয়ীর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। তিন সন্তানের জননী যিনি ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দে রাজস্থানের প্রত্যন্ত অঞ্চল খেজারিলি গ্রামে 'বিষনোয়ই সম্প্রদায়ের' জনগণের সমর্থনে অন্যায়ভাবে নির্বিচারে বনাঞ্চল নিধনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। তিনি এবং তাঁর তিনকন্যাকে খেজরি বৃক্ষকে আলিঙ্গনরত অবস্থায় রাজার সৈন্য তলোয়ার দিয়ে শিরচ্ছেদ করে। সেদিনই 'চিপকো' আন্দোলনের বীজ অঙ্কুরিত হয়।

দিশা

পার্থ প্রতিম পাঁজা

যাই বলিস ভাই, তোদের ইসলাম ধর্মের মতো গোঁড়া আর কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্ম আর নেই। কলেজ স্কোয়ারের সিমেন্টের বেঞ্চে বসে বেশ উত্তপ্তভাবে কথাটা বলল কুন্তল।

অপরপক্ষ ঠিক ততটা না হলেও কম উত্তেজিত নয়। কিন্তু ইকবাল খানিকটা সংযতভাবে বলল, "দেখ, ওটা ব্যক্তির উপর নির্ভর করে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোক যেমন আমাদের ধর্মে আছে তেমনি তোদের ধর্মেও আছে।"

"বাজে বকিস না। আমাদের ধর্মে কি তালাক আছে? বোরখা আছে? বিধর্মী লোককে কাফের বলার রীতি আছে?"

"না নেই, কিন্তু সতীদাহ প্রথা, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন, কৌলিন্য প্রথা, ছোটো-বড়ো, উঁচু-নিচু বিভাগ-- এগুলোকে তুই নিশ্চয়ই গৌরবের বলে মনে করবি না?"

"আমাদের রামমোহন, বিদ্যাসাগরেরা তো সেই কবে এসব প্রথার উচ্ছেদ ঘটিয়েছেন।"

"ইয়েস, দ্যাট সংস্কারক। ধর্ম হিসেবে উভয়ই কুসংস্কার ছিল। তোদের ধর্ম বেশ কয়েকজন সংস্কারক পেয়েছে বলে তা কাটিয়ে উঠেছে, কিন্তু আমাদের ধর্ম তেমন কাউকে না পাওয়ায় সেই কুসংস্কারকে ঠিকমতো কাটিয়ে উঠতে পারেনি।"

"সে তুই যতই যুক্তি দেখাস, ধর্ম হিসেবে তোর ইসলাম ধর্ম খুব খারাপ।"

এবার ইকবাল না হেসে পারে না। কুন্তলের এই স্বভাবটা তার অজানা নয়। এমনিতে কুন্তল খুবই ভালো ছেলে, কিন্তু একটু আবেগপ্রবণ। যুক্তিতে যখন ও পেরে ওঠে না তখন মুখ চোখ লাল করে ব্যক্তিগত আক্রমণে নেমে আসে। তাই ইকবাল হাত জড়ো করে খানিকটা পরাজয় স্বীকার করার ভঙ্গিতে বলল, "বেশ, আমার ধর্ম খারাপ, আমি খারাপ -- ঠিক আছে তো? এখন উঠি, আমাকে যেতে হবে।"

"কেন, কী হল আবার? ও, তোর ধর্মকে খারাপ বলেছি বলে রাগ হয়েছে না?"

"পাগল নাকি! আজ বয়স্ক শিক্ষার একটা সেন্টার খুলছি, আমাকে সেখানে যেতে হবে। অনেক দেরি হয়ে গেছে, চলি রে।"

"রাখ তোর বয়স্ক শিক্ষা, ও হবেখন। চল তুই আমার সঙ্গে, আজ মিউজিয়ামে যাব।"

"হবে না রে। ওরা সব আমার জন্য অপেক্ষা করবে। বুঝতেই তো পারিস, বয়স্ক লোকেরা, একবার মন ভেঙে গেলে আর পড়াশোনার মধ্যে আসতে চাইবে না।"

"ধ্যাত, সব মাটি করে দিলি। যাচ্ছেতাই একটা।"

"আমি তো যাচ্ছেতাই-ই, কিন্তু কী আর করব বল, আজকে তোর সঙ্গে যাওয়া হচ্ছে না।"

"কী আর করা যাবে, অগত্যা--"

ইকবাল ও কুন্তল পরস্পরের বিপরীতে হাঁটতে শুরু করল।

কুন্তল কলকাতায় রয়েছে বছরখানেক হয়ে গেল তবুও যাব যাব করে এখনও মিউজিয়ামে ঢোকা হয়নি। আজ মেজাজটা সামান্য বিগড়ে গেলেও মিউজিয়ামে ঢুকে প্রথম দেখার আনন্দে তার একেবারে দিলখুশ হয়ে উঠল। একটার পর একটা বিস্ময়ের জাদু-মহলে সে মন্ত্রমুগ্ধের মতো ঘুরতে লাগল। বুদ্ধদেবের মূর্তিগুলি যে ঘরে সাজানো রয়েছে সেই ঘরের একটা কোণে গিয়ে থমকে দাঁড়াল সে। একজন সুন্দরী ইউরোপীয় তরুণী পাথরের মূর্তির সামনে হাত জড়ো করে চোখ বুজিয়ে বিড়বিড় করে কী যেন বলছে। খুব অবাক হল কুন্তল। কৌতূহল চাপতে না পেরে সে দ্বিধা জড়িত কণ্ঠে বলে ফেলল, "এক্সকিউজ মি--"

মেয়েটি চমকে পাশে তাকাতেই কুন্তলকে দেখতে পেল।

"আই এম এক্সট্রিমলি সরি ফর মাই ডিস্টারবেন্স। বাট আই এম হেল্পলেস। আই এম ভেরি ইগার টু নো অ্যাবাউট ইওর প্রেয়ার।" বেশ সপ্রতিভভাবে জবাবদিহি করল কুন্তল।

"আপনে ইটাকে প্রেয়ার বলটে পাড়েন, বাট আই থিঙ্ক শান্তির পূজারি ভোগোবান বুদ্ধের কাছে ইটা আমার কনফেশান।"

"বাহ , আপনি তো বেশ বাংলা বলতে পারেন! আর ইউ এন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান?"

"নো নো, আমি জার্মানি থেকে ইসেছি। ওখানে হাইডেলবার্গ ইউনিভার্সিটি ঠেকে কিছু বাংলা শিখেছিলাম, ইখানে এসেও কিছু বাংলা শিখেছি।"

"তাই! কিন্তু আপনার প্রেয়ারের কারণটা এখনও জানতে পারলাম না।"

"দেখুন, বিশ্বযুদ্ধের জন্যে ওয়ার্ল্ড আমাদেরই

ডায়ী করে রেখেছে। আমি মনে করি দে আর নট রং। তাই আমি এই মহান শান্তিদুত-এর কাছে অপরাড স্বীকার করে প্রেয়ার করছি।"

"কিন্তু তার জন্য তো জার্মানি একা দায়ী নয়!"

"আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গো টু দা পার্সেন্টেজ অফ রেসপন্সিবিলিটি। আমার দেশ দায়ী এটাই সাফিসিয়েন্ট। ফর দ্যাট, আমি এই স্টেলা ব্রাউন প্রার্থনা জানাচ্ছি।"

কথায় কথায় স্টেলার সঙ্গে কুন্তলের বন্ধুত্ব বেশ জমে উঠল। চরিত্রগুণের উদারতায় স্টেলা কুন্তলের হিন্দুত্ববাদী জঙ্গি মানসিকতাকে বুঝেও বুঝতে চাইল না। কুন্তলও স্টেলার শান্তিকামিতা অন্তত মৌখিকভাবে মেনে নিল।

তারপরে কয়েকটা দিন বিকালে দুজনকে কখনও ভিক্টোরিয়ায়, কখনও বা প্রিন্সেপ ঘাটে মুখোমুখি বসে বাদাম চিবতে দেখা গেল। সম্ভবত পরের বছর এই নভেম্বরেই আবার মিলিত হওয়ার প্রতিশ্রুতিও হল। বেচারা ইকবাল, এই কয়েকটা দিন বন্ধুর টিকির নাগালও পেল না।

৬ ডিসেম্বর। সারাটা দেশ উত্তেজনায় থমথম করছে। দাঙ্গার আগুন চারিদিকে ধিকিধিকি জ্বলছে। কোথাও বা উস্কানি পেয়ে দাউদাউ করে জ্বলে উঠছে। মেটিয়াবুরুজের একটা এঁদো গলির পাশে খুপরি মতন ঘরে বসে কুন্তল মনোযোগ দিয়ে রেডিও শুনছে। যত সময় যাচ্ছে উদ্বেগ ততই বাড়ছে। এখন আর হিন্দু মৌলবাদীদের সাফল্যে তার আনন্দ হচ্ছে না, বরং যত নতুন নতুন দাঙ্গার খবর আসছে ততই যেন হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।

খানিক বাদেই গলিতে বোমা পড়তে লাগল। ওদিক থেকে একটা হল্লার শব্দ যেন এদিকেই এগিয়ে আসছে। দরজায় উঁকি মেরে কুন্তল ব্যাপারটা দেখতে যাবে, এমন সময় ইসমাইল মুচি হন্তদন্ত হয়ে তার ঘরে ঢুকে পড়ল। হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলল, "ভাই এক্ষুনি বেরিয়ে এস, ওরা যে এসে পড়ল!"

"কিন্তু আমার ঘর---"

কথা না বাড়িয়ে ইসমাইল কুন্তলের হাত ধরে বাইরে নিয়ে গেল। তারপর সংকীর্ণ অলিগলির ভেতর দিয়ে তাকে নিয়ে চলল নিজের ঝুপড়ির দিকে। বড়ো রাস্তা এড়িয়ে যাওয়ার জন্য বিপদ এড়াতে পারল ওরা। গা বাঁচিয়ে এগলি ওগলি করে শেষ পর্যন্ত নিজের ঝুপড়ির মতো আস্তানায় গিয়ে পৌঁছল ইসমাইল, সঙ্গে রীতিমতো ভয় পেয়ে যাওয়া কুন্তল।

টানা পাঁচদিন ধরে ভাঙচুর, খুন জখম চলল। কুন্তল কিন্তু সেই দরিদ্র মুচির বাল-বাচ্চাদের সঙ্গে নিরাপদেই দিন গুজরান করতে লাগল। ইসমাইলের আতিথেয়তা ও আন্তরিকতায় ক্রমশ লজ্জা পেতে লাগল সে। ভেতরটা তার গলে যাচ্ছে। এই প্রথম ইকবালের কথা ভীষণভাবে মনে পড়ল তার।

পাঁচদিন পরে কুন্তলের তাড়নায় ইসমাইল নিজে গিয়ে তাকে তার বাসায় রেখে আসল। অবশ্য ঘরের দেওয়ালগুলো ছাড়া আর কিছুই আস্ত ছিল না। তবুও কুন্তল আফসোস করল না। হঠাৎ দাঙ্গায় নিহত মানুষদের জন্য তার বুকটা হু হু করে উঠল।

নভেম্বর মাস। তেমনই একটা পড়ন্ত বিকেল। কুন্তল আর স্টেলা প্রিন্সেপ ঘাটের বেঞ্চে তেমনি মুখোমুখি বসে আছে। আজ কিন্তু স্টেলার হাতটা কুন্তলের মুঠোর মধ্যে আলগোছা করে ধরা। বেশ কিছুক্ষণ মৌনতার পরে কুন্তলই মুখ খুলল, "জানো স্টেলা, ৬ আগস্ট হয়তো অনেকের অনেক কিছু খোয়া গেছে, কিন্তু আমাকে সে এক মহামূল্য সম্পদ দান করেছে। আমি আমার চলার পথ খুঁজে পেয়েছি। তোমার কথাগুলো আগে আমার দুর্বোধ্য লাগত। আজ আমার কাছে সব দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে গেছে। জানো স্টেলা, যার কাছে আমি ঘৃণাভরে পা তুলে বুটপালিশ করাতাম, সেই ইসমাইল মুচিই সমস্ত বিপদ এমনকী, জীবনের ঝুঁকি নিয়েও আমার জীবন বাঁচাল! স্টেলা, তোমার কথাই সত্যি। শান্তি ছাড়া মানুষের আর কিছু কাম্য হতে পারে না।"

স্টেলা অবাক বিস্ময়ে কুন্তলের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তার সংবেদনশীল মন বুঝতে পারে বীভৎস বাস্তব কুন্তলের হৃদয়কে ভেতর থেকে পরিশুদ্ধ করে তুলেছে।

ওদিকে কুন্তল বুকে জমে থাকা আবেগকে উজাড় করে বলে চলে, "স্টেলা জানো, আমার বন্ধু ইকবাল, যাকে শুধুমাত্র মুসলমান হওয়ার জন্য কত খারাপ কথা বলেছি, অন্ধ দোষারোপ করেছি, সেই ইকবালই একটা হিন্দু শিশুকে আগুন থেকে উদ্ধার করতে গিয়ে পুড়ে মরল! এখন আর আমাদের কি চুপ করে বসে থাকা চলে? সেই যে ইসমাইল মুচি, তার এই মহানুভবতা, জীবনের ঝুঁকি নেওয়া কি এমনি এমনি ব্যর্থ হয়ে যাবে? কিছুতেই না। তার জন্য শুধু ভারতবর্ষ নয়, সারা বিশ্ব থেকে এই হানাহানির অবসান ঘটাতে হবে। বলো, শান্তির জন্য সেই সংগ্রামে তুমি কি আমাকে পাশে নেবে না?"

আনন্দে কোনো কথা বলতে পারে না স্টেলা। শুধু ওর হাতে আলতো করে চাপ দেয়। দু-চোখ তার চিক চিক করে ওঠে।

নদীর ওপারে কালো দিগন্তের মাথায় ধ্রুবতারা যেন আরো উজ্জ্বল ভাস্বর হয়ে ওঠে।

বাজ বসন্ত

হরিদাস তালুকদার

রাখালীয়া করে আর ভাবে দুঃখিনী মায়ের দুঃখের দিন কীভাবে শেষ হবে। কী করেই বা বিধবা মায়ের মুখে হাসি ফোটাবে। বাবাকে সে দেখেনি। মায়ের মুখে শুনেছে তার ছোটোবেলায় দূর গাঁয়ে কোথাও যজমানি করতে গিয়ে আর ফেরেনি। বাহারী নদীর হড়কা বানে ভেসে গেছে — আর মা ছেলেকে দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে গেছে।

গাঁয়ের সবাই জানে, বসন্ত বাঁশির সুরে বুনো নীলগাইয়ের দলকে পোষ মানিয়ে নেয়। ফসল তোলার সময় যখন পশ্চিমের পাহাড় থেকে নীল গাইয়ের দঙ্গল পাকা ধান, গমের ক্ষেতে নেমে আসে তখন বসন্তের ডাক পড়ে মুখোপাধ্যায় বাড়ির বড়কর্তার কাছে। বসন্ত তার মায়াবী বাঁশিতে ফুঁ দেয়। সুরের জাদুতে মাতিয়ে নীল গাইয়ের দলকে পথ ভুলিয়ে নদী পার করিয়ে দিয়ে আসে। তার জন্য অবশ্য বাড়তি খাতির ও দুআনি পয়সাও মুখুঠি কর্তা তার মাকে দেয় বটে। সে যে মুখুঠি কর্তার বংশের রক্তধারাও বহন করে। অন্য সময়ে গরু ও মোষের পাল নিয়ে সারাদিনখানি রাখালিয়া করে। তাতে যে মা-ছেলের কুঁড়েতে লণ্ঠনটাও জ্বলে না।

সেদিন পৌষের কোন এক বিকেলে নীলগাইয়ের দঙ্গলটাকে তাড়াতে গিয়ে আপন খেয়ালে বসন্ত বড়সড় একটা গাইয়ের পিঠে

চড়ে বসে। আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, দামাল গাইটাও বসন্তের বাঁশির আকুল করা সুরে যেন মোহিত হয়ে নির্বিঘ্নে পথ চলছিল। বসন্ত খেয়াল করেনি, কখন নীলগাইয়ের দলের সাথে সে পাহাড়ি উপত্যকা ছাড়িয়ে জঙ্গলে চলে এসেছে। ইতিমধ্যে সে তার বাঁশি থামিয়ে লাফিয়ে গাইয়ের পিঠ থেকে নামল। দেখে চারদিকে সাঁঝের অন্ধকার নেমে এসেছে। মনের মধ্যে তার ভীতির সঞ্চার হল। নীল গাইয়ের দল তাকে ফেলেই আরো গভীর জঙ্গলে ঢুকে গেছে।

জনান্তিকে সে শুনেছে, এ জঙ্গলে রাতে বাঘ, নেকড়ে শিকারে বেরোয়। কখনও কখনও দলমা পাহাড়ের দামাল হাতির পালও নেমে আসে। ভেবেই ভয়ে তার সারা শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল যেন। ভয়ে ইতিউতি তাকিয়ে সামনে এগিয়ে গেল নিরাপদ কোন আশ্রয়ের আশায়। মনে সাহস আনার চেষ্টা করল। বসন্ত হঠাৎ দেখল, সামনে কোথাও ক্ষুদ্র আলোক শিখা জ্বলছে। এগিয়ে গিয়ে দেখে, একদল মানুষ কাঠ জ্বালিয়ে আগুনের বলয়ের চারপাশে বসে আছে। কাছে গিয়ে দেখল, তাঁরা সব সাধু-সন্ন্যাসী। বসন্তকে দেখে তাঁদের মধ্যে একজন হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। বসন্ত খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে এগিয়ে গেল। সন্ন্যাসীর মুখের ভাষা সে বুঝতে পারল না। কিন্তু তার মনে হল যেন সন্ন্যাসী তার সবটাই বুঝতে পারছেন। বসন্ত কিছু বুঝতে না পেরে বাঁশি হাতে তুলে নিল। বসন্তের মোহন বাঁশি রাতের অরণ্যে সুরের মায়ায় জটাধারী সন্ন্যাসীদের যেন নতুন মায়াজালে আবদ্ধ করল।

.....এক সময় বসন্ত থামল। প্রবীণ সন্ন্যাসী একজন এসে বসন্তের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। বললেন যেন, যা বেটা মায়ের দুঃখ ঘোচাগে যা, ভোর হতে সন্ন্যাসীদের প্রণাম করে বসন্ত আজ গ্রামের পথ ধরল। তার অভাগী মা কেঁদে কেঁদে সারা রাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারেনি তা জেনে বসন্ত বড়োই বিব্রত হল, মা আর ছেলেতে জড়িয়ে আর একবার কাঁদল। বসন্ত মায়ের চোখের জল মুছে বলল, মাগো, তোমায় ছেড়ে কখনও আর কোথাও যাব না, কখনও না। সেই কান্নার হাহাকার বিধাতার আসন টলিয়ে যেন। বিধাতা পুরুষ অলক্ষ্যে যেন বসন্তের উপরে সদয় হলেন।

সেদিন বিকেলে বসন্ত বেরিয়েছে তার নিত্যকার কাজ গরু-বাছুর সামলাতে। দেখে, বাদশাহী সড়কে চলেছে সারি সারি ঘোড়ার গাড়ি। আগে-পিছে অশ্বারোহী সৈন্য। সামনের দিকে অশ্বারোহী সৈন্যের গলায় আবার জড়ানো বিশাল ঢাক। সে ঢাকের বাদ্যে জানান দিয়ে চলেছে---গৌড়েশ্বর স্বয়ং চলেছে অশ্ববাহিত শকটে। পেছনে আরও সব শিবিকায় গৌড়ের আলাউদ্দিন হুসেন শাহের খাস বেগম ও তাঁর দাসীদের অশ্ববাহিত শিবিকার সারি। কলিঙ্গের প্রান্তদেশে ভ্রমণ শেষে বাদশাহ গৌড়ে ফিরে যাচ্ছেন। পড়ন্ত বিকেলে মল্লহাটির প্রান্তরে শাহী যাত্রা সেদিনের মতোই থামল। মুখুটি বাড়ির খাস মহলে খবর যেতেই ছুটে এলেন জমিদার মশাই। যথাবিহিত সম্মান জানিয়ে যথেষ্ট উপঢৌকন দিয়ে বাদশাহের খাতিরদারি করে বাড়ি ফিরে গেলেন।

পরদিন সকালে পাড়াময় রাষ্ট্র হল যে, বেগম হুসনে আরার পোষা বাজপাখি খাঁচার দুয়ার আলগা পেয়ে উড়ে গেছে। নাছোড় বেগম বাজপাখি ছাড়া মল্লহাটি ছেড়ে এক পাও এগোবেন না।

বাদশাহী ঢাকবাদক ঢাকের বাদ্যে গাঁয়ের পথে জানান দিল, যে বেগম সাহেবার বাজ পাখি ধরে দিতে পারবে বাদশাহ তাঁকে প্রচুর পুরস্কার দেবেন। রাখাল বালক বসন্তের কানেও গেল বাদশাহের ঘোষণা। জমিদারমশাইও বসন্তের খোঁজে লোক পাঠালেন। সদ্য কিশোর বসন্তের মন নেচে উঠল পুরস্কারের আনন্দে। মায়ের দুঃখ ঘুচবে যদি সে বাজপাখি ধরে দিতে পারে।

প্রান্তরের পথে পথে বসন্তের মোহন বাঁশির সুর এক মায়াজাল ছড়াল যেন। মল্লহাটি বসন্তকে নতুন করে জানলো। এ সুর তো বসন্ত আগে কখনও বাজায়নি। জমিদার বাড়ির যাত্রাপালার আসরেও এত সুমধুর সুর কখনও কেউ শোনেনি। সকলে আরও অবাক হয়ে দেখল ঝাঁকে ঝাঁকে পায়রা, ময়না ধেয়ে আসছে তালপুকুরের ধারে। রাজপুরুষরা দেখল, সেই ঝাঁকের পেছনে বেগম সাহেবার পেয়ারের বাজপাখি ডানার ঝাপটানিতে ময়না শিকারে ব্যস্ত। অবশেষে বাজ এসে বসল বসন্তের কাঁধে। মোহনবাঁশি সুরের লহরায় দিগন্তের পাড়ে শেষ প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে থামল। সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে হেলে আছে। বাদশা নিজে এগিয়ে এসে বসন্তের হাত ধরলেন। কিশোর বসন্তের হাতে চুম্বন করলেন। বেগম সাহেবা বাদশাহী সহবত ভুলে বসন্তের হাত দুটো ধরে কৃতজ্ঞতা জানালেন। বাদশা তাঁর তেজী ঘোড়ার লাগাম বসন্তের হাতে দিয়ে বললেন, এই ঘোড়ায় চেপে সূর্যাস্তের মধ্যে তুমি যতটা পথ অতিক্রম করে ফিরে আসবে তার পুরোটাই আমি তোমাকে নিষ্কর জমিদারি দেব।

দুঃখিনী মায়ের মুখ আবারও বসন্তের চোখে ভেসে উঠল। কোনও কথা না বলে রাখালীয়া বসন্ত এক লাফে ঘোড়ায় চাপল, আর প্রান্তরের দিকে ঘোড়া ছোটাল। বাদশাহী অশ্বও যেন তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়াল। সূর্য ডোবার আগেই বসন্ত ফিরে এল। পেছন পেছন বাদশাহের খবরদারি সৈন্য। প্রায় পুরো পরগনা বাদশা বসন্তের হাতে তুলে দিলেন। সাথে দিলেন একজন বিশ্বস্ত সৈন্যাধ্যক্ষ আর নগর নির্মাণের প্রয়োজনীয় উপদেশসহ এক বাস্তুকার। অনেক ধনরত্নও দিলেন। ধীরে ধীরে গড়ে উঠল রাজপ্রাসাদ। রাখালবালক বসন্ত হলেন বাজ বসন্ত খ্যাত রাজা বসন্ত রায়। গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের আস্থাভাজন রাজা বসন্ত রায় দীর্ঘদিন রাজত্ব করে মল্লহাটির নাম উজ্জ্বল করে গেছেন। সে রাজাত্ব — রাজপ্রাসাদ আর নেই বটে, আজো তাঁর নির্মিত দেব দেউল সাঁওতাল পরগনার মলৌ টিকে আছে।

জাতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামত

শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়

১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় ২৭তম কংগ্রেস অধিবেশন হয়। বিষ্ণু নারায়ণের সভাপতিত্বে প্রথম 'জনগণ মন' গানটি কবিগুরুর বোনঝি সরলাদেবীর নেতৃত্বে সমবেতভাবে গাওয়া হয়। ওই সময় পঞ্চম জর্জের কলকাতায় আসা উপলক্ষ্যে এক সাজো সাজো রব উঠেছিল। গানটি ওই সময় রচিত। কবিগুরু জনসমক্ষে এ বিষয়ে কোনো বক্তব্য না রাখলেও কুলীন বিহারী সেনকে একটি পত্র দিয়ে লেখেন, গানটি তাঁকে কোনো এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি পঞ্চম জর্জকে তুষ্ট করার জন্য রচনা করতে বলেছিলেন। কবির সেই প্রস্তাব পছন্দ হয়নি। তিনি 'ভারত ভাগ্য বিধাতার' জয়গান করে এই গানটি রচনা করেন। সেই যুগ-যুগান্তরের মানব ভাগ্যরথচালক পঞ্চম বা ষষ্ঠ জর্জ যে কোনোভাবেই হতে পারে না সে কথা কবিগুরু কেন, তৎকালীন রাজকর্মচারীরাও উপলব্ধি করেছিলেন। ১৯৩৯ সালের ২৯ মার্চ শান্তিনিকেতন থেকে কবি সুধারানি সেনকে বলেন, 'শাশ্বত মানব ইতিহাসের যুগ যুগ ধাবিত পথিকদের রথযাত্রার চিরসারথী বলে আমি চতুর্থ বা পঞ্চম জর্জের স্তব করতে পারি এরকম অপরিমিত মূঢ়তা আমার সম্বন্ধে যারা ধারণা করতে পারে তাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আত্মঅবমাননা।'

গানটি সম্বন্ধে কবির অভিমান ও গরিমা যে উন্নতির স্তরে ছিল তা বলাইবাহুল্য। সেই কারণেই তার প্রতিবাদ এত জোরালো ছিল। স্বাধীন ভারতবর্ষের এই গানটির প্রথম স্তবকটুকু জাতীয় সঙ্গীত রূপে সংগৃহীত হয়েছে। গানটি যেহেতু জাতীয় সঙ্গীত তাই যে কোনও স্থানে যে কোনও সময়ে গাওয়া যায় না। আর যদি কোনও অনুষ্ঠানে এটা গাওয়া হয় তাহলে গানটির যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে হয়। ভারতবর্ষের ছোটো প্রদেশগুলির পারস্পরিক বৈচিত্র্য তথা মানুষে মানুষে সম্প্রীতি ও সৌহার্য্যের চিত্র এই গানটির ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত হয়েছে।
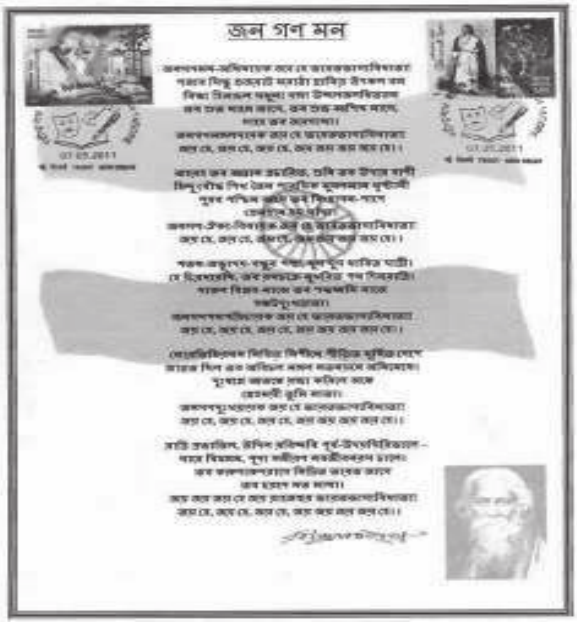
তারা খসার উপন্যাস

বিবর দত্ত

ইংরেজি নববর্ষের পাঁচটা ক্যালেন্ডার হাতে রোল করে ২৪ এ বাস থেকে নামল প্রিয়ব্রত। উঠেছিল কলেজ স্ট্রিট মোড় এমজি রোড থেকে। মনোবীণা পাবলিশিং হাউসে উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি জমা দিয়ে ফিরছিল প্রিয়ব্রত। প্রকাশক হরিদাস তালুকদার তার রোহিনী নন্দন পাবলিশিং থেকে এ ক্যালেন্ডার লেখক, পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি বছর দিয়ে থাকেন। ক্যালেন্ডারের দীর্ঘ এক পাতায় বারো মাসের তারিখ সহ তিথি পালপার্বণ ও ভারতীয় মনিষীদের জন্ম মৃত্যু হিন্দু, মুসলিম, খৃষ্টানদের স্মরণীয় দিনগুলিকে বিশেষ ছবি সহ তার প্রকাশন সংস্থা থেকে যে সব বই ছাপা চলছে, সেই বইয়ের ছবি ছাপা হয়েছে। রোহিনী নন্দনের অফিসে বসে প্রিয়ব্রত তার নিঃসঙ্গতার অক্টোপাস গ্রন্থের ছবি দেখে খুশি মনে বাস থেকে নামল বটে— এখান থেকে বেশ দূরে তার ভাড়া বাসা। সি রোডের বিবেক নগর। অটো আছে, টোটো নেই। অটো যাবে কোনা রোড, টোটো যাবে সি রোড হয়ে ভট্ট নগর। প্রিয়ব্রতকে যান সমস্যা দেখে অটোতেই উঠতে হল। বামুনগাছী বাজার নেমে সে আরও অবাক হল। যাবার সময় দোকানপসার ছিল খোলা। এখন সাতটা না বাজতেই সব বন্ধ। ধর্মঘটের চেহারা।

বামুনগাছী বাজার নেমে প্রিয়ব্রত কুমোরপাড়ার গলি দিয়ে ঢুকতে দেখল মীটসপ, মুদি দোকান, টেলারিং সব বন্ধ। শুধুমাত্র চারতলা বিল্ডিং এর নীচে নামহীন একটা লন্ড্রি খোলা। যে লন্ড্রিটা খোলা সেখানে প্রিয়ব্রত দু'-চার দিন এসছে। দেখেছে, খোলা লন্ড্রির ভেতরে যেখানে ইস্তিরী করা হয় সেখানে বছর পাঁচ-ছয়ের একটি মেয়ে বসে। তার চোখ দু'টো ভারি সুন্দর— পার্লেজী বিস্কুটের ছবির মতো মেয়েটির চোখ দু'টো বেশ ডাগর ডাগর চাউনি। প্রিয়ব্রত কী মনে করে পাঁচটা ক্যালেন্ডারের বাঁধন খুলে একটা ক্যালেন্ডার মেয়েটির হাতে দিয়ে এল বাদিকের রাস্তায়। স্বামী-স্ত্রীর মিলিত রেস্টুরেন্ট 'পেটপুরে' খোলা আছে। প্রায় মাস দু'য়েক হল প্রিয়ব্রতর স্ত্রী নিশিতা নেই। গেছে মায়ের বাড়ি। অর্থাৎ প্রিয়ব্রতর শাশুড়ীর কাছে। কবে ফিরবে তা বলেনি।

কারণ, বিয়ের দু' বছর কেটে গেলেও নিশিতা মা হতে না পারার জন্য অবশ্য দু'জন দু'জনকে দোষ দিয়েছে। চাপা ঝগড়া, কথাবার্তায় অশ্লীলতা গালিগালাজ সহ্য করতে না পেরে প্রিয়ব্রত গাইনি ডাক্তার দেখিয়েছে। সেই ডাক্তার অবশ্য পিতৃত্বদানে অক্ষম প্রিয়ব্রতকে গোপনে জানিয়েছে। তবে হ্যাঁ— সেক্সের যে ইচ্ছা তা কিন্তু প্রবল আছে প্রিয়ব্রতর। কিন্তু বীর্যের শুক্র কীট নেই। চিকিৎসা করালে ভালো হবে। ব্যয় সাপেক্ষ জেনে প্রিয়ব্রত থমকে গেছে।

মেয়ে মৌনীকে লন্ড্রিতে বসিয়ে তোয়া ঘরের নানা কাজকর্ম সারে। কিন্তু আজ সন্ধ্যেয় তোয়া বাগচী গেছল লখিন্দর ধোপার কাপড় কাচার চৌবাচ্চার ধারে। সেখান থেকে ফিরে এসে দেখল কে একটা সুন্দর ক্যালেন্ডার দিয়ে গেছে।

বাহ্ দারুণ তো, ঢাউস ক্যালেন্ডারের উপর নীচে নানান বইয়ের ছবি। কে দিল ?— মৌনীকে জিজ্ঞেস করতে মৌনী নিজের ডান হাতের তিন আঙুলে থুতনি নাড়াতে নাড়াতে বলল, সিরিয়ালের অরণ্য দেব আংকেল।

অরণ্যদেব— সে আবার কে রে মৌনী ? হাসি পেল তোয়ার। কে অরণ্য দেব। আজকাল লন্ড্রিতে বসে বসে মৌনী অনেককে চিনে ফেলছে। যাকে তোয়াও হয়তো চেনে না। তোয়া এমনটা ভাবতেই প্রিয়ব্রত সকালের কাচা ইয়েলো ও গ্রিন কালারের দু'টো পাঞ্জাবী নিয়ে ফের এল। নাম ও সাইন বোর্ডহীন সেই লন্ড্রিতে।

মৌনী এবার তাকে দেখে তোয়ার দিকে তাকিয়ে ক্যালেন্ডারটার দিকে তাকাতেই তোয়া বুঝল ক্যালেন্ডারটার মালিক ইনি। তবু তোয়া বলল, আপনি দিয়েছেন ক্যালেন্ডার ?

হ্যাঁ।

কত দাম ?

দাম নয়। আমি বই লিখি। এটা বইয়ের প্রকাশক দিয়েছে বিনামূল্যে। ও সরি, আপনি লেখক। — তোয়া বলল বটে, অথচ তার চোখ প্রিয়ব্রতর গায়ে পাঞ্জাবীর ফাঁকে উঁকি দেয়া বুকের পশমের দিকে। তোয়ার মন বলল, মৌনীর বাবার মতো এ মানুষটাও দীর্ঘ পশম থাকা লোমশ পুরুষ।

তোয়ার মনে পড়ল, কলেজে এক সময় তনিসা বলেছিল, লোমশ পুরুষের শরীরে যত মায়া মমতা— আবার ওদের মধ্যেই থাকে ভীষণ কামুকতা।

কী ব্যাপার, কিছু ভাবছেন ?— বলল প্রিয়ব্রত। তোয়ার চিবুকের সৌন্দর্য্য প্রিয়ব্রতকে মুগ্ধ করে ফেলছে। আশ্চর্য এ যে নিশিতার বোন বলে মনে হয়। নিশিতারা থাকে গোসাবা সুন্দরবনের কাছে।

ও— হ্যাঁ, কী বললেন ? কিছু ভাবছেন ? হ্যাঁ— ভাবছি তো বটেই।

কী ?

ভাবছি, আপনাকে দেখতে অরণ্য দেবের শরীর। অথচ আপনার ভেতরে নরম কল্পনা থাকা মন।— তোয়ার চোখ প্রিয়ব্রতর চোখে তুলে দিল। তারিফ করল প্রিয়ব্রত মনে মনে। মুখে বলল, এখনকার লেখকরা বাস্তবতাকে মেনেই লেখনি ধরছে।

হ্যাঁ— ঠিক বলছেন। বাস্তব জীবনে আমি ধোপার পেশায়— বাস্তবকে এড়িয়ে গেলে মনের গভীরে অশান্তি হয়। তোয়ার একথায় প্রিয়ব্রত বলল, আচ্ছা একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে। আপনি কী ডোভার লেনে নৃতাঙ্গনায় নৃত্য— হ্যাঁ ওই নাচ শিখতে গিয়ে বি.এস.সি.-টা দেওয়া হয়নি। তার পর বাবা-মায়ের এক সঙ্গে অ্যাক্সিডেন্টে মৃত্যুর পরবর্তীতে এক স্বর্ণ শিল্প ব্যবয়াসীর পুত্রবধূ হলাম। আবার এক সময় রাজনীতি করার অপরাধে ওর বাবা ওকে ত্যজ পুত্র করেছিল। বলে তোয়া ফের অন্য প্রসঙ্গ তুলে বলল, আপনার এই শার্ট দু'টো লাগবে কবে ?

পরশু সকালে।

নাম ?

প্রিয়ব্রত দে।

বেশ আমি না থাকলেও এ মৌনী থাকবে। ওকে দেখিয়ে দেব ও দিয়ে দেবে। সে কী আপনি ? প্রিয়ব্রতর জিজ্ঞাসার খুশি হল তোয়া বাহ্ এই তো চাই। আমাকে জানো— ঘরে একা সমস্ত কাজ করতে হয় ?

প্রিয়ব্রতর কথার জবাবে তোয়ার মন কথা বলল ধোয়া কাচাকাচি? দারুণ প্রিয়। একেই না বলে মনের মানুষ। মনে মনে বলল তোয়া। মুখে উত্তর দিল— না, না, ধোয়া জামাকাপড় সব যে করে তাকে একটা অংশ দিতে হয়। আমি লন্ড্রিতে অর্ডার নিই শুধু।

নামহীন, সাইন বোর্ডহীন চারতলার নীচে ছ' হাত বাই দশ হাত লন্ড্রিতে এল প্রিয়ব্রত। সন্ধ্যে ঘনাবে ঘনাবে ভাব। দেখল মৌনী চেয়ারে বসে তার এক হাতে দু'টো কাপড়ের পুতুল। প্রিয়ব্রতকে কিছু বলতে হল না। মৌনী চেয়ার থেকে নেমে দে ছুট। হতবাক প্রিয়ব্রত। লন্ড্রির উল্টো দিকে একটা গলি। গলির দু'পাশে সারি সারি একতলা এক কামরা দু' কামরার পাকা ঘরবাড়ি। এইটুকু দেখতে দেখতেই সবুজ লাল নাইটিপরা তোয়া ডান হাত তুলে একটা হাত ইশারা দিতে দিতে এগিয়ে এল। লন্ড্রিতে ঢুকতে ঢুকতে বলল, আপনার লেখা একটা বই দেবেন, গল্প, উপন্যাস পড়িনি কয়েক বছর হল। তাছাড়া ইদানিং আমার সময় কাটে না।

কেন টিভি?

খবর ছাড়া ওই প্যান প্যানানি সিরিয়াল ভালো লাগে না। তাছাড়া আমার দেখার চাইতে পড়ার নেশা। এই পড়ার জন্য আমি কত বকা খেতাম মায়ের কাছে। মা বলত, যতই পড়িস তোয়া— এ ঘর ছাড়লে তো তোকে আবার সেই হেঁশেল ঠেলতে হবে।

মায়ের এই কথাটা মনে রেখে আমার যখন রাজচন্দ্রের সঙ্গে ভালোবাসা হল। ও বলেছিল, তোয়া তুমি যা চাইবে না তাই পাবে।

মানে!

আমার সঙ্গে বিয়ে হলে ঘর ভর্তি মানুষজন। রান্নাবাড়ি— রোজই যেন বিয়ে বাড়ি। লোকজন আসছে যাচ্ছে, ফের আসছে। ভিড় লেগেই আছে। বিশ্রাম নেই। অথচ তুমি চাও ভীড় ভাট্টা না থাক।

চুপ ছিলাম রাজচন্দ্রের কথায়। মনে মনে বলেছিলাম, কলকাতার ভীড় নির্জনতাকে ডাকায়। ডানকুনি ছাড়িয়ে গোবরা বেগমপুরেও যে এত ভীড় তা একবারের প্রণামীতে গিয়ে টের পেয়েছি। তা আমার মনের ইচ্ছা ওপরওয়ালা জানতে পেরেছিল। বিয়ের মাসেই উকিলের চিঠি তে জানতে পারলাম, আমি আর আমার স্বামী ত্যাজ্য।— বলে থামল তোয়া।

প্রিয়ব্রত এবার ওর দেওয়া ক্যালেন্ডারের দিকে আঙুল চেপে বলল, এই বইটা পড়বেন? এই নিঃসঙ্গতার অক্টোপাস।

বাহ্ সুন্দর নাম। নির্জনতা আর নিঃসঙ্গতা— আমি নির্জনতা চাইলেও নিঃসঙ্গতা আমায় চেপে ধরেছে।

কেন? আপনার তো মৌনী আছে। আমার— আমি একা।

সেকি! আপনার স্ত্রী— তোয়া অবাক হল।

নামে মাত্র। কাছে নেই।

কেন?

ও মা হতে পারেনি বলে রাগ করে সুন্দরবনে মায়ের কাছে গিয়ে উঠেছে।

কবে?— মুখে জিজ্ঞেস করলেও তোয়া মনে মনে বলল, যাক প্রিয় আমি তো আছি। আমার নিঃসঙ্গতাকে আমি তোমাতে মেলাব, দু'জনের নিঃসঙ্গতাকে মুখর করে তুলব।

তোয়ার চেহারায় নিশিতাকে পেয়ে প্রিয়ব্রত ভেতরের খুশিকে বুঝতে না দিয়ে বলল, আপনিও যে নিঃসঙ্গ এটা বুঝতে পারিনি।

পারলে?— মুখ তুলে তাকাল তোয়া। প্রিয়ব্রতর ভেতরে উচ্ছ্বাস সামলে বলল, বলব অন্য দিন, অন্য সময়। আপনি আমার বইটা পড়ে নিন। বারে বইটা দিলেন কোথায়?

এই যাচ্ছি। লন্ড্রি খোলা আছে তো।

লাল সবুজ প্রচ্ছদে বনের গভীরে একাকী হলুদ নারীর পথ চলা ছায়া মূর্তি ঘাড় বেঁকিয়ে তাকানো— বইটা তোয়ার হাতে দিতে তোয়ার চোখে খুশি এনে ক' মুহূর্ত থমকালো। প্রিয়ব্রত দেখে। তোয়া এক হাতে বইটা ধরে অন্য হাতে সেই ছায়া মূর্তির গায়ে টোকা দিতে দিতে বলল, এই তো আমার পেয়েছ তুমি। আর আমি হাঁটতে হাঁটতেই তো তোমায় পেয়েছি এভাবে তাই না প্রিয়?

ভালোবাসার নিটোল সলিলে তোয়া ছিপ ফেলল তুমি সম্বোধনে। বুঝতে পেরেও প্রিয়ব্রতর দৃষ্টি স্থির। সে ভাবল, স্বামীহারা এই নারী কী সত্যিই নিঃসঙ্গ? যদি তাই হয় তাহলে নিঃসঙ্গ এক পুতুল পুরুষকে যেভাবে খেলতে চায় খেলুক, কোনও বাধা দান নয়। চালাক নিঃশর্ত খেলা।

একজন বয়স্ক দোকানদার গত রাতে কোভিডে মারা গেছে। ফলে সকাল থেকে প্রায় সমস্ত দোকান বন্ধ। তোয়ার নামহীন লন্ড্রির দোকান খোলা। পথ ফাঁকা। প্রিয়ব্রত স্বামী-স্ত্রীর— সেই 'পেটপুরে' রেস্টুরেন্টে এসে দুপুরে চারটে পরোটা ডিমকারী দিয়ে খেয়ে ফিরছিল। টি শার্ট আর পাজামা পায়ে প্লাস্টিক চপ্পল।

একে দোকানদার তাই করোনায় মৃত্যু। পুলিশী টহলে প্রায় সুনশান রাস্তা ঘাট। সময় দুপুর। প্রিয়ব্রত হাঁটছিল তড়িঘড়ি নয়। স্বাভাবিকভাবে একসময় তোয়ার সেই নামহীন লন্ড্রির কাছে যেতেই তোয়া তাকে টেনে লন্ড্রির ঘরে ঢুকিয়ে শার্টার টেনে ভেতর থেকে বন্ধ করতে করতে বলল, ভয় নেই, চেয়ারে বোস প্রিয়। কথা আছে। তুমি লেখক, কখন কোথায় পাব জানিনা। তবে পেয়েছি যখন সহজে ছাড়বোও না।

কী করবে তোয়া? আমি সমর্পিত। তোমাতেই হারাতে চাই।

বাহ্ প্রিয় এভাবেই এসো আমার জীবনে নির্জনতা নয় সঙ্গতা চাই।— এ কথা মনে মনে বলল তোয়া। মুখে কথা ফুটিয়ে বলল, তোমার লেখা বইটাতে নারিকা পিতৃমাতৃহীনা মুকাভিনেতা হলেও মুখরা।

নায়ক সম্পত্তিবান জাতপাতহীন নির্লোভী, যে কোনও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে সে প্রস্তুত। এই না হলে নায়ক।— বলে তোয়া টিফিন কেরিয়ারে আনা লুচি পায়েস খুলে সেই কেরিয়ারের ঢাকনাতে চারটে লুচি খানিকটা পায়েস স্টিলের চামচে তুলে দিতে দিতে বলল, জান প্রিয়, আমি স্কুল-কলেজ লাইফে খুব বই পড়তাম বলে মা রাগ করত। বাবা আমায় সাপোর্ট করত।

তোয়ার দেওয়া লুচি থেকে একটা লুচিতে দু' চামচ পায়েস তুলে রোল করে খেয়ে প্রিয়ব্রত বলল, খানিক আগে আমি পেটপুরের দোকান থেকে পরোটা খেয়ে এসছি।

লন্ড্রির বদ্ধঘরে কথা বলতে প্রিয়ব্রতর অসুবিধা হতে পারে ভেবে তোয়া স্পিডে পাখা চালাল। জিরো পাওয়ারের সবুজ লাইট জ্বালাল। খাওয়া শেষ হলে তোয়া তোয়ালেতে হাত মুখ মুছতে মুছতে বলল, কিছু ভাবছ প্রিয়?

না। শুধু দেখছি।

কী, কাকে?

তোমাকে— প্রিয়ব্রত এই প্রথম তোমার মন পুকুরে জাল ফেলল।

তোমার নায়িকা অর্থাৎ স্ত্রী ফিরবে কবে?

কেন বলতো তোয়া? তাকে নিয়ে ভাবনা কোরনা।— প্রিয় একথা বলে নিজের চোখ তুলে দিল খানিকক্ষণ। নীরব সময় সরে গেলেও দু'জনের চোখ যেন বেপরোয়া হতে চাইল। মুখের নীরবতাকে ভেঙে তোয়া বলেই ফেলল, এসো প্রিয়। মৌনীর অরণ্য ছুঁতে দাও। আমি মৌনীর অরণ্যে হারাব।

বাহ্ তোয়া কথায় তুমি দারুণ উন্নতমনা। কাজেও তুমি নিজেকে এভাবে ভাঙতে চাইছ?

হ্যাঁ প্রিয় আমার এই শরীর নাচের ছন্দে ছন্দে কত বার যে ভেঙেছি।

তোয়া গড়ব আমি তোমায়— তবে এখানে নয়। অন্য কোনওখানে, অন্যভাবে, অন্য সময়।

হ্যাঁ প্রিয়। আমি জানি, তুমি লেখক, চলছে তোমার মনেও ঝর্না প্রপাত। তার বিরাম নেই। তুমি লিখবে ভাঙা গড়ার কথা। মানুষের ইতিকথা। পারত তোমার দেহারণ্য দিয়ে ঢেকে দিতে আমায়। আমি এ যাত্রা তোমার ডিসিশন মেনে সংযত হয়ে যাচ্ছি।

তোয়া তোমার মধ্যে খসে পড়া তারার সন্ধান পাচ্ছি। যে নক্ষত্রগুলো আমায় উদ্বুদ্ধ করছে। বলছে, আমাদের নিয়ে লিখবে কিন্তু।

প্রিয় আমি চাই, তোমার মনের গ্রহগুলো আমার এই দেহ গহ্বরে এসে আশ্রয় নিক। তাতে যদি ওরা কুরুক্ষেত্রের লড়াই করে করুক।

তোয়া!

একজন তো থাকবে। সে তোমার অবয়ব তো পাবে প্রিয়।

তোয়া তোমার কথাগুলো হেঁয়ালির মতো মনে হচ্ছে এখন।

তুমি লেখক প্রিয়, তোমার চোখ, তোমাকে চেনাতে আমাকে সাহায্য করেছে। আমি গর্ভ দিতে চাইছি, শান্ত অশান্ত গ্রহগুলো আমাতে আশ্রয় দাও। নাও। যে ভাবে পার তোমার চাহিদা মেটাও।

কামনা বাসনা জড়িত দু'জনের চোখের কথা শেষ করে প্রথম তোয়া আবেগে মথিত হয়ে প্রিয়ব্রতর মুখোমুখি দাঁড়াল। দু'হাতের আবেষ্টনীতে বুকের কাছে টেনে তোয়া নিজের মাথাটা প্রিয়ব্রতর বুকে চেপে ধরতে প্রিয়ব্রতর মধ্যে সচেতনতা জাগ্রত। তার মনে হল এটা লন্ড্রি। এটা বসবাস করা ঘর-বাড়ি নয়। যদিও তোয়া নিজেকে সামলাতে পারছে না। কিন্তু প্রিয়ব্রত সজ্ঞানে ন্যায়, অন্যায়, উচিত, অনুচিত বোধে আক্রান্ত হল। আবেগ বা কামাবেগ তার বৃন্তে-শিরায় শিরায় বইলেও তাকে সামলে এতক্ষণে মুখ খুলে কথা বলল, তোয়া তুমি যা চাইছ, আমিও তার বাইরে নেই। কিন্তু এখানে নয়। নিশিতা মা হতে না পেরে রাগ করে মায়ের কাছে গেছে প্রায় ছ'মাস হয়ে গেছে। এখন আমার ঘর ফাঁকা। দিনের বেলা যখন ইচ্ছে যেতে পারবে।

প্রিয়ব্রতর কাছ থেকে সাদরে এমন আহ্বানে তোয়া দারুণ খুশি হল। ওর চোখে তার ছায়া দেখে প্রিয়ব্রত ফের বলল, তুমি তো নিশিতাকে দেখনি। দেখলে বুঝতে। ঠিক যেন তোমারই প্রতিমূর্তি। অর্থাৎ দুই বোন। চাইলে শালী বলেও মেকআপ দিতে পারবে। কী বলো? ইয়েস। তুমি যাবে আমার ঘরে। মৌনিকেও নিয়ে যাবে। সে যাব। কিন্তু এখন তুমি কোথায় যাবে? তোয়া বলল। তার গলার স্বরে প্রিয়ব্রত বুঝল, তোয়া কামাবেগে সম্পূর্ণ আক্রান্ত। তোয়া বলল, আমি তোমার সঙ্গে এখনই যাব। লোকেরাও চিনে নিক তোমার শালীকে। শুধু লোকেরা কেন তোয়া— আমি তোমায় চিনতে চাইছি। মনে মনে একথা বলল প্রিয়ব্রত। প্রকাশ্যে বলল, চলো, তাহলে কদমতলা আমার সঙ্গে।

চলো।

নামহীন লন্ড্রির শাটার নামিয়ে তোয়া প্রিয়ব্রতর পিছু পিছু এল। দশ মিনিটের হাঁটা পথ। এল পাটার্নের বাড়ি। দু'কামরা ঘর। চাবি প্রিয়ব্রতর কাছে। দরজা খুলে সুইচ টিপে পাইপ লাইট জ্বালাল। বাইরে আবার এখানে সেখানে খানা-খন্দ, বাঁশঝাড়। দেখছিল প্রিয়ব্রত বাথরুম ঢুকে হাত-পায়ে সাবান ঘষছিল। তোয়াও হাজির। কই কারো সঙ্গে তো তোমার দেখা হল না। হাত-পা ধোবে?— প্রিয়ব্রত বলল অন্য কথা। তোয়া কথার উত্তর না দিয়ে, তোয়া সাবান না দিয়ে দু' হাতে চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে শুধু জলে দু' পা ধুল। নাহ্ বাড়িটা দারুণ। কাছাকাছি। অন্য ঘর বাড়ি নেই। প্রিয়ব্রত কথা খুঁজে না পেয়ে বলল, চা করছি। তুমি বরং চেয়ারটাতে বোস তোয়া।

বসব, কিন্তু তোমাকে বলি, তুমি কী এমন ফাঁকা ঘর.....

মানে?

আমার গায়ে আগুন জ্বলছে। প্রিয়, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না?

একথা বলতে বলতে তোয়া নিজে এগিয়ে দরজা বন্ধ করে প্রিয়ব্রতর একটা হাতের কব্জি ধরতে— প্রিয়ব্রত বলল, আজই।

এক্ষুনি। জ্বলছি, নেভাও।

এই মেঝেতে।

হ্যাঁ প্রিয় মাটিই খাঁটি, পূত পবিত্র মাটি সব অপবিত্রকে সুষে নেয়। নতুন জীবন দেয় এই মাটি।

সেই প্রথম তোয়ার দেহ গাছের ফুলে প্রিয়ব্রত নামক প্রজাপতি বসল। প্রিয়ব্রতও ভেতরে ভেতরে কামাবেগের চোরা শিহরণে তেতে ছিল। যদিও দু'জনের তাপিত শরীর ইতিপূর্বে প্রিয়ব্রতর ক্ষেত্রে নিশিতা, তোয়ার ক্ষেত্রে রাজচন্দ্র— মৌনির জন্মদাতা। তোয়ার প্রথম পুরুষ স্বামী রাজচন্দ্র নামক এক পুরুষের সান্নিধ্য পেয়েছিল। তবু দীর্ঘ না পাওয়া পর এই প্রথম যেন নতুন করে তৃপ্ত হল দু'জনে।

সে রাতে বাড়ি ফিরে ঘুমন্ত মৌনীকে জেগে পুতুল খেলা করতে দেখে তোয়া দারুণ খুশি হল। ভাগ্যিস কান্নাকাটি করেনি। দুপুরের আগে করা রুটি, পালংশাক খেয়ে শুয়ে শুয়ে মৌনীর মুখে স্তন গুঁজে দিতে তোয়ার মনে হল, তার শরীর ভাঙার সময় প্রিয়ব্রতর চোখ কত কথা বলে। তখন দারুণ লাগে ওকে। প্রিয়ব্রতর ওই চোখের দৃশ্য তোয়া মনের ক্যামেরায় নতুন করে ধরতে একদিন ভোর ভোর নাগাদ এল, শীতের রাত। মৌনী লেপের মধ্যে। নাইটি খুলে লাল কালো বর্ডারের শাড়ি পরে বাজারের ব্যাগ নিয়ে প্রিয়ব্রতর ঘরের দরজার কড়া নাড়ল। প্রথমটায় প্রিয়ব্রত অবাক। দরজার উপরিভাগে খানিকটা কাঁচ লাগানো, তাতে চোখ দিয়ে প্রিয়ব্রত দেখল, শ্যাম্পু করা খোলা চুল নিয়ে শাড়ি পরিহিতা তোয়া।

দরজা খুলে প্রিয়ব্রত বলল, পথে চেনা কেউ দেখেছে?

হ্যাঁ. রাত জাগা পথের প্রাণী। এখানে ওখানে ঘুমোয়। ওদের চোখ ফাঁকি দেব কী করে?

ও। ওই চেয়ারটায় বোসো তোয়া। প্রিয়ব্রত যে খাটে শুয়ে তার তিন হাত দূরে দু'টো চেয়ার— সেখানে একটাতে বসতে তোয়াকে প্রিয়ব্রত ফের বলল, হ্যাঁ এবার বলো এই সাত সকালে কী মনে করে?

জান প্রিয়, ওই সন্ধ্যাটাকে আমি ভুলতে পারছি না। ওই সন্ধ্যা আমাকে দারুণ সুখ দিয়েছে।

আর আমাকেও সাহসী করে তুলেছে। দরজা বন্ধ করে এসো এই লেপের মধ্যে।

প্রিয় কাল রাত থেকে একটা কথা ভাবছি।

কী বলো?

আমাদের চার পাশে এখনো অনেক সমস্যা— রাস্তাঘাট কাঁচা, পানীয় জল, নর্দমা নেই। ভাবছি, তোমায় নিয়ে জেলা পঞ্চায়েত ভবনে যাব একদিন।

হ্যাঁ তোয়া, তোমার আমার জীবন যুদ্ধের সঙ্গে সবার জীবনকে জুড়তে হবে।

প্রিয়। তোয়ার এই ডাকার ভাব প্রিয়ব্রত জেনে গেছে। তোয়ার ইচ্ছে তোয়ার অভাব। তোয়া শাড়িটা খুলে এসো। প্রিয়ব্রতর কথামতো তোয়া দেহ থেকে শাড়িটা খুলতেই ওর ভারি স্তন দেখে প্রিয়র মনে হল রাগ দেখিয়ে যাওয়া নিশিতার স্তন দু'টোর মধ্যে একটা নেই। খেলতে খেলতে গরম ফ্যানের মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে— ঘা। সেই ঘায়ে ওষুধ না লাগিয়ে অন্যের কথা শুনে নানা টোটকা লাগিয়ে একদিন হাসপাতালে যেতে নার্সরা সেই ঘা ফের অপারেশন করাতে নিশিতার অন্য স্তনটাকে দুগ্ধবতী গর্ভধারিণীর মতো লাগত দেখতে। যা দেখে ওর মা শাড়ি জড়িয়ে মেয়ের বর পক্ষকে ঘটনাটা বলত না। এভাবে কয়েকটা দেখাশোনার বর পক্ষ ফিরে যেতে নিশিতা-প্রিয়ব্রতর বেলায় নিজ মুখে ঘটনাটা ব্যক্ত করে বলেছিল, আমার এই গতরটা সে তো দেখবেই। তার কাছে লুকোব কেন?

পাত্রী নিশিতার এই ব্যক্ত— প্রিয়ব্রতকে রাজী ও জেদী করে তুলেছিল

নিশিতার বাবা নেই। নেই অন্য ভাই-বোন বা আত্মীয়। মাত্র চার ক্লাস পাশ জেনেও প্রিয়ব্রত বিয়ে করেছিল নিশিতাকে। অথচ ধৈর্য্যহারা হয়ে সে সুন্দরবনে মায়ের কাছে চলে গেল। যাক।

প্রিয়ব্রত তোয়ার মধ্যে নিশিতাকে পেয়েছে। সেই তোয়া এখন প্রিয়ব্রতর বিছানায় লেপের মধ্যে ঢুকে ঠান্ডা হাত দু'টো নিজের নাভিতে চেপে বলল, প্রিয়, তুমি কি কিছু ভাবছ?

কেন বলতো তোয়া?

তুমি তো লেখক, আর আমিও নারী— বুঝতে পারি।

তোয়া।

বলো, তুমি সেদিন সন্ধ্যায় আমার গর্ভে বীজ বুনেছ। চারা টের পেলে আমি কিন্তু বাসা চেঞ্জ করব।

সেকি ওটা তোমার বাড়ি নয়?

না, ভাড়া। বলতে প্রিয় তোয়ার ঠান্ডা হাত দু'টো টেনে নিজের নাভিতে চেপে বলল, উনুনের আগুন ফেল। উষ্ণতা পাবে তোয়া। দারুণ গরম।

সেদিন ছিল সন্ধ্যা— দু'জনেই গরম ভাবনায় উদ্বুদ্ধ। আজ এত ভোরে শীতের শিশিরে ভেজা তোয়া তার লোমশহীন ঠান্ডা হাতে পুরুষের উষ্ণতায় আরাম পেতে পেতে বলল, জানো প্রিয়, সেদিন সন্ধ্যায় সামান্য ক' মুহূর্ত। কতটুকু মুভমেন্ট আর। ওতেই টের পেলাম তোমার পৌরুষতা। নিশিতা মাত্র একটা চাই ছিল। এক কেন, চাইলে তুমি বহু পুত্র-কন্যার জনক হতে পারবে।

— তোয়া তুমি যে উচ্চ শিক্ষিতা আধুনিকা— তোমার কথায় তারই ধারা উঠে এসেছে।— বলল প্রিয়ব্রত।

সেদিন সন্ধ্যায় তুমি আমায় ভেঙেছিলে প্রিয়। আজ সকালে আমি তোমায় ভাঙব।— তুমি গড়বে। সেদিন গড়ছিলাম বলেই না বলছি, আমার গর্ভে তুমি বীজ পুঁতেছ এটা নির্ঘাত। টের পাচ্ছি। বাহ্ তোয়া। এই না হল নারী। জন্ম রহস্য তুমি এমন সুন্দর বোঝ।

বুঝি বলেই বলছি, প্রিয় তোমার লেখা পড়ে। কলমে যেমন পেয়েছি তোমার যথার্থতা। বিছানায় সঙ্গ সুখেও দেখালে তোমার দক্ষতা।

সন্ধ্যা ও সকালের দু'দিনের মুহূর্তটা উপভোগের পর তোয়ার দেহের ভেতরে অতৃপ্ততা কাটল না। মনে হল, এখন একটা গোটা রাত ওকে ওর সঙ্গে কাটানো হল না। ভাবতে ভাবতে এক সময় সেই প্ল্যান বের করল তোয়া।

এটা পৌষ। আগামী মাঘ মাসের সতেরো তারিখে মৌনির জন্ম দিন। ওই দিনটাতে, উন্ম উৎসবের বাহানায় প্রিয়ব্রতকে কাছে পেতে সুবিধে হবে। ওই দু'দিনের সন্ধ্যা সকালের উপভোগটা যেন ফুরৎ করে উড়ে গেছে। এদিকে বেশ কিছু দিন হল প্রিয়ব্রত আসছে না লন্ড্রিতে। সেও যেতে পারেনি মৌনির শরীর খারাপ জেনে। লন্ড্রির চেয়ারে বসে অর্ডার নেওয়া সাপ্লাই দেওয়া করতে করতে তোয়া সেদিন দুপুরে অনায়াসে পেয়ে গেল প্রিয়ব্রতকে। বলল, শ্রীমানজী, কোথায় গেছলে এতদিন।

কলেজ স্ট্রিট। লেখা জমা দেওয়া— রয়্যালিটি আনতে। কিন্তু তোয়া রাস্তা ফাঁকা—।

উমা জান না, কোভিডের গাড়ি অকারণে বাড়ির বাইরে বেরুতে মানা করেছে। ও হ্যাঁ, প্রিয় তোমার সঙ্গে একটা বিশেষ কথা আছে। আগে ভেতরে ঢুকে ওই চেয়ারটায় বোস। তোয়ার কথা শুনতে প্রিয়ব্রত মাথা নীচু করে লন্ড্রির ভেতরে ঢুকে প্লাসটিকের চেয়ারে বসল।

বলো তোয়া?

মৌনীর জন্ম দিন পালন করব।

ভালো কথা। তা কবে?

এটা পৌষ, মাঘের সতেরো।

ও,— বলে প্রিয় সিগারেট ধরাল। ওকে দেওয়ালে টাঙানো ধুমপানের সতর্ককতার বোর্ড দেখাল চোখের ইশারায়। প্রিয়ব্রত এবার কষে সিগারেটে টান দিয়ে বলল, ও ছাড়, কোথায়?

আমার ভাড়া ঘরে।— তোয়া বলতে প্রিয়ব্রত আঙুলের টোকায় জলন্ত সিগারেটের ছাই ফেলে বলল, কেন তোয়া আমার ঘরটা কি অপছন্দ?

সেকি! দেবে? তাহলে তো— থমকাল তোয়া। মনে মনে বলল, আমি যা চাই তাতে তোমার ঘরই সেফটি প্রিয়।

বেটার প্ল্যান। তোয়া অনুষ্ঠান বাড়ির জন্য আমার ঘর—।

হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রিয়, মৌনীর জন্ম দিন তাহলে, তোমার ঘরেই হবে। তারিখটা মনে রেখ, সতেরোই মাঘ।

সাত সকালে কলেজ স্ট্রিটের তিনটে প্রকাশকের সাথে সাক্ষাৎ ও পাওনা চেক নিয়ে সালকিয়া ইউবিআইতে চেক জমা দিয়ে হোটেলে ডিম ভাত খেয়ে প্রিয়ব্রতর টোটোতেই ঘুম আসছিল। তোয়া সেটা বুঝতে পেরে বলল, একা থাক, ঘুমুতেও সময় পাও না।

না। রাত জেগে লিখতে হয় তোয়া। চরিত্রগুলোর সঙ্গে সংসার করতে হয়। তা জানো?

কী করে জানব। আমি জানি, না জানতাম একদিন লোক নৃত্য, কত্থক, মনিপুরী, ওড়িশী।

আর তোয়া?

নাচে কীভাবে দেহকে ভাঙতে হয়, বাঁকাতে হয়, সেসব?

ও নাচের সঙ্গে যেসব গান হত তাকি মনে আছে তোমার?

হাসল তোয়া চোখে শুধু। শব্দ করল না। মুখে বলল সেই নাচ বন্ধ করতে দেহ ভারি হয়ে উঠছে।

থাকতো একা ঘরে, প্র্যাকটিস করতে পার না। প্রিয়ব্রতর একথার উত্তরে তোয়া লন্ড্রির পুরো খোলা শাটার খানিকটা নামিয়ে ধুমপানের সাইন বোর্ডটাকে উল্টে জামা প্যান্টের আলমারির কোণ থেকে একটা সিগারেট প্যাকেট থেকে বের করে ধরিয়ে বলল এই ধোঁয়ার মতো জ্বলছিলাম প্রিয়। তুমি খানিকটা নিভিয়েছ। সম্পূর্ণ নেভাতে?

না জানি, কত রাত ভোর হবে।— তোয়ার একথায় প্রিয়ব্রত জলন্ত সিগারেটের শেষ অংশটুকু টোকা মেরে ফেলে দিয়ে বলল, ও, হ্যাঁ, তোয়া। তোমার নাচের সঙ্গে সঙ্গে যে গান হত— হত কী? সেই গানের কলি মনে আছে কী?

কেন?

গানগুলোতে এক ধরনের আমেজ আছে। যা ভেতরটাকে শুদ্ধ করে। মনটাকে প্রশান্তি দেয়।— প্রিয়ব্রতর একথার সঙ্গে সঙ্গে তোয়া গুনগুন করে উঠল। যাওরে যোগী তুম যাওরে। এঁহা প্রেমী ওকি নগরী। এঁহা প্রেমহী পূজা। ঔরপূজারণ হু ম্যায়।

দারুণ দারুণ তোয়া। তুমি দেখছি, যথার্থ সাধিকা। শুধু পুরুষ পেলে—

বলল কেন, বিছানা ছাড়তে চাই না। দুই হলেও এক দেহে হারাতে চাই। প্রিয় তুমি যাই বল, সব মেনে নেব। তোমাকে দেখা থেকে আমি তাকে খুঁজে পেয়েছি। এ পাওয়া আমি হারাতে চাই না।

তোয়া।

বলো প্রিয়।

সন্ধ্যে নামছে। আমি যাব।

যাও। তবে মৌনীর ব্যাপারে আমি নিজেই যাব তোমার কাছে।

১২ মাঘ মৌনীকে লন্ড্রিতে বসিয়ে তোয়া গেল প্রিয়ব্রতর ভাড়া ঘরে। বেলা দশটা কত মিনিট হবে হয়তো। দরজার এক পাট খেলা দেখে দরজার কাছে তিন সিঁড়ি— নীচেরটায় দাঁড়িয়ে প্রিয়ব্রতকে ডাকতে গিয়ে থমকে গেল, ভেতরে অন্য কে একজন বসে চেয়ারে— সেই বলল, টয়লেট গেছে। আপনি?

তোয়া কথা বলল না। ততক্ষণে প্রিয়ব্রত টয়লেট থেকে বেরিয়ে তোয়াকে দেখে, এসো।

টুকল তোয়া। এক কালারের নীলশাড়ি সাদা ব্লাউজ পরা তোয়াকে প্রিয়ব্রত পরিচয় করাল। আমার শ্যালিকা সৃজনা গুহ।

তাই বলুন, আমি তো আপনার গিন্নি ভেবে, ভাবলাম বৌদি এতদিন বাদে বাপের বাড়ি থেকে বেড়িয়ে এসছে। আশ্চর্য। একই দেখতে।

সৃজনা ইনি আমার বাড়ির মালিক বৈকুণ্ঠ হালদার। উনি থাকেন বাদামতলা। এখান থেকে মিনিট কুড়ির পথ।

ও তোয়ার অস্ফুটে উচ্চারণ হলেও প্রিয়ব্রত থামল না বলল, এসছেন আমার একটা বই পড়তে নিয়েছিলেন। সেটা দিয়ে এই একনদীর তিন ঢেউ নিলেন।

হাসল বৈকুণ্ঠ বাড়িওয়ালা। বলল, শ্রীলঙ্কা যাব ২২ মার্চ। বইটাও পড়া হবে।

হাসল তোয়া ওরফে সৃজনা। ওর হাসির দিকে চেয়ে বৈকুণ্ঠ বলল, যদিও একবার গেছি, ভালো করে দেখা হয়নি।— ওর কথার উত্তরে প্রিয়ব্রত বলল, আপনার অফুরন্ত সময় টাকাতে ট্যুর করেন। আমার আবার লেখালেখিতে সময় খুঁজে পাই না। ও, হ্যাঁ ভালো কথা, আগামী ১৭ই মাঘ।— বলে মুহূর্ত থামলে ইংরেজী তারিখটা তোয়া ওরফে সৃজনা বলল, ৩১ জানুয়ারি।

হ্যাঁ— ওর মেয়ের জন্ম দিন অনুষ্ঠান হবে।— প্রিয়ব্রতর একথা শুনে বৈকুণ্ঠবাবুর মনের ধারণা ব্যক্ত করে বললেন। সেকি আমি তো ওনাকে অবিবাহিতা ধরেছিলাম। তা উনি থাকেন কোথায়?

সি রোডের বিবেক নগরে।

বিবেক নগরে নিজের বাড়ি?

না, ভাড়া।

ও, তাহলে বলতে পারব না। নিজের হলে পরিচয় দিলে চিনতাম। ওনার স্বামীর নাম?

রাজচন্দ্র দে।— তোয়া বলল। সে জানে তার স্বামীকে— বিবেক নগরের কেউ চিনতে পারেনি। কারণ, মৌনিকে পেটে নিয়ে তোয়া শ্বশুড় বাড়িতে স্বামীহারা হয়েছিল। এখন যে ভাড়া বাড়ি, এটা করে দিয়েছিল লখিন্দর ধোপা। বিবেক নগরের অনেকের ধারণা তোয়া লখিন্দরের দূর সম্পর্কের আত্মীয়।

রাজচন্দ্র দে, রাজচন্দ্র দে— বলতে বলতে বৈকুণ্ঠবাবু এমন একটা ভাব করলেন যেন চেনা— স্মৃতিহারাকে খুঁজছেন। চেয়ার ছেড়ে উঠে দরজায় গিয়ে দু' পা পেছনে এসে ফের বলল, ও তো একদিনের অনুষ্ঠান তাই তো?

প্রিয়ব্রত এবার তোয়ার নীলাভ শাড়ি, এক বেনী বাঁধা চুল ফিতে ছাড়া কপালে সোনালী টিপ দেখতে দেখতে বলল, কফি করব?

তোমায় করতে হবে না। আমি করছি প্রিয়?

গ্যাসে জল গরম চাপিয়ে তোয়া ফিরে এসে খাটে বসে বলল, ভালোই হল ভাড়া ঘরে অনুষ্ঠান— মালিককেও জানানো হল।

কিন্তু একটা ভুল হল তোয়া। ওকে এ অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করা হল না।

কিন্তু প্রিয়, আমি বলব একটা কথা?

বলো— কী ব্যাপার?

না করে ভালোই করেছ। লোকটার নজর ভালো নয়।

কী করে বুঝলে তোয়া?

আমি কলেজ পড়া, সিতানাথ ঘোষ লেনের মেয়ে। বারো বছর বয়স থেকে পুরুষ চোখ দেখছি। আমি চিনব না।

কফি ঠান্ডা হয়ে যাবে।— তোয়ার কথায় প্রিয়ব্রত বলল, ওটা তো বাইরের ঠান্ডা ভেতরে ঢুকবে। গরম করবে তুমি তোয়া।

যাহ্ দুষ্টু এভাবে বলে। যাই হোক উল্টোটা। আমিও বলতে চাইছিলাম। আমার তাতানো শরীরকে শীতল করবে তুমি প্রিয়।

এবার।

বলতে পার, গরু ঘোড়ার মুখে লাগাম আছে। তোয়ার মুখে লাগাম নেই। এই লাগামটা তো তুমিই একদিন এটে দেবে। তাই না প্রিয়?

লোকগুনতি চল্লিশ কিন্তু পঞ্চাশজনের রান্না লাগবে। ১৭ই মাঘ। ১৪ তারিখ থেকে তোয়া নিজে কাঁচা সবজি, মীট, দই মিষ্টি বাদে রাধুনির দেওয়া লিস্ট চাল, ডাল, তেল, নুন, মশলা, পাঁপড় ইত্যাদি কিনে এনে প্রিয়ব্রতর বাসায় ঢোকাল।

সেদিন কী মনে করে প্রিয়ব্রত দরজার তালার তিনটে চাবি থেকে একটা বের করে তোয়াকে দিতে তোয়া বলল, দিদির জন্য একটা চাবি রেখ। আর আমরা দু'জনে দু'টো রাখব।

ধূস তোয়া কী যে বলো।

কেন তোমার নিশিতা কী ফিরবে না?

কে জানে, আমার মতে সহানুভূতিশীল পুরুষ এদেশে আরও বহুত আছে। ওর একটা স্তন নেই জেনেও আমি জেদ ধরে ওকে জীবনে গ্রহণ করেছি, অথচ সন্তান না পেয়ে রাগ দেখিয়ে— ও কী এখনো একা আছে? দেখ গিয়ে তোয়া— ও হয়তো এত দিনে ওর মায়ের ঘরে ঘরজামাই করে কোনও সহানুভূতিশীল যুবকের বুকে আশ্রয় নিয়েছে।— প্রিয়ব্রতর একথার উত্তর তোয়া মনে মনে বলল, অত কেন ভাবছ প্রিয়। সেই যুবক যদি সহানুভূতিশীল হয়। তাহলে আমিও সহানুভূতিশীলা যুবতী। আমিও তো তোমাকে দু' হাতে আলিঙ্গনা বদ্ধ করে ধরে রাখব আমৃত্যু কাল। তোমার শরীর থেকে নেব দু'জনের উত্তরাধিকার।

১৭ মাঘ সকাল থেকে আকাশের মুখ ভার। আবহাওয়া দপ্তর থেকে আগেই সতর্কতা— তুমুল বৃষ্টি ঝড় সম্ভাবনা। ভূমধ্যসাগরে নিম্ন চাপ। মৌনীকে কোলে তুলে তোয়া অটো রিজার্ভ করে এল প্রিয়ব্রতর বাসায়। প্রিয়ব্রত দেখল মৌনী ভিজেছে বটে তবে তার কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। মায়ের কোলে যেন ধ্যানস্থ মূর্তি। ওকে কোলে তুলে প্রথমে ওর মাথা-গা মুছে লেপের তলায় শুইয়ে দিতে দিতে প্রিয়ব্রত বলল, তোয়া বাথরুম ঢুকে যাও আগে। ভাগ্যিস গত রাতে বেশি করে কাপড় ব্লাউজ এনেছিলে।

হ্যাঁ টিভিতে সতর্কবার্তা দিল।— বলতে বলতে তোয়া দেখল প্রিয়ব্রতর অন্য ঘরে চলছে রান্না। সেখানে জনা তিনেক লোক। বাথরুমে স্নান শেষ করে তোয়া ঘরে ঢুকে অবাক, প্রিয়ব্রত মৌনীকে যেসব পোশাক পরিয়েছে—

এত সব পোশাক ও অলংকার তোয়াও পরতে পায়নি জীবনে। এত দামি দামি পোশাক এনে প্রিয় তোয়াকে না জানিয়ে রেখেছিল মৌনীর জন্য। তা কী অবাক করবে বলে। প্রিয়ব্রত স্নান ধোয়া তোয়ার মুখ দেখে মুগ্ধ হয়ে বলল, তোয়া শিউলি ফুলের মতো লাগছে তোমাকে। কেন লাগবে না প্রিয়— অলংকারহীন বিধবা— তোয়া এটুকু বলতে প্রিয়ব্রত ঠোঁটে আঙুল চাপা দিয়ে বলল, তোয়া এভাবে বোল না। তুমি বরং....

মৌনীকে কপালে অলংকারের ফাঁকে ফাঁকে চন্দনের ফোঁটা লাগাও। আমি বাথরুমে ঢুকব।

বাইরে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। ছাতা হলে বাঁচোয়া। নিমন্ত্রিতজনের মধ্যে জনা দশেক এসে গেছে। তারা ঘরের সাজানো চেয়ারে বসতে রান্না ঘরের তিনজন থেকে একজন এসে কফি দিতে লাগল।

সজ্জিত। মৌনী পদ্মাসনে খাটে বসে চুপ চাপ। বাথরুম থেকে বেরিয়ে প্রিয়ব্রত লম্বা পাজামা ও সবুজ সিল্কের চৌকো কলার পাঞ্জাবী গায়ে প্রথমে মাথার চুলে চিরুনী চালাতে চালাতে চেনা একজনকে বলল, কৌশিক ওকে ওই সিংহাসনে বসা। ওর মাথায় নীল রঙের চূড়া লাগিয়ে দে।

অনুষ্ঠানে আসা অতিথিদের মধ্যে প্লাস্টিক ও রাবারের তৈরি বিভিন্ন খেলনা আনলেও দুই পরিবারের তরফ থেকে কাঁচের শোকেসে রাজা রানী ও দৈত্য দানব, ফুল যা সিম সমি দেওয়া হল মৌনীর হাতে। মৌনীও একে একে সেই উপহার ধরে তার পাশে রেখে দিল।

খানিকক্ষণ বাদে তোয়া পাথরবাটিতে ক্ষীর ও পায়েস এনে তা প্রথমে প্রিয়ব্রতকে বলল, তুমি প্রথমে ওকে এক চামচ ক্ষীর ও এক চামচ পায়েস ওর গালে দাও।

না তোয়া তুমি মা, তুমি আগে দাও। যদিও আমি জানি, ওর শ্রেষ্ঠ কাজটা আমাকেই করতে হবে।

হাসল তোয়া। আমন্ত্রিত সকলের সামনে প্রিয়ব্রতর কানে তোয়া ঠোঁট ছুঁয়ে বলল, রাজচন্দ্রের চেহারা নিয়ে জন্মেছ কেন, দায় তো তোমার ওপর বর্তাবেই।— তোয়া একথা বলে প্রিয়ব্রতর সহনশীলতা পরীক্ষা করল। একসময়—

একে একে সবাই চলে যেতে মৌনী সোকেস থেকে রাজা রানী বের করতে তোয়া বলল, পছন্দ হয়েছে মৌনী?

রানীটা ভীষণ দুষ্টু মা।

কেন, কী করে?

রাজাকে ঘুমুতে দেয় না।

ও, তাই, প্রিয় শুনছ মৌনীর কথা।

প্রিয়ব্রত খাটে শরীরটা ফেলে দিয়ে ভাবছিল, আগামী উপন্যাসটা। তোয়া তার মৌনীর মেধার অবস্থা বুঝতে ফের বলল, আর ওই দৈত্য— এরা খুব অন্যায় করছে। জ্বালাচ্ছে দেশভর মানুষকে। এই রানীই ওদের শায়েস্তা করবে।

মৌনীর একথায় তোয়ার মনে হল, মৌনীর জন্ম দিনের অনুষ্ঠানে খেলনা— হাতি, ঘোড়া, বাঘ, সিংহ, গণ্ডার পেলেও অরণ্যদেবের মূর্তি কেউ দেয়নি।

মৌনী তুমি রাজা-রানী, দৈত্য-দানব পেয়েছ দেখছি। কিন্তু অরণ্যদেব কেউ দেয়নি?

না দিক, অরণ্যদেবের সঙ্গেই তো আমরা আছি। অরণ্যদেবের বাড়িতেই তো... ও, তাই বুঝি।

হ্যাঁ— মা ওকে কিন্তু অলস হতে দেবে না। ও আমাদের বাঁচাবে।

কেন মৌনী?

ও যে আমার অসলি বাপ।

বহু দিন পর তোয়া চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিয়েছিল মৌনীর গালটা।

সেদিন বিকেলে উপন্যাসের প্লট ভাবতে ভাবতে প্রিয়ব্রত ঘুমিয়ে পড়েছিল। তোয়াও মেয়ের ভাবনায় গতিতে খুশি হয়ে বাইরে বৃষ্টি থেমে যাওয়া দেখে দরজা বন্ধ করে মৌনীকে বুকে জড়িয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছিল মাত্র। ফের বৃষ্টির শব্দে তন্দ্রার ঘোর কেটে গেল।

এলাকা তো বটে, বোধহয় গোটা পৃথিবীকে ডুবিয়ে ফেলবে ছন্নছাড়া বৃষ্টি। ঘর বন্ধ বলে কী ভেন্টিলেটার দিয়ে ঢুকছে জলীয় বাতাস। লেপের ভেতরে প্রিয়ব্রত। ভাগ্যিস মেঘের গর্জন নেই। তবু অঝোর ঝরছে জল।

প্রিয়ব্রতর খাটের অন্য পাশে রাখা দু'টো বালাপোশের একটা মৌনীর গায়ে দেওয়া কী ভেবে দ্বিতীয়টাও দু' ভাঁজ করে মৌনীর গায়ের ওপর থেকে চাপিয়ে তোয়া প্রিয়ব্রতর লেপ তুলে ঢুকল।

প্রিয় ঘুমুলে চলবে না।

কেন?

একটা গোটা রাত— শুধু ওই ক'দিনে আমার মন ভরেনি প্রিয়।

তোয়া। এখনো তো—

দেখ প্রিয়, বাইরে প্রকৃতিও আমার মনের ইচ্ছে বুঝেছে।

তোয়া আমার আগামী উপন্যাসের চরিত্ররা ধরা দিতে চাইছে না।

দেবে।— তোয়ার একথার মধ্যে প্রিয়ব্রতর কানে এল কড়া নাড়ার শব্দ।

সে লেপ তুলে তোয়াকে ভালোভাবে ঢেকে, দরজা খুলে অবাক!

তুমি ?

হ্যাঁ, তুমি শুয়েছিলে। যাও শোওগে। আমি বাথরুম ঢুকলাম। দরকার পড়লে তোমায় ডাকব। এই নিয়ন আলো জ্বেলে কেন। জিরো জ্বালিয়ে শোও। যাও যাও। বলতে বলতে নিশিতা বাথরুমে ঢুকল। প্রিয়ব্রত এবার দিশাহীন কিংকর্তব্য বিমূঢ়। খাটে উঠল বটে বসে ঢাকা দেওয়া তোয়াকে কী বলবে ভাবতে যেতে তোয়া ওকে টেনে নিল। এ কী ! এত ঘামছ কেন ? তোমার নিশিতা এসছে, তাই। প্রিয়ব্রতর কানে ঠোঁট এটে তোয়া বলল, সাহস পেল প্রিয়ব্রত বলল, আসলে তুমি কী চাইছ তোয়া ?

আমি চাইছি, একটা নবজন্ম তুমি আমার দেবে।— ফিস ফিস কান ছুঁয়ে হলেও তোয়ার কথা নিশিতা শুনতে পেল। খানিক থমকে দাঁড়াল।

সেদিন সন্ধ্যা সকালেরটা আমার সন্দেহ হয় বলেই তৃতীয় বার চাইছি।

না, থাক।

দেখ প্রিয় জোর জবরদস্তি— আমার ইচ্ছে হয় না। এই যে এতক্ষণ লেপের মধ্যে ঢুকে আছি। তোমাকে টাচ করিনি। অবশ্য তুমিও আমায়— সেদিন সন্ধ্যায় যা দিয়েছ তাতেই আমি তোমাকে পেয়েছি আমার গর্ভে।

তোয়া !

এত ঘামছ কেন ?

কোন পথ নেব তোয়া— ধরা পড়ে গেছি।— প্রিয়ব্রত কাঁপা গলায় একথা বলতে বাথরুম থেকে বেরিয়ে নিশিতা খাটের নীচে ঢুকল। শুনতে পেল তোয়ার গলা— শোনো প্রিয় তুমি তো জানো আমি বিধবা। তোমাকে পেয়েছি বলেই আজ এ চোখ দু'টোতে হালকা কাজল লাগিয়েছি। কোলে আইশেড লাগিয়েছি। ঠোঁট দু'টোও তার জীবন ফিরে পেয়েছে।

তোয়া আই এম এ ভেরি টায়ার্ড।

আর শোনো বৈধ-অবৈধ নির্ণয় করা কঠিন।— এমন কোনও মনুষ্য প্রাণী নেই যে তার ভোগের দৃশ্য তৃতীয় জনকে দেখতে দিতে চায়।— তোয়ার একথার সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়ব্রত বলল, এমন একটা ভূকম্প হোক— হল না ভূকম্প। কিন্তু প্রিয়ব্রতের বাসা ঘরের চৌকাঠ সহ শাবলের আঘাতে খুলে পড়ল। সেই আওয়াজ শুনে খাটের তলা থেকে বেরিয়ে নিশিতা ওর লেপ সরিয়ে প্রিয়ব্রত তোয়া— দেখল।

বাড়িওয়ালা বৈকুণ্ঠ।

নিশিতা বুঝল। গতকাল সুন্দরবন থেকে তাকে ডেকে এনেছে। এই দরজা ভাঙা তারই কাজ। মুহূর্তে নিজেকে সামলে সে বলল, হ্যাঁ বৈকুণ্ঠবাবু, আপনার ধারণাই মিথ্যে। এ আমার ছোটো বোন। এত সন্দেহবাতিক মন আপনার। পাগলের মতো দরজা ভাঙলেন। ভাগ্যিস কাছাকাছি ঘরবাড়ি নেই। থাকলে— যান আপনি ঘরে যান।

দরজা চৌকাঠ সহ ভেঙে শাবলটা কোথায় ফেলে বৈকুণ্ঠ— গরম চোখে প্রিয়ব্রতর দিকে তাকাতে নিশিতা বলল, এটা আমাদের ঘরোয়া ব্যাপার আমরা বুঝব। আপনি বেশি কিছু করতে চাইলে আমি থানায় যাব। আমার বিবাহিতা নিজের বোন। বাচ্চা আছে, তার জন্ম দিন অনুষ্ঠান হয়েছে। আর তাতে কিনা আপনি সন্দেহের ভূত দেখেছেন। নিশিতার একথায় বাড়িওয়ালা বৈকুণ্ঠ তার মুখের আওয়াজ না করে পালিয়ে গেল। প্রিয়ব্রত চৌকাঠ ভাঙা দরজা তুলে সেই ফাঁকা জায়গাটা বন্ধ করছিল। নিশিতা পায়ে পায়ে এগিয়ে বলল, তোমায় একটা খুশ খবর দিই। জানো আমি মা হতে চলেছি।

তা কী করে ?— সন্দেহ দেখা দিল প্রিয়ব্রতর মনে। তা বুঝতে পেরে তোয়া বলল, হতে পারে— এত বারের মধ্যে আমার যেমন সেই সন্ধ্যায়। দিদির ক্ষেত্রে— তাই।

কে জানে বাবা তোমাদের এই হিসেব।— প্রিয়ব্রতর এই হিসেব বোঝাতে বুদ্ধিমতী তোয়া খুলে বলল, যদি তোমার মতো মুখের গড়ন হয় তাহলেও তুমি জন্মদাতা— নচেৎ দিদির মুখের গড়ন হলেও তুমিই বাপ। মেডিক্যাল সায়েন্স বলে।— তোয়ার একথার বিরোধিতা করতে পারল না প্রিয়ব্রত। নিশিতার মনে হল, তার হয়ে যোগ্য উত্তর দিয়েছে তোয়া। এবার এতক্ষণে একটা প্লাস্টিকের চেয়ারে বসল। এদিকে বাইরে বৃষ্টি কখন থেমে গেছে। হঠাৎ তোয়া তার পা ছুঁয়ে বলল, তুমি আমার বড়দি।

দেখতে তো আমরা দু'জন একই ছবি।

তোমার চলে যাওয়াতে আমি একটা অন্যায় করেছি।

বেশ করেছিস। এখন এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।— নিশিতার একথার অর্থ না বুঝে তোয়া নীরব। নত মুখে। নিশিতা চেয়ারে বসে নতমুখি তোয়ার থুতনিকে চার আঙুলে তুলে উঠিয়ে বলল, প্রায়শ্চিত্ত কী জানতে চাইলি না।

চোখে হাসল তোয়া। নিশিতা বলল, তোর-আমার সন্তানকে তুই না পারিস, আমাকে দিবি আমি পালন করব।

নীরব তোয়া। আসন্ন একটা ঝড়কে থামিয়েছে দিদি। সব বুঝতে পেরেও তোয়াকে বোন পরিচয়ে বেঁধে নিয়েছে। প্রিয় বলেছিল গ্রাম্য মেয়ে সল্প শিক্ষিতা। অথচ কত বুদ্ধিমতীর মতো সবাইকে বাঁচিয়ে দিল। নিশিতা বলল, জানিস বোন, আমি বড়ো হলেও বড্ড বোকা ও ভীষণ অপরাধী। ওকে একা ফেলে চলে গেছি, লেখক, না জানি ওর কতই না কষ্ট হয়েছে।

দিদি।

বল্। তোকে দেখে মনে হয় গত জন্মে আমরা যমজ ছিলাম।

দিদি। আমি বিধবা। তুমি পালন করতে চাইছিলে না। তা তোমায় আমি মৌনী— তোয়া মৌনীর কথা বলতে প্রিয়ব্রত বলল, শোন তোয়া নিশিতা— তোমাদের গর্ভের আসন্ন সন্তানকে তোমরা দেখ। আমি পিতৃহারা মৌনীকে পিতৃস্নেহে গড়ব। তোয়া দেবে তো আমায় ?— প্রিয়ব্রতর একথায় তোয়া বলল, কেন দেব না প্রিয়। মৌনীকে দিয়ে রেখেছি কবে। ওর মারফৎ আমি তোমায় পেয়েছি। ওর জন্মদাতার ছবি যে আমি তোমার মধ্যে খুঁজে পেয়েছি। আর এলাকার উন্নতির জন্য আগামী লড়াইয়ের যোগ্য সাথী পেলেম দিদিকে। এ প্রাপ্তি যে আমাদের জীবনে বড়ো প্রাপ্তি।

তোয়া— আয় বোন আমার বুকে আয়। এত সুন্দর কথা জানিস তুই।

এসব তারা খসার জীবন বৃত্তান্ত নিয়েই যে লেখক প্রিয়ব্রতদের আগামী উপন্যাস।

উপন্যাস

অসুখের পর

বিকাশকলি পোল্যে

প্রায়শই সুখময়ের অসুখ করে।

অসুখের কারণেই বেশিরভাগ সময়েই তার মন ভালো থাকে না। মন খারাপ হয় ভীষণ। কিছু করতে ভালো লাগে না। কাজে মন বসে না। গান শুনতে ভালো লাগে না। বই পড়তে ভালো লাগে না। অস্থির অস্থির লাগে। কারো সঙ্গে কথা বলতেও ইচ্ছে করে না। পথে-ঘাটে লোকজনের সঙ্গে দেখা হলে তাদের এড়িয়ে চলতে ইচ্ছে করে। তারা যেচে জানতে চায় তার কিছু হয়েছে কিনা। সে চুপ করে থাকে। উত্তর দেয় না। কীভাবে মানুষকে মন খারাপ বোঝাতে হয় সুখময় তা জানে না।

মন খারাপের কি কোনও রঙ হয়? মনখারাপ হলে সে রঙের ছাপ পড়ে মানুষের মুখে? আর সেই মুখ দেখলে অন্য লোকে বুঝতে পারে মন খারাপের বিষয়টা! হতে পারে। মুখ তো মনেরই আয়না। মন খারাপ হওয়া নিজের মুখটা কখনো দেখেনি সুখময়। মন খারাপ নিয়ে কখনো আয়নার সামনে দাঁড়ায়নি সে। সুখময়ের অসুখটা ভারি অদ্ভুত ধরনের। অসুখটা হলে কীরকম একটা অনুভূতি হয় তার। সেই অনুভূতি সে নিজে যেমন বুঝতে পারে না, অন্যকেও তেমন বুঝিয়ে বলতে পারে না। অসুখটা হলে ডাক্তার বদ্যির কাছেও দৌড়াতে হয় না। আস্তে আস্তে আপনা আপনিই ভালো হয়ে যায়। তখন তার আবার সব কিছু করতে ভালো লাগে। কাজ করতে ভালো লাগে। বই পড়তে ভালো লাগে। গান শুনতে ভালো লাগে। তখন সে আবার আগের মতো হয়ে যায়। মন ভালো হয়ে যায়। মেজাজ ফুরফুরে হয়ে যায়। তখন আর অস্থির অস্থির লাগে না। পথে-ঘাটে লোকজনের সঙ্গে দেখা হলে কথা বলে। হেসে আলাপ করে। তাদের প্রশ্নের উত্তর দেয়। বাড়িতে ফিরে আয়নায় নিজের মুখ দেখে সুখময়। না, অসুখের কোনও ছাপ থাকে না সে মুখে।

মাঝে মধ্যে সুখময়ের মনে হয় তার অসুখটা ভারি ছোঁয়াচে। তার এই অসুখ সংক্রমিত করে দেয় তার আশেপাশের লোকজনকেও। তখন তাদেরও মন খারাপ হয়ে যায়। তাদেরও কিছু করতে ভালো লাগে না। তাদের মন বিষাদে ভরে ওঠে।

— তোর কি কিছু হয়েছে?

— না তো।

— তাহলে এমন করে আছিস কেন?

— কেমন করে?

— মুখটা ভার করে আছিস।

— আমার মুখটাই তো এমন মা।

— না, এমন তো তুই থাকিস না। মুখে হাসি নেই। খুশি নেই। কেমন যেন। কী জানি বাপু। দিন দিন কী যে হচ্ছে?

মা বকবক করতে থাকে। মায়ের মন খারাপ হয়ে যায়। মা'কে দেখে সুখময়েরও মন খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু সে মা'কে বুঝিয়ে বলতে পারে না তার মন খারাপের কথা। বলবে কী করে? আসলে সে নিজেও তো বুঝতে পারে না মন খারাপের ব্যাপারস্যাপার।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা হয়ে গেছে। হাতে অফুরন্ত সময়। বই পড়ে, গান শুনে সময় আর ফুরোয় না। আত্মীয়স্বজনের বাড়ি যাওয়া যায়। সে আর হয়ে ওঠে না। আত্মীয় স্বজনকে এড়িয়ে চলতেই ভালোবাসে সুখময়। কারণ দেখা হলেই তারা নানান প্রশ্ন করতে শুরু করে। বিশেষ করে বড় মামা।

— কী রে কী করবি এখন?

— কী আর করব।

— কী আর করব মানে! কত কিছু করার আছে। কম্পিউটার ক্লাসে ভর্তি হয়ে যা। টাইপ শেখ। শুধু শুধু ঘরে বসে থেকে কী করবি? ঘর-কুনো হয়ে যাবি যে।

হোমসিকনেস কিন্তু মারাত্মক জিনিস। সুখময় কোনও উত্তর দেয় না। সে চুপচাপ বসে থাকে। মামা তার মতো জ্ঞান বিতরণ করতে থাকেন।

পিসেমশাই তো আরও ডেঞ্জারাস।

— অভয়ানন্দ আমার পাশে বসে ডিমের ওমলেট দিয়ে মুড়ি খাচ্ছে। বল এটা ইংরেজিতে কী হবে? কী রে বলতে পারলি না তো? জানতুম পারবি না।

পিসেমশাই ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার। ভয়ডরহীন। ডাকাবুকো। কোনও নেতা মন্ত্রীকে তোয়াজ করেন না। বুক চাপড়ে বলেন, 'পলিটিক্স করে বি.ডি.ও. হই নি। যথারীতি পড়াশোনা করতে হয়েছে তার জন্য।' কাজ পাগল মানুষ।

মেসোমশাই খুঁজে পেতে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন বের করে বলবেন, 'দেখ তো সুখময় প্রেসক্রিপশনে কী লেখা আছে? পড়ে একটু ওষুধগুলোর নাম বলে দাও তো।'

ডাক্তারদের হাতের লেখা বোঝা যায় না। সুখময় পড়ে বলতে পারে না প্রেসক্রিপশনে কী লেখা আছে। মেসোমশাই-এর ঠোঁটের এক কোণায় তখন বিদ্রুপের হাসির ছোট্ট তরঙ্গ ওঠে। সুখময়ের ভালো লাগে না। সে বুঝে পায় না কী করে। ডাক্তার হওয়ার প্রধান শর্তই কি হাতের লেখা খারাপ হওয়া। আজ পর্যন্ত ভালো হাতের লেখা প্রেসক্রিপশন তার চোখে পড়ে নি।

—সুখময় আছিস? অলোকদার গলা শুনে বাড়ির বাইরে এল সুখময়।

— অলোকদা বল, কী বলছ?

— পরীক্ষা তো হয়ে গেল। কী করবি এখন?

— কী আর করব। ঘুরব, ফিরব। খাব আর ঘুমোব।

— টিউশন পড়াবি?

— টিউশন! অলোকদার কথা শুনে সুখময় তো অবাক। এতদিন সে নিজে নিজেই পড়াশোনা করেছে। মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার সময় তার কোনও টিউটর ছিল না। পরীক্ষার রেজাল্ট আহামরি কিছু না হলেও খারাপ বলা যাবে না। উচ্চ মাধ্যমিকেও তার সেভাবে কোনও টিউটর ছিল না। মাঝে মধ্যে ইংরেজির মাস্টার ললিত বাবুর

কাছে যেত সে ইংরেজিটা একটু দেখে নেওয়ার জন্যে। কারণ মাধ্যমিক আর উচ্চ মাধ্যমিকের ইংরেজির সিলেবাসের মধ্যে বিরাট ফারাক। তাই ইংরেজির একটা টিউটর নিতে চেয়েছিল সে। বাবা অবশ্য না করে নি। অন্য সব সাবজেক্টগুলো সে নিজেই ম্যানেজ করেছিল। পরীক্ষা খুব খারাপ হয়নি। এখন রেজাল্টের অপেক্ষা। রেজাল্টের উপর নির্ভর করছে তার ভবিষ্যৎ। নিজে থেকে সে এখনও কিছু ঠিক করে নি।

অলোকদার কথায় একটু লজ্জা পেল সুখময়। অলোকদা তাদের পাশের বাড়িতে থাকে। বি.এ. পাশ করে কলকাতায় একটা চাকরি পেয়েছে। অলোকদা চলে যাবে কলকাতায়। তাই সে তার ছাত্র ছাত্রীদের ভার দিয়ে যেতে চায় সুখময়ের কাছে। সুখময় লজ্জা লজ্জা মুখ করে বলে, 'আমি কি পড়াতে পারব?'

— খুব পারবি।

— কোথায় পড়াতে যেতে হবে?

— এই তো পাশের পাড়ায়। হালদারবাবুদের বাড়িতে। হালদারবাবুর নাতি-নাতনিদের পড়াবি।

— কোন ক্লাসে পড়ে তারা?

— দুই নাতি পড়ে ক্লাস টু-তে। দুই নাতি পড়ে ক্লাস ফোরে। আর এক নাতনি পড়ে ক্লাস সেভেন এ। সন্ধ্যাবেলা যাবি। ছ'টা থেকে ন'টা পড়াবি। ভালো টাকা দেবে ওরা।

পরের মাস থেকেই পড়াতে শুরু করে দিল সুখময়।

হালদারবাবুর তিন ছেলে। তিন ছেলেই থাকে বাইরে। মানে কলকাতায়। বড়ো ছেলের এক মেয়ে আর এক ছেলে। বড়োর মেয়ে পড়ে ক্লাস সেভেন। ছেলেটা ক্লাস টু'তে। মেজ ছেলের দুই ছেলে। এক ছেলে পড়ে ক্লাস ফোরে আর এক ছেলে ক্লাস টু'তে। ছোটো ছেলের এক ছেলে পড়ে ক্লাস ফোরে।

হালদারবাবু গত হয়েছেন অনেকদিন আগে। বর্তমানে তাঁর স্ত্রী জীবিত আছেন। তিনি তিন বউমা আর নাতি নাতনিদের নিয়ে থাকেন। প্রতি মাসে, কখনো কখনো মাসের মাঝখানে ছেলেরা বাড়িতে আসে।

সন্ধ্যে ছ'টার অনেক আগেই পড়াতে চলে আসে সুখময়। বাচ্চাগুলোকে পড়ানোর জন্যে একটা আলাদা ঘর বরাদ্দ করা আছে। সুখময়কে তাদেরও বেশ পছন্দ হয়েছে বলেই মনে হয়। কারণ সুখময় আসার আগেই তারা সুবোধ বালকের মতো সেই ঘরে এসে পড়তে বসে যায়। সুতপা পরে আসে। সে ক্লাস সেভেনে পড়ে। হালদারবাবুর বড়ো ছেলের বড়ো মেয়ে। মিষ্টি দেখতে। গায়ের রঙটা একটু চাপা। হাসিটা সুন্দর। হাসলে মনে হয় ঝরঝর করে ঝরনা ঝরে পড়ছে।

সন্ধ্যে ছ'টা থেকেই পড়ানো শুরু করে সুখময়। পড়াতে আসার আগে যে ভয়টা ছিল তার তা কয়েক দিনেই কেটে গেল। সে এখন সাবলীল স্বচ্ছন্দ্য। এখন তার পড়াতে বেশ ভালোই লাগে। পড়াতে পড়াতে তার সময়ের খেয়াল থাকে না। ঘড়ির কাঁটা ন'টার ঘর পেরিয়ে যায়। বাচ্চাগুলো ঘুমে ঢুলতে থাকে। হালদারবাবুর মেজ বউমা বলেন, 'এবার ওদের ছুটি দাও সুখময়।' তখন সুখময়ের টনক নড়ে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে কাঁটা ন'টার ঘর পেরিয়ে দশটার ঘরে ঢোকার তোড়জোড় শুরু করেছে। সুখময় বলে, 'চলো তাহলে, আজকে ছুটি।' ভাবখানা এমন যেন আরও একটু পড়ানোর ইচ্ছা ছিল তার। যতক্ষণ বাচ্চাগুলোকে সুখময় পড়ায়, ততক্ষণ সেখানে পাশে একটা চেয়ারে বসে থাকেন হালদারবাবুর মেজ বউমা। কেন তিনি বসে থাকেন সুখময় তা জানে না। বাচ্চাগুলোকে নজরে রাখার জন্যে নাকি সুখময় ঠিকঠাক পড়াতে পারছে কিনা তা দেখার জন্যে। সুখময় অবশ্য সব সময় সতর্ক থাকে। যাতে তার পড়ানোতে কোনরকম ভুল ত্রুটি ধরা না পড়ে। তবে ভদ্রমহিলা সারাক্ষণ বসে থাকাতে একটা সুবিধা হয়েছে সুখময়ের। তাঁর সামনে বাচ্চাগুলো বদমায়েশি করার সাহস পায় না। পড়ায় ভুল করলে সুখময়কে বকাবকি করতে হয় না। যা করার, তিনিই করেন, যা বলার তিনিই বলেন। বাচ্চাদের বকতে সুখময়ের একদম ভালো লাগে না। এই দায়িত্বটা ভদ্রমহিলা নেওয়াতে তার খুব সুবিধা হয়েছে। বাচ্চাদের ছুটি দিয়ে সুখময় যখন বের হবার জন্য প্রস্তুত হয়, তখন তিনি বলেন, 'দুটো ভাত খেয়ে গেলে হত না। রাত তো অনেক হল।'

তাঁর আন্তরিকতায় অভিভূত হয়ে যায় সুখময়। বলে, 'তা হোক। এই তো এখুনি চলে যাব।'

— সাবধানে যেও। বাঁশবাগানটা পেরিয়ে যেতে হয় তোমাকে। ভয় লাগে না তোমার?

— কীসের ভয়?

— ভূতের।

— ভূতের ভয় আমি পাই না। হা-হা করে হেসে ওঠে সুখময়।

— বাঁশ বাগানটায় শুনেছি ভূতের খুব উৎপাত।

— সত্যি ভূত না মিথ্যা ভূত!'

সুখময়ের এই কথা শুনে ভদ্রমহিলা আর দাঁড়ান না। ভেতরের ঘরে চলে যান। সুতপা দাঁড়িয়ে থাকে। টর্চ হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে সুখময়। সুতপার চোখে চোখ পড়ে যায় তার। মনের মধ্যে বিদ্যুৎ চমকে ওঠে। সুখময়ের কীরকম একটা তরল অনুভূতি হয়। ভূতের ভয় মাথা থেকে কর্পূরের মতো উবে যায়। তার মস্তিস্কের গোপন কোষে চোখের ভিতর দিয়ে সুতপার হাসি হাসি মুখের প্রতিচ্ছবি এক বৈদ্যুতিন তরঙ্গের সৃষ্টি করে। সেই তরঙ্গ তাকে ঢেউয়ের মতো ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ভাসতে ভাসতে সে পার হয়ে যায় মন্ডলদের বড়ো পুকুর পাড়, রহস্যময় বাঁশবাগান। অন্ধকার গভীর রাত তার কাছে তখন তুচ্ছাতিতুচ্ছ মনে হয়।

জ্যেষ্ঠ মাস। প্রচণ্ড গরম। আকাশে এক টুকরো মেঘের দেখা নেই। মাঝে মধ্যে সন্ধ্যের মুখে মিষ্টি দক্ষিণা বাতাস বয়ে যায়। তখন মানুষজন একটু স্বস্তি পায়।

জলধর খালি গায়ে উঠোনে চেয়ার পেতে বসে আছেন। তার পাশে মাটিতে বঁটি নিয়ে নারকেল পাতার কাঠি ছাড়াচ্ছেন কল্পনা। নারকেল কাঠির এখন বাজার ভালো।

স্ত্রীকে লক্ষ্য করে জলধর বললেন, 'আর লেখাপড়া করে কী হবে? অনেক তো হল। এবার একটা রোজগারের ধান্দা করা ভালো।' স্বামীর কথায় রেগে গেলেন কল্পনা। ঝাঁটার কাঠিগুলো গোছাতে গোছাতে বললেন, 'তোমার কথার কোন ছিরি নেই। ছেলেটা পড়তে চাইছে, পড়ুক না। যতদূর পড়তে চায় পড়ুক। চাকরি করার সময় তো আর পেরিয়ে যাচ্ছে না। তাছাড়া রোজগারের একটা রাস্তা তো সে পেয়েইছে।'

— ওতে আর ক'টা পয়সা রোজগার হবে।

— যাইহোক, ওর হাত খরচাটা তো চলে যাবে। ওই টাকা ক'টা হাতে পেলে তোমার কাছে তো ও আর টাকার জন্যে হাত পাতবে না।

— মড়ার চুল ছিঁড়লে কি আর মড়া হালকা হয়?

— ছিঃ, কথাবার্তার কী ছিরি।

— নিমাইবাবুকে বলে রেখেছিলুম একটা কাজের জন্যে। দাশনগরে ওনার লেদের একটা কারখানা আছে। সেখানে একটা ব্যবস্থা হয়ে যেত।

— সুখের আমার কতই বা বয়স। এখনই তাকে পড়াশোনা ছেড়ে লেদের কারখানায় কাজে ঢুকতে হবে!

— আ-হা-হা, বয়সের কথা হচ্ছে না কল্পনা। হচ্ছে কাজের কথা। তোমরা তো বাইরে বের হও না। ফলে বাইরের জগৎটাকে তোমরা চেন না। এখন কাজের বাজার খুব খারাপ। বি. এ., এম. এ. পাশ সব ছেলেরা এখন কুলি কামিনের কাজ করছে।

— তা করুক। ছেলে আমার আরও পড়াশোনা করবে। এই আমার শেষ কথা। লেখাপড়া করে ও নন্দাইয়ের মতো বি. ডি. ও. হবে।

— রথীনের বাবার ধনের জোর ছিল।

— ছিঃ ছিঃ তোমার মুখে কি কিছুই আটকায় না। তুমি বাবা না কি?

জলধরবাবু আর কথা বাড়ালেন না। মুর্খ মেয়েদের সঙ্গে তর্কে পারা যায় না। তারা কোন যুক্তি বা বাস্তবতার ধার ধারে না। যেটা মনে হয় তারা সেটাই বলে। তিনি পাঞ্জাবি গায়ে ঝুলিয়ে গজগজ করতে করতে চলে গেলেন বাজারের দিকে।

ছেলের লেখাপড়া নিয়ে কল্পনা খুব আশাবাদী। লেখাপড়া করতে তার খুব ভালো লাগত। ছোটবেলার কথা এখন আর খুব একটা মনে নেই তার। তবুও অস্পষ্ট মনে পড়ে বাবা রোজ সন্ধ্যেবেলায় কেরোসিনের কুপির আলোয় পড়াতে বসাতেন। তারা অনেকগুলো ভাইবোন। সবার ছোটো সে। যৌথ পরিবার ছিল তাদের। বাবারা ছিলেন তিন ভাই। আজও স্পষ্ট মনে পড়ে তার। চৈত্রের দুপুর। ধান সেদ্ধ করে খামারে মেলে দেওয়া আছে। খামারে বসে ধানে পাহারা দিচ্ছিল সে। না হলে হাঁস মুরগিতে ধান খেয়ে নষ্ট করবে। পাড়ার কে একজন খামারের পাশ দিয়ে যেতে যেতে বলল, 'এই খুকি বাড়ি যা। তোর বাবা মারা গেছে।'

ছোটবেলার সব ঘটনা স্মৃতির পটে অস্পষ্ট হয়ে গেলেও এই দৃশ্যটা তার পরিষ্কার মনে আছে। বিস্ময়ের সীমা রইল না কল্পনার।

বাবার আকস্মিক মৃত্যুর পর ছন্নছাড়া হয়ে গেল তাদের পরিবার। তার আর বেশি দূর লেখাপড়া হল না। কল্পনার মামারা ছিলেন সম্পদশালী। কিন্তু তারাও তখন শরিকী মামলায় জেরবার হয়েছিল। বিধবা দিদি ও তার ছেলে মেয়েদের নিয়ে তাদের অত মাথা ব্যথা ছিল না। দাদু-দিদা গত হয়েছিলেন অনেক আগেই। ফলে মা'র সঙ্গে তার মামাদের সম্পর্কের বাঁধনটা ততটা জমাট ছিল না। একটু বড়ো হতেই জ্যেঠু দেখাশোনা করে তার বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন। প্রথম প্রথম খুব খারাপ লাগত তার। নতুন সংসার। নতুন আত্মীয় স্বজন। তার জীবনটাই হয়ে গিয়েছিল একেবারে অন্য রকম। তারপর তো সুখময় এল তার কোলে। ফুটফুটে একটা বাচ্চা। আহা কী সুন্দর ছিল সেই সব দিন।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যে নেমে এল। অনেক কাজ বাকি পড়ে আছে এখনো। ঝাঁটাকাঠিগুলো একদিকে সরিয়ে রেখে উঠোনের দড়িতে মেলে রাখা শুকনো জামা কাপড়গুলো তুলতে শুরু করল কল্পনা। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল মেঘমুক্ত ঝাঁ চকচকে আকাশ। কবে যে বৃষ্টি নামবে কে জানে। একটু বৃষ্টির জন্যে সবাই চাতকের মতো হাঁ করে বসে আছে।

সুখময় পড়াতে যাবে বলে তৈরি হয়ে উঠোনে নেমে এল। মুখটা বেশ শুকনো দেখাচ্ছে। ছেলের দিকে তাকিয়ে অবাক হলেন কল্পনা। বললেন, 'কিরে বাবা, কী হয়েছে? তোর মুখটা অমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন?'

— ও কিছু নয়।

— মায়ের চোখকে ফাঁকি দিবি বাবা?

— বললাম তো, ও কিছু না।

— বাবার কথায় রাগ করেছিস বুঝি? তুই তো জানিস বাবা, মানুষটা ওরকমই। তার কথায় রাগ করলে চলে বাবা। তার উপর কতদিন থেকে মানুষটার বাঁধা ধরা কোনও কাজ নেই।

কোনও কথা বলল না সুখময়। একরাশ অভিমান নিয়ে জামা গায়ে চাপিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

(২)

বাজারে কম্পিউটার এসে যাওয়াতে তাদের ব্যবসায় এখন মন্দা চলছে। ব্যবসটা প্রথম শুরু করেছিল ধনঞ্জয় হালদার। তখন তার বয়স বেশি ছিল না। অভিজ্ঞতাও ছিল না তেমন। তবে হাতের কাজটা ছিল চমৎকার। পরিশ্রম আর অধ্যাবসায়ের দ্বারা ধনঞ্জয় এই ব্যবসাটাকে দাঁড় করিয়েছিল। ক্লায়েন্ট ধরা থেকে ব্যবসায়ের জন্যে কাঁচা মাল কেনা, সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির ব্যবহার সব কিছু সে করেছিল দক্ষতার সঙ্গে। আর এ সবকিছুই সে রপ্ত করেছিল খিদিরপুরের নামকরা শিল্পী স্বর্গীয় বদন চন্দ্র কর্মকারের থেকে।

ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে ধনঞ্জয় গ্রাম থেকে শহরে এসেছিল। শহরে তার থাকার জায়গা ছিল না। কোনও আত্মীয়স্বজন ছিল না। কোথায় খাবে, কোথায় থাকবে তার কোনও ঠিক ঠিকানা ছিল না। কাজের খোঁজে শহরের ফুটপাতে ঘুরতে ঘুরতে একদিন দেখা হয়ে গেল বদনবাবুর সঙ্গে। খিদিরপুরের মোড়ে কালিবাবুর বাজার লাগোয়া রাস্তার ধারে ছিল তাঁর কাঠের ডাইস তৈরির ছোটো একটা দোকান। থাকা খাওয়ার চুক্তিতে বদনবাবুর দোকানে কাজে লেগে পড়েছিল ধনঞ্জয়। অর্ডার অনুযায়ী কাঠের ডাইস বানিয়ে পার্টিকে ডেলিভারি দেওয়া। সারাদিন ধরে ছেনি, বাটালি, হাতুড়ি নিয়ে কাঠ কেটে কেটে ডাইস বানাতেন বদনবাবু। যুবক ধনঞ্জয় বসে বসে দেখত সে কাজ। কাজ শিখত নিজের গরজে। কাজের প্রতি তার আগ্রহ ও নিষ্ঠা দেখে ধনঞ্জয়কে খুব ভালো লেগে গেল বদনবাবুর।

বদনবাবুর কোনও সন্তান ছিল না। স্ত্রী ছিলেন অসুস্থ। শয্যাশায়ী। নিজগুণে ধনঞ্জয় হয়ে উঠল তাদের সন্তান এবং 'মা তারা ডাইস হাউস'-এর ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী।

বিধাতার কী আশ্চর্য খেলা। বদনবাবুর স্ত্রী ছিলেন অসুস্থ। লাঙ্গ

ক্যানসারের পেসেন্ট। তার চিকিৎসাতেই বদনবাবুর উপার্জনের প্রায় সমস্তটুকুই ব্যয় হয়ে যাচ্ছিল। তা সত্ত্বেও ক্রমে বিছানার সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল তাঁর স্ত্রী। তিনি বেঁচে রইলেন।

হঠাৎ করেই পৃথিবীর সব মায়া কাটিয়ে বদনবাবু চলে গেলেন না ফেরার দেশে।

একদিন দুপুরবেলা দোকান থেকে ফিরে স্নান খাওয়া করে বিশ্রাম করছিলেন। হঠাৎ বুকে ব্যথা। ডাক্তার ডাকার সময়টুকুও দিলেন না। কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট।

বদনবাবুর মৃত্যুর পর সব দায়িত্ব এসে পড়ল ধনঞ্জয়ের কাঁধে। দোকান চালানো, বদনবাবুর অসুস্থ স্ত্রীর চিকিৎসা, দেখাশোনা সব করতে হত তাকে। একসময় বদনবাবুর স্ত্রীও চলে গেলেন না ফেরার দেশে। তখন তাঁর ভাড়ার ঘর, দোকানের একচ্ছত্র মালিক হয়ে বসল ধনঞ্জয়।

তারপর একসময় ধনঞ্জয় গ্রামে ফিরল। বিয়ে-থা করে সংসার হল। জমি, জায়গা, পুকুর, বাগান কিনে বেশ বিত্তবান হয়ে উঠল। গ্রামের মানুষের কাছে ধীরে ধীরে ধনঞ্জয় হালদার হয়ে উঠল হালদারবাবু।

সেবার শীতকালে মাঘী পূর্ণিমার দিন কলকাতা থেকে বাড়ি ফিরছিল ধনঞ্জয়। দোকানপাট গুছিয়ে তিন ছেলেকে সবকিছু বুঝিয়ে বেরোতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল তার। প্রদীপ, প্রতীপ, প্রতীক তিন ছেলেই ভালো কাজ শিখে গিয়েছে। তিন ভাই মিলেমিশে থাকে। বড়ো ছেলে প্রদীপের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। দুই ছেলের বিয়ে দিতে হবে এবার। ধনঞ্জয় ভেবে রেখেছে মেজ এবং ছোটো ছেলের বিয়ে দেবে একসঙ্গে। সেই মতো শাঁখারি কাকাকে বলা আছে। শাঁখারি কাকার ভালো নামটা কেউই জানে না। সাইকেলে করে ঘুরে ঘুরে পাঁচ-দশটা গ্রামে শাঁখা পলা বিক্রি করে। যেহেতু অনেক গ্রামে ঘুরতে হয় সেহেতু প্রায় প্রতিটি গ্রামের লোকজনের সঙ্গে ভালো পরিচিতি আছে। আর সেই সূত্রেই ঘটকালির কাজটাও বেশ ভালোই করে শাঁখারি কাকা। বাড়ির উঠোনে বা বারান্দায় মাদুর পেতে বসে বউ, মা'দের শাঁখা পলা পরায় কাকা। জমিয়ে গল্প করে। গল্প বলায় ওস্তাদ শাঁখারি কাকা। একবার শুরু করলে শেষ হতে চায় না সে সব গল্প। মেয়েরা ভিড় করে গল্প শোনে। আর তারই ফাঁকেই বুদ্ধি করে শাঁখারি কাকা জেনে নেয় কোন বাড়িতে অবিবাহিত বা বিবাহযোগ্য ছেলেমেয়ে আছে। পাত্রপক্ষ কেমন পাত্রী চাইছে। পাত্রীপক্ষই বা কেমন পাত্র চায়। দেনা পাওনা ইত্যাদি বিষয়ে খুঁটিনাটি জেনে নেয় শাঁখারি কাকা। এতে তার ঘটকালি করতে সুবিধা হয়।

প্রদীপের পাত্রী ঠিক করে দিয়েছিল শাঁখারি কাকা। খুব ভালো কুটুম্ব পেয়েছে ধনঞ্জয়। বৌমাও হয়েছে মনের মতো। সবাইকে বেঁধে বেঁধে রাখে। প্রদীপের মেয়েও হয়েছে একটা। ফুটফুটে জোছনার মতো। শাঁখারি কাকাকে বলা আছে প্রতীপ আর প্রতীকের জন্যে সম্বন্ধ দেখার।

এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতেই মাঠের পথ ধরে হাঁটছিল হালদারবাবু। লাইনের কাজ হচ্ছে তাই ট্রেনটাও লেট করল অনেক। স্টেশন থেকে বাসস্ট্যান্ডে এসে দেখল শেষ বাস ছেড়ে চলে গেছে অনেকক্ষণ আগে। অগত্যা বেশি পয়সা দিয়ে অটো বুক করে আসতে হল তাকে। বাসস্টপেজ থেকে অনেকটা রাস্তা হেঁটে গ্রামে ঢুকতে হয়। মাঠের মাঝবরাবর আলপথ ধরে হেঁটে এলে রাস্তাটা একটু কম হয়। মাঘী পূর্ণিমা। তাই চাঁদের আলোয় থই থই করছে চারিদিক। জোছনায় আলোর বন্যা বইছে যেন।

আলপথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে ধনঞ্জয় শুনতে পেল কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে। ধনঞ্জয়— ধনঞ্জয়।

হ্যাঁ, তার নাম ধরেই তো ডাকছে। দাঁড়িয়ে পড়ল ধনঞ্জয়। চারিদিকে তাকিয়ে দেখল। কিন্তু না, কেউ কোথাও নেই। মনের ভুল ভেবে হাঁটতে শুরু করল। আবার সেই ডাক। ধনঞ্জয়— ধনঞ্জয়।

চারিদিকে তাকিয়েও ধনঞ্জয় ফুটফুটে জোছনায় কাউকে দেখতে পেল না।

হঠাৎ তার মনে হল দূরে আলপথে কেউ একজন মাথায় ঘোমটা দিয়ে বসে আছে। বড়ো অবাক হল ধনঞ্জয়। এত রাতে ঘোমটা মাথায় কে বসে আছে? আর কেনই বা তার নাম ধরে অমন করে ডাকছে? অন্য কোন ধান্দা আছে নাকি? চোর ডাকাত নই তো? চোর ডাকাত হলেও হতে পারে। শহর থেকে অনেকগুলো টাকা নিয়ে ফিরছে। মাঘ মাসের এই শীতেও ভয়ে কুলকুল করে ঘামতে শুরু করল ধনঞ্জয়। টাকা পয়সা নেয় নিক। প্রাণে মেরে দিলেই তো সব শেষ। তার পা ভারী হয়ে গেল। কোন রকমে গলার থেকে স্বর বের হল, 'কে? কে ওখানে?'

না কোন উত্তর নেই। শুধু মনে হল ঘোমটাটা যেন একটু নড়ে উঠল। পরক্ষণেই ভুল ভাঙল ধনঞ্জয়ের। না, কেউ বসে নেই। একটা ভাঙা ন্যাড়া বাবলা গাছ। চাঁদের আলোয় দূর থেকে ওরকম মনে হচ্ছিল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ধনঞ্জয়। বাড়ির উদ্দেশ্যে জোরে জোরে পা চালাল। আবার তাঁর কানে ভেসে এল সেই ডাক।

ধনঞ্জয়-ধনঞ্জয়।

ভয়ে গলা শুকিয়ে গেল তার। দ্রুত, আরো দ্রুত হাঁটতে লাগল সে।

ধনঞ্জয় বাড়ি ফিরে সেই যে বিছানা নিল আর উঠল না। অনেক ডাক্তার, বদ্যি দেখানো হল। কোন কিছুতেই কিছু হল না। একসময় ইহলোকের মায়া কাটিয়ে পরলোকে পাড়ি দিল ধনঞ্জয়। সংসারে থাকল তার স্ত্রী, তিন পুত্র, এক পুত্র বধূ আর ফুলের মতো এক নাতনি। কাল অশৌচ কাটিয়ে শাঁখারি দাদুর সহায়তায় দুই ভাইয়ের বিয়ে দিয়েছিল প্রদীপ।

(৩)

আজ সুখময়ের মনটা খুবই খারাপ। খারাপ হবে নাই বা কেন? তার চেষ্টার কোন মূল্য নেই বাবার কাছে। সংসারে অভাব অনটন তো থাকবেই। তাই বলে ছেলের ভবিষ্যতের চিন্তা করবে না! এ কী রকম বাবা!

সুখময়ের আরো পড়াশোনা করার ইচ্ছা। সে বোঝে। এতদিন তো কোনরকমে চলে গেল। সরকারি স্কুল। পড়াশোনার খরচ সে রকম কিছুই ছিল না। তাছাড়া স্কুলটি ছিল বাড়ির কাছেই। একই স্কুলে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক। বাড়ির কাছে স্কুল বলে হেঁটেই যাতায়াত

করত। মাঝে মধ্যে অবশ্য সাইকেল নিত। তাদের একটাই সাইকেল। সাইকেলটা ছিল লটারিতে পাওয়া। গ্রামে গঞ্জে প্রায়ই এরকম লটারি হয়। বিভিন্ন প্রাইজ থাকে সে সব লটারিতে। বাবা একবার লটারির একটা টিকিট কেটে আনলেন। সেই লটারিতেই পাওয়া গেল সাইকেলটি। ফার্স্ট প্রাইজ।

যেদিন বাবা সাইকেল নিয়ে বেরোতেন সেদিন সুখময় হেঁটেই স্কুলে যেত। আর যেদিন বাবার কাজ থাকত না, সাইকেলটি বাড়ির উঠোনের একদিকে রাখা থাকত। সুখময় সেদিন সাইকেল নিয়ে স্কুলে যেত। তবে সাইকেল চালিয়ে স্কুলে যাওয়ার থেকে হেঁটে স্কুলে যেতেই তার বেশি ভালো লাগত। ফলে স্কুলে যাতায়াতের কোন খরচা ছিল না। টিফিন খরচও ছিল না সেরকম। বাড়ি থেকে টিফিন নিয়ে স্কুলে যেত সে। টিফিন বলতে হাতে গড়া বাসি রুটি আর তালগুড়। কোন কোন দিন শুকনো মুড়ি। কপাল ভালো থাকলে মুড়ির সঙ্গে মাঝে মধ্যে চানাচুর বা ছোলাভাজা মিলত। অন্যান্য ছেলেরা নানারকম লোভনীয় টিফিন নিয়ে স্কুলে যেত। টিফিনের সময় তারা বন্ধুদের সঙ্গে টিফিন ভাগাভাগি করে খেত। তখন সুখময় একা একা শুকনো মুড়ি বা রুটি চিবোত। সুখময় বরাবরই একা একা থাকতেই ভালোবাসে। তাই তার সেরকম কোন বন্ধু ছিল না কোনকালেই।

পড়তে পড়তে প্রসূন আর প্রতুল ঝগড়া শুরু করেছে। বড়ো ছেলের ছেলে প্রসূন। মেজ ছেলের ছেলে প্রতুল। প্রসূন আর প্রতুল দু'ভাই ক্লাস টু'তে পড়ে। দু'জনের মধ্যে এই ভাব আবার এই আড়ি। এখন তারা পেন্সিল নিয়ে ঝগড়া শুরু করেছে। সুখময় একবার কটমট করে তাদের দিকে তাকাল। তারা ভয় পেয়ে ধারাপাত বই খুলে বসল। তাদের ছ'য়ের ঘরের নামতা মুখস্থ করতে বলল সুখময়। তারা ছ'য়ের ঘরের নামতা পড়তে শুরু করল মুখ ভারী করে। ছয় এক্কে ছয়, ছয় দুগুণে বারো, তিন ছয়ে আঠারো।

প্রভাস আর প্রকাশ দু'জনে পড়ে ক্লাস ফোরে। মেজ ছেলের বড়ো ছেলের নাম প্রভাস আর ছোটো ছেলের একটিই ছেলে। তার নাম প্রকাশ। তাদের দু'জনের মধ্যে খুব ভাব। তারা দু'জনেই খুব শান্ত স্বভাবের। কথা বলে খুব কম। কিছু জিজ্ঞাসা করলে তারা উত্তর দেয়। নাহলে তারা প্রায় কথাই বলে না। পড়া মুখস্থ করতে তারা খুব পারদর্শী। অঙ্ক করতে তাদের ভালো লাগে না। পারলে অঙ্কটাও মুখস্থ করে তারা।

বাড়ির বড়োদের সঙ্গে ছোটোদের নামগুলোর বেশ মিল আছে। মনে হয় মিল করে করেই নামগুলো রাখা হয়েছে। কিন্তু মেয়েটার নাম সম্পূর্ণ আলাদা। মেয়েটার নাম সুতপা। বাবা কাকাদের নামের সঙ্গে তার নামের কোন মিল নেই। মা'র নামের সঙ্গে মিল থাকতে পারে। সুতপার বাবার নাম প্রদীপ। সুতপার নামে প্রদীপের 'প' তো আছেই। তাহলে তার মায়ের নাম কি সুলোচনা, সুচরিতা, সুচিত্রা, সুমিত্রা। মেয়েদের কত নাম মনে পড়ে তার। সুতপার সঙ্গে তার মায়ের নাম মেলাতে চেষ্টা করে সুখময়। কিন্তু আজও পর্যন্ত হালদার বাড়ির কোন বউমার নাম জানে না সুখময়। সুতপাকে জিজ্ঞাসা করাও হয়নি কোন দিন।

সুতপা ক্লাস সেভেনে পড়ে। পড়াশোনায় খুব খারাপ নয়। মাঝারি মানের। সুখময়ও ছাত্র হিসাবে অসাধারণ নয়। মেধার দিক থেকে দু'জনেই সমান সমান। এটাই ভালো। তার থেকে উচ্চ মেধার ছাত্রছাত্রীকে পড়ানো তার পক্ষে সম্ভব নয়। সুতপা এখন ইতিহাস পড়ছে। দুলে দুলে পড়ছে।

পড়ার ঘরটাতে একটা বড়ো তক্তপোশ পাতা। তার উপর দু'টো শীতলপাটি বিছানো। সবাই গোল হয়ে পড়তে বসে। সুখময়ের পাশটাতে বসে সুতপা। একটা মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসে সুখময়ের নাকে। গন্ধটা কীসের সুখময় তা বুঝতে পারে না। কোনও ফুলের হবে হয়তো। বাড়ির পিছনে ফুলের বাগান থাকতে পারে। সমস্ত বিত্তবান মানুষদের বাড়ির সামনে ফুলের বাগান থাকে। হালদারবাবুদের বাড়ির পিছনে হয়তো ফুলের বাগান আছে। সেখান থেকেই এই গন্ধ ভেসে আসছে। কিন্তু এত মিষ্টি গন্ধ কোন ফুলের হতে পারে। বেল, জুঁই, টগর, বকুল ! না কোন ফুলেরই তো এমন গন্ধ থাকে না। সুখময়ের খুব অবাক লাগে। গন্ধটা সে পায় সুতপা তার পাশে বসার পর। সুতপা কী কোনও ফুল সঙ্গে করে নিয়ে আসে ? বুঝতে পারে না সুখময়।

ফুলের গন্ধে ঘোর লেগে যায় সুখময়ের। সময়ের দিকে খেয়াল থাকে না তার। সে পড়িয়েই যায়। যেন নেশা লেগে যায় তার। বাচ্চাগুলোর পড়া হয়ে যায়। তারা ঘুমে ঢুলতে থাকে। সুখময় তখনও সুতপাকে অঙ্ক দেখাতে থাকে।

একসময় হালদারবাবুর মেজ বউমা বলেন, 'সুখময় এবার ওদের ছুটি দাও।'

ছুটি দিতে ইচ্ছে করে না সুখময়ের। বসে বসে সারারাত ধরে পড়াতে ইচ্ছে করে তার। পড়াতে যে এত সুখ এ বাড়িতে পড়াতে না এলে জানতেই পারত না সে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুখময় বলে, 'চলো, আজ তাহলে ছুটি। ছেলেদের বই গোছানোয় থাকে। ছুটি পেলেই তারা উঠে পড়ে। সুতপার তখনো বই গোছানো বাকি। সে বসে বসে বই গোছাতে থাকে। হালদার বাবুর মেজ বউমা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে না, সুতপার চোখে চোখ পড়ে যায় সুখময়ের। বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে যায় সারা শরীরে। পরের দিন আবার সন্ধ্যা ছ'টা বাজার প্রতীক্ষা নিয়ে অন্ধকার রাস্তায় পা বাড়ায় সুখময়।

সপ্তাহে একদিন করে এবাড়িতে আসে সেজবউ। সুখময়ের সেজ জ্যেঠিমা। নিজের নয়। পাড়াতুতো সম্পর্কে জ্যেঠিমা। সেজ জ্যেঠিমার দুই মেয়ে। অরুণা আর বরুণা। অরুণা সুখময়ের সমবয়সী। বরুণা তাদের থেকেও পাঁচ বছরের ছোটো। অরুণা ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়াশোনা করেছিল। তারপর আর পড়াশোনা করেনি। এখন বাড়িতে সেলাই মেশিন চালায়। বরুণা থাকে মামার বাড়ি। সে কোন ক্লাসে পড়ে সুখময় তা জানে না।

সেজ জ্যেঠিমা খুব সুন্দরী। শুধু খুব বললে ভুল বলা হবে। খুব এর সঙ্গে বেশ কয়েকটি খুব যোগ করতে হবে। খুব খুব খুউব সুন্দরী। জ্যেঠুর সঙ্গে একদমই মানায় না। সেজ জ্যেঠু সংসারে উদাসীন। সারা দিন ঘুরে বেড়ায় টো টো করে। এর বাড়ি ওর বাড়ি গিয়ে বসে গল্প করে। চা খায়। মুড়ি খায়। মাঝে মধ্যে ইয়ার দোস্তদের পাল্লায় পড়ে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে বাড়ি ফেরে। তখন বাড়িতে হুলুস্থুল পড়ে যায়। জ্যেঠিমা চিৎকার করে জ্যেঠুকে বকাবকি করতে থাকে। জ্যেঠু মাতাল হলেও তার তালের গণ্ডগোল হয় না। গালাগাল দিয়ে জ্যেঠিমার চোদ্দ গুষ্টি উদ্ধার করতে শুরু করে। পাড়া প্রতিবেশি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে

মজা লুটতে থাকে। অরুণা তখন বারান্দায় বসে কাঁদতে শুরু করে।

অরুণা মায়ের মতো দেখতে হয়নি। হয়েছে বাবার মতো। কালো রোগাটে। মুখখানা তার বাবার আদলে গড়া। চোয়াল ভাঙা। অরুণার তাই বিয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তার বিয়ের জন্যে অনেক চেষ্টা করছে তার মামারা। মামার বাড়িতে থেকে বরুণার শরীরটা এখন বেশ ভালো হয়েছে। কয়েক মাস আগেই বরুণা বাড়ি এসেছিল। তখনই দেখেছিল সুখময়। অরুণাকেও তার মামারা নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু মা'কে ছেড়ে মামাদের আশ্রয়ে যেতে রাজি হয়নি সে। কথায় বলে বাবার মুখের মতো মেয়ের মুখের গঠন হলে সে মেয়ে সুখী হয়। কিন্তু কোথায় কী ? অরুণাকে সুখী মনে হয় না সুখময়ের।

জ্যেঠিমা রূপবতী। সুন্দর স্বাস্থ্য। গায়ের রঙ ধবধবে ফর্সা। এরকম একজন সুন্দরী রমণীর সঙ্গে সেজ জ্যেঠুর বিয়ে হল কীভাবে সেটাই একটা আশ্চর্যের বিষয়। অবশ্য একসময় সেজ জ্যেঠুর বাবার অনেক বিষয় সম্পত্তি ছিল। সেই সম্পত্তি তখনও ভাগ বাটোয়ারা হয়নি ছয় ভাইয়ের মধ্যে। সেজ জ্যেঠিমার বাবা দাদারা সেই সম্পত্তি দেখেই হয়তো সেজ জ্যেঠুর সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছিলেন। সেজ জ্যেঠুর বাবা মারা যাওয়ার পর তাদের সম্পত্তি ভাইদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা হয়ে যায়। জ্যেঠু ছিল একটু পাগলাটে ধরনের। বৈষয়িক বুদ্ধি ছিল না একেবারেই। তার উপরে জ্যেঠিমার রূপ দেখে অন্য ভাই ও ভাই বউদের হিংসে হয়েছিল বেশ। তারাই ন্যায্য সম্পত্তির ভাগ থেকে জ্যেঠুকে বঞ্চিত করেছিল। বাকি যেটুকু সম্পত্তি জ্যেঠুর ছিল তা মদ খেয়ে নেশা করে উড়িয়ে ফুরিয়ে ফেলেছিল। এখন সম্পত্তি বলতে কিছু ধান জমি আছে জ্যেঠুর। সেগুলিতে বুদ্ধি করে লোকজন লাগিয়ে চাষ করে জ্যেঠিমা। সারা বছরের খোরাকিটা চলে যায় তাতে।

জ্যেঠুকে নিয়ে অনেক হাসির গল্প চালু আছে। সেবার বর্ষাকালে ধান চাষ শুরু হয় জমিতে। দু'জন লোক জ্যেঠুর জমিতে ধান রোয়ার কাজে লেগেছে। একটা ছোটো ধামায় তাদের জন্যে খাবার নিয়ে জমির আলপথ ধরে হেঁটে চলেছে জ্যেঠু। পাশের জমিতে রোয়ার কাজ করছিল কয়েকজন। তাদের মধ্যে একজন জ্যেঠুকে জিজ্ঞাসা করল, 'কী নিয়ে যাচ্ছ গো খুড়ো ?'

— মুড়ি।

— মুড়ি আর কী ?

— মুড়ি, গুড় আর নারকোল।

— কোন গাছের নারকোল ?

— বাঁশ গাছের নারকোল।

হো হো করে হাসিতে ফেটে পড়ল সবাই। জ্যেঠু গালাগাল দিতে শুরু করল। জ্যেঠুর রসালো গালাগাল শুনে তারা হাসিতে এর ওর গায়ে ঢলে পড়ল। আসলে হয়েছে কী, সত্যিই জ্যেঠু মুড়ি গুড় আর নারকোল নিয়ে যাচ্ছিল। নারকোলটা ছিল তাদের বাড়ির উত্তর দিকে বাঁশবাগানের মধ্যে যে নারকোল গাছটা রয়েছে সেই গাছটার। সেই জন্যে জ্যেঠু বলেছে বাঁশগাছের নারকোল। জ্যেঠুর বলার মধ্যে হয়তো সামান্য ভুল ছিল। কিন্তু প্রশ্ন কর্তাদের বোঝার মধ্যে ভুল ছিল অনেক।

জ্যেঠিমাকে নিয়েও অনেক রসালো গল্প ছড়িয়ে ছিল গোটা গ্রামে। জ্যেঠিমার শরীরটা দিন দিন আকর্ষণীয় হয়ে উঠছিল সবার কাছে। একে তো জ্যেঠুর ওই অবস্থা তার উপর নেশাভাঙ করে। নদীর কূল ছাপানোর মতো জ্যেঠিমার উপচে পড়া যৌবন। সব মিলিয়ে অনেকের ধারণা হয়েছিল জ্যেঠিমার শরীরটা বুঝি সহজলভ্য। কানা ঘুষোয় শোনা যায়, বরুণা জ্যেঠির গর্ভজাত হলেও সে নাকি জ্যেঠুর ঔরসজাত নয়।

জ্যেঠিমা অনেক বাড়িতে গিয়ে মুড়ি ভেজে দেয়। সেখান থেকে কিছু রোজগারপাতি হয় তার। শুধু ধান দিয়ে তো আর পেট ভরে না। সংসারের টুকিটাকি কিছু কেনাকাটার জন্যে অর্থের প্রয়োজনও তো হয়। পাঁচ-দশ বাড়িতে মুড়ি ভেজে জ্যেঠিমা সেই অর্থের সংস্থান করে।

জ্যেঠিমাকে খুব পছন্দ সুখময়ের। তাকেও ভীষণ ভালোবাসে জ্যেঠিমা।

তাদের বাড়িতে জ্যেঠিমা এলেই সুখময়ের নাকে ফুলের গন্ধটা ভেসে আসে। সপ্তাহে একদিন করে তাদের বাড়িতে মুড়ি ভাজতে আসে জ্যেঠিমা।

মা জ্যেঠিমা উঠোনে মুড়ি ভাজতে বসেছে। নানান গল্প খুনসুঁটিতে ভরে উঠেছে উঠোনের উনোনশালা। জ্যেঠিমার কথায় মা হাসছে। আবার মা'র কথায় জ্যেঠিমা হাসছে। জ্যেঠিমার হাসি দেখে বোঝাই যায় না তার একটা অভাবের জীবন, অপ্রাপ্তির জীবন, অপূর্ণতার জীবন। গরম বালিতে মুড়ির চাল ফুটে উঠে ঠিকরে পড়ছে চারিদিক। ঠিক জ্যেঠিমার হাসির মতো। হাসতে হাসতে জ্যেঠিমা মা'কে বলছে, 'জানিস কল্পনা, তোর ছেলের গা থেকে পুরুষ মানুষের গন্ধ ভেসে আসে ভীষণ।'

— কী যে বল দিদি, সুখ তো আমার আর ছোটোটি নেই। এখন সে বড়ো হয়েছে। পুরুষ মানুষের গন্ধ তার শরীর থেকে ভেসে আসবে বইকি।

— পুরুষ মানুষের গন্ধ আমার নাকে এলে আমার শরীরটা কেমন করে ওঠে জানিস।

— চুপ করো। তোমার যত আজে বাজে কথা।

ফুলের গন্ধে বিভোর সুখময়ের দিন কাটে না। রাত কাটে না। ঘরের বারন্দায় রাখা গোল ঘড়ির কোনো সংখ্যা তার চোখে পড়ে না। শুধুমাত্র পাঁচ সংখ্যাটি তার চোখে ধরা দেয় উজ্জ্বল হয়ে। পাঁচটা বাজলেই সে চঞ্চল হয়ে ওঠে পড়াতে যাবার জন্যে।

জামা গায়ে দিয়ে বের হচ্ছিল সুখময়। পুরুষ মানুষের গন্ধ কথাটা তার কানে এল। পুরুষ মানুষের গায়ে ঘামের গন্ধ ছাড়া আর কী গন্ধই বা থাকতে পারে !

— আমি বের হচ্ছি মা।

— এখনি বের হবি বাবা ? মুখে কিছু দিবিনে ?

— না মা। হালদারবাবুদের বাড়ি গেলে ওরা তো খেতে দেয়।

— তা দেয়।

জ্যেঠিমার মুখের দিকে তাকাল সুখময়। ধোঁয়া ঘামে জ্যেঠিমার মুখটা লাল হয়ে গেছে। বেশ লাগছে তাকে। জ্যেঠিমার পাশ দিয়ে যাবার সময় ফুলের গন্ধটা আবার নাকে ভেসে এল সুখময়ের।

না, এখানে আশেপাশে কোনও ফুলের গাছ নেই। তবুও ফুলের গন্ধ পেল সুখময়। রাস্তায় বেরিয়ে সে গন্ধটা আর পেল না। জ্যেঠিমার বলা পুরুষ মানুষের গন্ধ কথাটা মাথার কোষে কোষে ঘুরতে লাগল

সুখময়ের। সত্যিই তো পুরুষ মানুষের গায়ের আলাদা কোন গন্ধ হয় নাকি! তাদের গায়ে তো শুধু ঘামের নোনা গন্ধই থাকে। সোঁদা মাটির গন্ধ থাকে। নাকি অন্য কোনও গন্ধ থাকে যা শুধু মেয়ে মানুষরাই পায়। মেয়ে মানুষের গায়ে কি আলাদা কোনও গন্ধ থাকে? মায়ের গায়ে কি আলাদা কোনও গন্ধ আছে? মনে করে দেখল সুখময়। না মায়ের গায়ের আলাদা গন্ধ সে কখনো পায়নি। মায়ের গা থেকে গন্ধ একটা পেত, বিশেষ করে শীতকালে। সে গন্ধ বোরোলীনের।

(৪)

ইন্দ্রনাথবাবু এ তল্লাটের সবচেয়ে পয়সাওয়ালা লোক। সম্পদ মানুষকে দিশেহারা করে রাখে। সম্পদ মানুষকে স্থিতি দেয় না। কীভাবে সম্পদ বাড়ানো যায় সেই চিন্তায় তিনি সবসময় অস্থির হয়ে থাকেন।

'সুখময়, সুখময়। চলে এসো। আমি এগিয়ে যাচ্ছি।' বাড়ির পেছনের রাস্তা থেকে হাঁক দিয়ে সাইকেল নিয়ে এগিয়ে যান ললিতবাবু। তাঁর বাড়ি বনগ্রাম। সুখময়দের গ্রাম ভবানীপুর থেকে বেশ খানিকটা দূরে। ললিতবাবু ইংরেজির শিক্ষক। কোন স্কুলে চাকরি করেন না। প্রাইভেট টিউশন পড়ান। সন্ধ্যায় তিনি ইন্দ্রনাথবাবুদের বাড়িতে টিউশন পড়াতে আসেন সপ্তাহে তিন দিন। সেখানে পড়ে ইন্দ্রনাথবাবুর ছোটো ছেলে বিজন আর বড়ো মেয়ের মেয়ে পিয়াসা। বিজন আর পিয়াসা একই বয়সী। মামা ভাগ্নী সম্পর্ক।

ললিতবাবু সুখময়কে ডেকে নিয়ে যান তাদের একসঙ্গে বসিয়ে পড়ানোর জন্যে। তিনজনের একই ক্লাস। একই স্কুল। তাই সুখময় তাদের সঙ্গে পড়তে এলে বিজন পিয়াসা খুশিই হয়। খুশি হতে পারেন না ইন্দ্রনাথবাবু।

অর্থনৈতিকভাবে সুখময়দের অবস্থান ইন্দ্রনাথবাবুর থেকেও অনেক নীচে। দু'দুটো ইটভাঁটার মালিকানার অংশীদার তিনি। সুখময়ের বাবা সেই ভাঁটার একজন ডেলি লেবার মাত্র। শ্রমিকের ছেলে তাঁদের বাড়িতে তাঁর ছেলে ও নাতনির সঙ্গে বসে টিউশন পড়বে তা তিনি মেনে নিতে পারেন নি।

একদিন ইন্দ্রনাথবাবুদের বাড়ির সামনে চালতা গাছের নীচে দাঁড়িয়েছিল সুখময়। ললিতবাবু তখনও আসেন নি। বাইরে বেরিয়ে ইন্দ্রনাথবাবু দেখলেন চালতা গাছের নীচে সুখময় বই হাতে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি সুখময়কে বললেন, 'কী রে, কী চাই? এখানে দাঁড়িয়ে আছিস যে?

— স্যার আমাকে আসতে বলেছেন। আমতা আমতা করে সুখময় বলেছিল কথাটা।

— কেন, স্যার আসতে বলেছেন কেন?

— একসঙ্গে বসে পড়ার জন্যে।

— দ্যাখ সুখময়, আমরা অনেক বেশি টাকা দিয়ে ললিতবাবুকে রেখেছি। আলাদাভাবে শুধু বিজন আর পিয়াসাকে পড়ানোর জন্যে। তার মধ্যে উনি তোকে ডেকে আনছেন কেন বুঝতে পারছি না। মাথা নাড়াতে নাড়াতে চলে গেলেন ইন্দ্রনাথবাবু। সুখময়ের খুব খারাপ লেগেছিল সেদিন। সে অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে এসেছিল বাড়ি। পাছে ফেরার পথে ললিতবাবুর সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায়। বাড়িতে ফিরে বিছানায় শুয়ে পড়েছিল সুখময়। বাড়ির কাউকেই ইন্দ্রনাথবাবুর কথাগুলো বলতে পারেনি সে। সেদিন ভীষণ অপমানবোধ জেগে উঠেছিল তার মনে। মা কিছু একটা আন্দাজ করে ঘরে এসে আলো জ্বেলে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কিরে এই ভরসন্ধ্যায় বাড়িতে এসে শুয়ে পড়লি যে?'

— শরীরটা ভালো লাগছে না মা।

— কেন কী হয়েছে তোর?

— কিচ্ছু হয়নি মা, এমনিই।

— তোর মাস্টারমশাই তো ডেকে গেল তোকে। আমি বললাম সুখময় চলে গেছে।

— ঠিকই তো বলেছো মা। তুমি আলোটা নিভিয়ে দাও না মা। আমার বড্ড মাথা ধরেছে।

ছেলের কপালে হাত দিয়ে দেখল কল্পনা। না, জ্বর তো নেই। রাতে বাড়ি ফেরার পথে ললিতবাবু আবার ডাক দিলেন, 'সুখময়, সুখময়। পড়তে গেলে না কেন?' সুখময় কোন সাড়া করল না। বারান্দা থেকে তার হয়ে মা বলল, 'ওর শরীরটা ভালো নেই মাস্টারমশাই। ও পড়তে গিয়েও ফিরে এসেছে।'

বড়ো অবাক হলেন ললিতবাবু। কই সুখময় তো আসে নি!

দু'দিন পরে দেখা হতে ললিতবাবুকে ঘটনাটা বলেছিল সুখময়। একটু অবাক না হয়ে তিনি তাকে বলেছিলেন, 'তোমার কোনও চিন্তা নেই। তুমি আমার সঙ্গে যাবে। কেউ কিছু বললে আমি তার উত্তর দেব।' এমন দৃঢ়তার সঙ্গে কথাগুলো বলেছিলেন তিনি যে সুখময় আর না করতে পারে নি।

মাধ্যমিকের ইংরেজি আর উচ্চ মাধ্যমিকের ইংরেজির মধ্যে আসমান জমিন ফারাক। সুতরাং একজন ইংরেজির মাস্টারমশাইয়ের কাছে প্রাইভেট টিউশন পড়া দরকার। স্কুলের কয়েকজন সিনিয়র দাদাদের থেকে তারা ললিতবাবুর রেফারেন্স পেয়ে গেল। তারা ঠিক করে নিল ললিতবাবুর কাছেই ইংরেজি পড়বে। কারণ তার মতো টিফটর এ চত্বরে আর একটিও নেই। স্কুলেই পড়াবেন তিনি। স্কুল শেষে দু'ঘণ্টা করে। দশ জন ছাত্র নিয়ে এক একটা ব্যাচ। প্রথমদিন পড়াতে এসে ললিতবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'বল তো বি এল ডাবল ও ডি কী হয়?' ছাত্ররা প্রায় সবাই বলল ব্লুড। একমাত্র সুখময়ই বলেছিল ব্লাড। তখন থেকেই সে ললিতবাবুর নজরে পড়ে যায়। তিনি সেদিন পড়ানোর শেষে সুখময়কে ডেকে বললেন, 'কোথা থেকে আসো বাবা?'

— ভবানীপুর থেকে।

— তাই নাকি?

— হ্যাঁ স্যার।

— আমি তো ভবানীপুরে পড়াতে যাই।

— ভবানীপুরে কোথায় স্যার?

— ইন্দ্রনাথবাবুদের বাড়ি। ইন্দ্রনাথবাবুর ছেলে ও নাতনি পড়ে আমার কাছে। তুমি ওখানেই পড়তে এসো সন্ধেবেলা। এদের সঙ্গে তোমাকে পড়ানো যাবে না। সাইকেলে চেপে চলে গেলেন ললিতবাবু।

তারপর থেকেই সে ইন্দ্রনাথবাবুর বাড়িতে পড়তে যায়। বন্ধুরা তাকে টিটকারি করতে ছাড়ে না। বলে, 'তুই ভালো ছেলে। আমাদের

থেকে আলাদা। তাই স্যার তোকে আলাদাভাবে ডেকে নিয়ে স্পেশালভাবে পড়াচ্ছেন।'

সুখময় তাদের বলেছিল, 'না রে, সেরকম কিছু নয়। আসলে স্যার আমাদের পাড়ায় পড়াতে যান তো। বিজনদের বাড়ি আর আমাদের বাড়ি একেবারে পাশাপাশি।

এই যুক্তিতে সুখময়ের বন্ধুরা যে খুব খুশি হয়েছিল তা নয়। বরং তারা পিয়াসাকে তার সঙ্গে জড়িয়ে এমন সব কথা বলেছিল যে সুখময় একেবারে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছিল।

ইন্দ্রনাথবাবুদের ছাদের ঘরে ললিতবাবু পড়াতেন তিনজনকে। যেদিন করে পিয়াসা সুখময়ের পাশে বসত সেদিন করে একটা মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসত তার নাকে। জ্যেঠিমার পুরুষ মানুষের গায়ের গন্ধ কথাটায় মনে পড়ল তার। পিয়াসার পাশে বসলে যে গন্ধটা পেত সে, সেই একই গন্ধ সে পায় সুতপা তার পাশে বসলে। একই গন্ধ পায় সে জ্যেঠিমার কাছে গেলে। তাহলে এই গন্ধটা কি মেয়েদের গায়ের গন্ধ! সত্যিই তো এ গন্ধ ফুলেরই গন্ধ। মেয়েরা তো ফুলেরই মতো।

হালদারবাবুদের বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে সেই একই গন্ধ ভেসে এল সুখময়ের নাকে। তাকিয়ে দেখল বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে সুতপা। টুকটুকে লাল ফ্রক আর মুখের হাসিতে তাকে তাজা গোলাপ ফুল বলেই মনে হল সুখময়ের।

আমতেল মেখে মুড়ি খেতে খেতে প্রদীপ সুনিপাকে জিজ্ঞাসা করল, 'ছেলেটিকে ঠিক চিনলাম না তো?' শুকনো শাড়ি, জামাকাপড় ভাঁজ করে আলনায় গুছিয়ে রাখছিল সুনিপা। স্বামীর কথায় দরজা দিয়ে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখে নিয়ে সাবধানী গলায় বলল, 'সে এক কাণ্ড। সেসব শুনলে তোমার গা পিত্তি একেবারে জ্বলে যাবে।' স্ত্রীর কথা কিছুই বুঝল না প্রদীপ। বলল, 'এই ছেলেটি কে?'

— ওই তো হাজরাদের বাড়ির ছেলে। গুণধর হাজরার নাতি।

— গুণধর হাজরার নাতি! মানে জলধর দা'র ছেলে?

— ওর বাবার নাম জলধর? তা আমি জানি না।

— আরে হ্যাঁ, জলধরদা খুব ভালো লোক। কিন্তু জলধর দা'র ছেলে এত বড়ো হয়ে গেল! মনে হচ্ছে এই তো সেদিন ওর বাবার বিয়ে হল। আরে আমাদের পাড়ার ওর নামটা কী বল না?

— কার নাম?

— ও হো, আরে বাবা, কিছুতেই নামটা মনে পড়ছে না আমার। আরে বাবা, মন্দিরের পাশ দিয়ে গিয়ে একেবারে মাঠের ধারের বাড়িটা। কী পাগলি আছে না একটা?

— তুমি কি খুদি পাগলির কথা বলছ?

— হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুদি। খুদি। ওর দাদার নামটা যেন কী?

— জগা জগা করে তো ডাকে সবাই।

— হ্যাঁ। ওর ভালো নাম জগদীশ। ওরই মাসতুতো দিদির সঙ্গে বিয়ে হয়েছে জলধর দা'র। ওই কী এখন পড়াতে আসে ছেলেমেয়েগুলোকে?

— হ্যাঁ।

— কেন? অলোকের কী হল?

— কী আবার হবে? তোমার আদরের মেজ বৌমা যা কাণ্ডটি করেছে।

— কী করেছে কী মেজবউ?

— আঃ, আস্তে বল না। অত চিৎকার করছ কেন? খোলা দরজা দিয়ে উঁকি মেরে বাইরেটা দেখে নিয়ে প্রদীপের প্রায় গা ঘেঁষে বসল সুনিপা। বলল, 'মেজ ঠাকুরপোকে আবার এসব কথা বোলো না যেন। উদ্বিগ্ন প্রদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'কী কথা?'

— কী লজ্জা, কী লজ্জা।

— আরে হয়েছেটা কী? সেটা তো বলবে।

মুড়ি খাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে প্রদীপের।

— বলছি, বলছি। আগে মুড়ি খাও। রান্নাঘর থেকে চা নিয়ে আসি। তারপর বলছি।

সুনিপার কথা শুনে প্রদীপ বেশ ঘাবড়ে গিয়েছে। বাবার মৃত্যুর পর তারা তিন ভাই মিলে ব্যবসাটাকে একটু দাঁড় করিয়েছে সে। প্রতীপ আর প্রতীককে হাতে ধরে কাজ শিখিয়েছে সে। প্রতীক তার কথা অমান্য করে না কখনো। প্রতীকের বউও হয়েছে ভালো সহবত জানে। সমস্যায় পড়তে হয় প্রতীপকে নিয়ে। সে নিজের স্বার্থ ছাড়া কিছুই বোঝে না। এখনই সে সব কিছু আলাদা করে নিতে চায়। নিজের ভাগ বুঝে নিতে চায়। কিন্তু মা যতদিন জীবিত আছেন পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত কোন কিছুই ভাগ বাটোয়ারা করতে চায় না প্রদীপ। এতে মা ভীষণ কষ্ট পাবেন। মা কোন ছেলে বউমার সাতেও থাকেন না পাঁচেও থাকেন না। দু'বেলা নিজের খাবারটা ঠিক মতো পেলেই মা খুশি। দুপুরবেলা এক মুঠো ভাত আর রাতে এক বাটি মুড়ি। বাবা মারা যাওয়ার পর মা মাছ মাংস একেবারেই সহ্য করতে পারেন না। নিরামিষ খেতেই ভালোবাসেন। তাই প্রতিদিন মা'র জন্যে একপো করে দুধের ব্যবস্থা করে দিয়েছে প্রদীপ। মা'র কষ্টে প্রতীপের মন কাঁদে বলে তার মনে হয় না। মা'র কষ্টের থেকেও তার কাছে গুরুত্ব পায় তার বউ নয়নার কষ্ট। এসব কথাই জানে প্রদীপ। নয়না কি তবে আবার নতুন করে কোন গণ্ডগোল পাকাল সংসারে। আলাদা হয়ে যেতে চায় সে! বলা যায় না। কিন্তু তার জন্যে অলোক পড়াতে আসবে না কেন? নয়নাকে একটু তোয়াজ করে চলে প্রদীপ। অন্য কোনও কারণে নয়। মা জীবিত থাকতে সে যেন আলাদা সংসার পাততে না চায় সে জন্যে। তবুও মাঝে মধ্যেই প্রতীপের কানভারি করে নয়না।

দু'কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকল সুনিপা। চা নিয়ে আসার ফাঁকে দেখে এল কার কোথায় অবস্থান। শাশুড়ি মা সন্ধ্যে হলেই শুয়ে পড়েন তার ঘরে। মেজ বউ একটা চেয়ার নিয়ে বসে থাকে ছেলেমেয়েদের পড়ার ঘরে। ছোটো বউ বেবি রান্না ঘরে আটা মাখায়, আলু কুমড়ো কাটে, কখনো বা ছোলার ডাল সেদ্ধ করে। রাতের খাবারের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব তার। সুনিপা রান্নাঘরে ঢোকে একটু পরে। ছেলেরা রুটি খেতে চায় না। তারা ভাত খোঁজে। ছেলেদের জন্যে হাঁড়িতে চাল চাপায় সুনিপা। ততক্ষণে বেবির রুটি বানানো হয়ে যায়। সুনিপার মেয়েটা হয়েছে লক্ষ্মী। যা দাও চুপচাপ তাই খেয়ে নেয়। ঝামেলা করে ছেলেগুলো।

— এই নাও তোমার চা। প্রদীপের সামনে চায়ের কাপ বসিয়ে রাখে সুনিপা।

— তুমি মুড়ি খাবে না?

— খিদে নেই এখন। অবেলায় ভাত খেয়েছি।

— অবেলা করো কেন? এতে তো শরীর খারাপ করবে।

— জামাকাপড়, বিছানার চাদরপাতি কেচে পরিষ্কার করতে আজ একটু দেরি হয়ে গেল।

— নিজের শরীরের দিকে একটু খেয়াল রাখো নিপা। সব সময় কাজ কাজ করে পাগল হয়ো না।

— বাবাহ্! এ যে ভূতের মুখে রাম নাম শুনছি।

— মেজ বউয়ের কথা কী যেন বলছিলে?

— আঃ। আস্তে বলো না। প্রদীপের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে সুনিপা বলল, 'প্রায় রাতে মেজ বউয়ের ঘরে আসতো অলোক।'

— সে কি! চমকে ওঠে প্রদীপ। তার হাত থমকে গেছে। মুড়ির বাটি থেকে তা আর মুখে উঠছে না। বলে, 'তারপর'?

— তারপর আর কী? একদিন বেবির চোখে পড়ল। গভীর রাতে অলোক ফিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

— বল কী!

— তবে আর বলছি কী! প্রথম প্রথম বেবির কথা আমি বিশ্বাস করিনি। ওমা, একদিন রাতে অলোক ঢুকেছে মেজবউয়ের ঘরে। বেবি চুপিচুপি এসে আমাকে ডাকল। বলল, বড়দি দেখবে চলো। তুমি তো আমার কথা বিশ্বাস করো না। দেখবে চলো নিজের চোখে। উঠোনের অন্ধকারে দু'জনে দাঁড়িয়ে থাকলাম বেশ কিছুক্ষণ।

— তারপর, তারপর! শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে প্রদীপের। উত্তেজনায় দু'চোখের পাতা কাঁপছে তিরিতিরি।

— তারপর দেখলুম অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে মেজ চুপিচুপি এগিয়ে গিয়ে খিড়কির দরজা খুলে দিল। মেজর পেছনে পেছনে অলোক এসে বেরিয়ে গেল খিড়কির দরজা দিয়ে। মেজ আবার দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল নিজের ঘরে।

— ঠিক দেখেছো ওটা অলোক?

— মানে?

— না, বললে না অন্ধকার।

— অন্ধকার তো কী হয়েছে? অলোককে চিনতে ভুল করব। ছোটোও ছিল সঙ্গে।

— তারপর? যেন কোন রূপকথার গল্প শুনছে প্রদীপ।

— তারপর আর কী? মেজকে ডেকে বললুম একদিন, মেজ এসব কী ঠিক হচ্ছে? মেজ তো আকাশ থেকে পড়ল। বলল, কী সব দিদি? আমি বললুম, ন্যাকামো করিস না। অলোক কী প্রতিদিন রাতে তোর ঘরে আসে? একেবারে ডাইরেক্ট হিট। প্রথমে তো মানতেই চায় না। বললুম, ছোটোও সাক্ষী আছে। এবারে একেবারে জোঁকের মুখে নুন পড়েছে। কেঁদে কেটে পড়ল আমার পায়ে। আমি দু'কদম পিছিয়ে এসে বললুম, এসব অকাজ কুকাজ করিস না। গোটা গ্রামে এ বাড়ির একটা মান সম্মান আছে। সে মান তুই ডুবোস না। তারপর তো হঠাৎ দেখি অলোক আর পড়াতে আসছে না। সপ্তাখানেক ধরে বাচ্চারা একা একাই পড়াশোনা করল। কিন্তু ওরা কী আর নিজেরা পড়তে চায়। মারপিট করে। হইহুল্লোড় করে। এখন তো সুখময় এসে পড়াচ্ছে। মেজ তো ওঘরে সব সময় বসে থাকে। কে জানে আবার এই ছেলেটার কচিমাথা চিবিয়ে খায় কিনা। একটানা কথাগুলো বলে থামল সুনিপা। তার চোখে মুখে যুদ্ধ জয়ের ছাপ।

কিছু কথা বলল না প্রদীপ। গুম মেরে বসে রইল সে। সুনিপা আবার বলল, মেজ ঠাকুরপোকে প্রতি সপ্তাহে বাড়ি আসতে বলবে। শনিবার আসবে। রবিবার থেকে সোমবার না হয় চলে যাবে।

প্রদীপের এখন আর কথা বলতে ভালো লাগছে না। সংক্ষেপে বলল, দেখছি।

আজ পড়াতে মন নেই সুতপার। বার বার অঙ্কে ভুল হচ্ছে তার। সুখময়েরও কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছে। একই অঙ্ক দেখাচ্ছে বারবার। তবুও সুতপার ভুল হচ্ছে কেন? এত অমনোযোগী তো সে নয়।

সুতপার গায়ের রঙটা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। লাল ফ্রকে তাকে বেশ মানিয়েছে। তার হাসিটা ঝরনার মতো। হাসিতে মুক্তো ঝরে। মাথার দু'দিকে বিনুনী বাঁধা। নীচের ঠোঁটের ডান দিকে একটা ছোট্ট তিল। ঠোঁটের তিলটা তাকে করে তুলেছে মোহময়ী।

সুতপার গায়ের ঘ্রাণ সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো ভেসে ভেসে আসছে সুখময়ের নাকে। সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ কিছুতেই সামলাতে পারছে না সুখময়। এই বুঝি ভেসে যাবে সে, এই বুঝি ডুবে যাবে।

(৫)

ওপারে গঙ্গা পুজো। ওপার মানে নদীর ওপার। নদী ঠিক নয়। নদ। দামোদর নদ। এর একদিক মিশেছে ভাগীরথীতে আর এক দিক মিশেছে রূপনারায়ণে। নদ-নদীর লিঙ্গভেদ হয় কেমন করে কে জানে! বিশেষজ্ঞরা নিশ্চয় বলতে পারবেন। গ্রীষ্মকালে এর এক রূপ আবার বর্ষার সময় এর অন্য রূপ।

এই এখন যেমন। জল নেই বললেই চলে। লোকে হেঁটে নদী পার হয়। অবশ্য জোয়ারের সময় নৌকা লাগে। জোয়ারের জলে যখন কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে থাকে তখন বেশ চওড়া দেখায়। মানুষের জীবনের সঙ্গে নদীর অনেক মিল। অমিলও অবশ্য আছে। নদীর স্রোত হঠাৎ উল্টো দিকে বইতে পারে না। তার একটা বাঁধা ধরা নিয়ম আছে। কিন্তু মানুষ হঠাৎ করেই উল্টোদিকে হাঁটতে পারে। বিনা নোটিসে।

জামাইষষ্ঠীর পরেই দশহরা। এই দিনেই গঙ্গা পুজো। নদীর ওপারে মহাসমারোহে ধুমধাম করে গঙ্গাপুজো হয়। মেলা বসে। যাত্রাগানের আসর বসে। মানুষজনের ভিড়ে জায়গাটা জমজমাট হয়ে থাকে চার-পাঁচ দিন।

বাচ্চুদা, কাশীদা, বিনোদদা এরা সুখময়ের পাড়ার ছেলে। বয়সে বড়ো। এরা তিনজনই গ্র্যাজুয়েশন করছে বেলসিংহ কলেজ থেকে। বয়সে বড়ো হলেও এরা সুখময়ের বন্ধুর মতো। সেদিন সন্ধ্যার সময় এরা তিনজনে মেলায় যাচ্ছিল। তাদের সঙ্গে রওনা দিল সুখময়ও।

বাড়ির কাছেই নদী। আর নদী পেরলেই মেলা। সেদিন হালদারবাবুদের বাড়িতে পড়াতে যাওয়া ছিল না। সুতপার বড়ো মাসির মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে তারা সবাই গিয়েছে শ্যামনগরে। ফিরতে সময় লাগবে। তাই এই ক'টা দিন তার ছুটি। সন্ধ্যার পর সময় আর কাটে না সুখময়ের। পড়াতে যাওয়ার জন্যে ছটফট করে সে। কিন্তু কোথায় পড়াতে যাবে? তার ছাত্রী আর ছাত্ররাই তো বাড়িতে নেই। এক অসহনীয় বেদনা নিয়ে দিন কাটাচ্ছিল সুখময়। সে বুঝতে পারে

না কেন তার এমন হয়।

— 'সুখময় আছিস ?' বাচ্চুদার গলা শুনে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল সুখময়। দেখল কাশীদা আর বিনোদদাও দাঁড়িয়ে আছে।

— বলো, কী বলবে ?

— মেলায় যাবি ? ওপারে।

— দাঁড়াও মা'কে বলে আসি।

মা'কে মেলার কথা বলতে গিয়ে সুখময় দেখল মা ঘরে নেই। রান্না ঘরে নেই। বাবা কয়েকদিন হল বাড়ি ফেরেননি। বজবজে চটকলে শ্রমিকদের নিয়ে কীসব গণ্ডগোল হচ্ছে। ফিরতে দেরি হবে। খিড়কি দরজা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল মা টিউবওয়েল থেকে কলসীতে করে জল আনছে। তাদের গ্রামে এখনো সরকারি সজলধারা প্রকল্প ঢোকেনি। ভোটের সময় এলে শুধু নেতা-নেত্রীদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতিই শুনে আসছে তারা।

— জল আনতে গিয়েছিলে মা ?

— হ্যাঁরে বাবা। কলসীতে এক ফোঁটাও খাবার জল ছিল না। জল আনতে গিয়ে একটু সেজগিন্নির কাছে গিয়েছিলুম। তাই দেরি হল।

সেজগিন্নির নাম শুনে সুখময়ের মনে কীরকম একটা তরল অনুভূতি হল। তার নাকের সামনে ভেসে এল মিষ্টি একটা গন্ধ। যে গন্ধটা ছড়িয়ে পড়ল তার মস্তিষ্কের গোপন কোষে কোষে ঠিক ইথার তরঙ্গের মতো। সে ভুলেই গেল মা'কে কী বলতে এসেছিল।

— কিছু বলবি ? মা'র কথায় সম্বিত ফিরল তার।

— বাচ্চুদারা মেলায় যাচ্ছে। ওদের সঙ্গে আমিও যাব মা ?

— হ্যাঁ যা। ঘরে বসে কী করবি। একটু ঘুরে বেড়িয়ে এলে মনটা ভালো থাকবে। যা ঘুরে আয়। নদীপথ সাবধানে যাস্ বাবা।

কী রকম একটা গন্ধে সমসময় বুঁদ হয়ে থাকে সুখময়। গন্ধ কীসের তা সে ধরতে পারে না। কিছু বিশেষ মানুষের সান্নিধ্যে এলে সে টের পায় গন্ধটা। বিশেষ মানুষ না বলে মেয়ে মানুষ বলাই ভালো। সেজ গিন্নি, সুতপা, পিয়াসা এরা তো মেয়ে মানুষ।

সরু আলপথ ধরে চারজনে হেঁটে চলেছে নদীর দিকে। দু'ধারে ধূ-ধূ প্রান্তর। রোদে পুড়ে শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। এগুলো সবই নদীর চর। নদী এখন সরু হয়ে গিয়েছে। বাবার মুখে শুনেছে নদী আগে অনেক চওড়া ছিল। তাদের বাড়ির সামনে পি ডবলু ডি'র যে বাঁধ সেখান থেকেই নদীর কিনার ছিল। পলি জমতে জমতে নদী যত দূরে সরে গেছে মানুষ সেই পলি জমা জায়গাগুলো দখল করে চাষযোগ্য বাসযোগ্য জমি বানিয়ে ফেলেছে। যদিও এই জমিগুলোতে এখন শুধু চাষাবাদই হয়। ঘরবাড়ি করে বসবাস কেউ এখনো শুরু করেনি।

নদীতে যাওয়ার রাস্তাটা বেশ সরু। তিন-চারজনে পাশাপাশি হাঁটা যায় না। আগে-পিছে করে হাঁটতে হয়। বর্ষাকালে এই রাস্তাটা খুঁজেই পাওয়া যায় না। জোয়ারের সময় নদীর জলে ডুবে থাকে পথটা।

নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করতে করতে তারা আগে-পিছে হেঁটে চলেছে চারজনে। পশ্চিম দিগন্তে সূর্য তখন অস্ত যাওয়ার তোড়জোড় শুরু করেছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষদিক। রোদটা একটু মরে আসতেই নদীর দিক থেকে দখিনা বাতাস আসছে ফুরফুর করে। হাঁটতে বেশ ভালো লাগছে সুখময়ের। বাকি তিনজন নিজেদের মধ্যে গল্পে মশগুল হয়ে আছে। তারা সুখময়ের থেকে একটু দূরত্ব বজায় রেখেছে। তাদের গল্পগুলো সুখময় না শুনলেই ভালো। কারণ তাদের গল্পগুলোতে অশ্লীলতার ছোঁয়া আছে বড়ো বেশি।

নদীর দিক থেকে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে হেঁটে আসছে অনিতা। ফুল ছড়ানো হলুদ সালোয়ার-কামিজে তাকে অপূর্ব সুন্দর লাগছে। অনিতারা থাকে চৌধুরী পাড়ায়। অনিতার বাবা যুধিষ্ঠির চৌধুরী পয়সাওয়ালা লোক। এখানে তার একটা ইটের ভাঁটা আছে। নদীর ওপারে ভগবানপুর। অনিতার মামার বাড়ি।

ভদ্রলোক আর কেউ নয়। কাছাকাছি হতে বোঝা গেল, অনিতার ছোটো মামা। পাড়ার সবাই তাকে মামু বলেই ডাকে। যুধিষ্ঠিরবাবুদের বাড়িতেই থাকেন।

— কী মামু, কোথায় গিয়েছিলেন ?

— বাড়িতে গিয়েছিলুম।

— নদীতে এখন কি ভাটা ?

— হ্যাঁ গো, ভাটা। হেঁটে-হেঁটেই পার হলুম। তোমরা কোথায় যাবে ?

— ওপারে।

— মেলা দেখতে ?

— হ্যাঁ মামু।

— যাও যাও। খুব জমে উঠেছে মেলা। আমরাও ঘুরে এলুম।

অনিতাকে নিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন মামু। সুন্দর একটা গন্ধ ভেসে এল সুখময়ের নাকে।

কাশীদা বলল, 'মেয়েদের গায়ে এত গন্ধ থাকে কেন ?' বলেই হাসতে শুরু করল।

বাচ্চুদা, বিনোদদা হো হো করে হেসে উঠল।

সুখময়ের সেই হাসি ভালো লাগল না।

মেলাতে ঘুরতে ঘুরতে কখন যে সন্ধ্যে গড়িয়ে রাতের কোলে ঢলে পড়েছে খেয়ালই করেনি কেউ।

খেয়া পারাপারের যাত্রী খুবই কম। সন্ধ্যার পর আর তেমন যাত্রী থাকে না বললেই চলে। তাই নৌকার মাঝি শ্যামদা সন্ধ্যার পর পরই নৌকা নদীঘাটের এক জায়গায় বেঁধে রেখে বাড়ি চলে যায়। আবার ভোরে এসে নৌকা নামায় নদীতে। হাটবার থাকলে সেদিন খুব ভোরে চলে আসে শ্যামদা। এদিকে মোল্লার হাট বলে একটা জায়গা আছে। সেখানে সপ্তাহে হাট বসে দু'দিন। খুব বড়ো হাট। প্রচুর জিনিসপত্র আমদানি হয় সেই হাটে। এপারে লোকজন তখন নদী পেরিয়ে ওপারের মোল্লার হাটে যায় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে। শুধু ক্রেতারা নয়, এপার থেকে অনেক বিক্রেতাও যায় মোল্লারহাটে তাদের পসরা নিয়ে।

কয়েক পুরুষ ধরে শ্যামদারা এই ফেরিঘাট চালায়। ফেরি থেকে খুব বেশি রোজগার হয় না। তবুও একাজ ছাড়তে পারে না শ্যামদা। মায়ায় পড়ে গিয়েছে। মায়া বড়ো বলাই। সম্পদের মতোই মায়াও মানুষকে দিশাহারা করে রাখে।

ছুটতে ছুটতে নদীর পাড়ে এল চারজনে। কোথায় সেই শীর্ণ নদী। যার উপর দিয়ে তারা হেঁটে পার হয়ে গিয়েছিল তখন। এখন নদীর ভরা যৌবন। কানায় কানায় পূর্ণ সে। তখন ভাটা ছিল। এখন জোয়ার।

এবার পার হবে কী করে! খুব চিন্তায় পড়ে গেল চারজনে। সারারাত অন্ধকারের মধ্যে নদীর পাড়ে বসে থাকতে হবে নাকি! আবার কি মেলাতে ফিরে যাবে তারা। সেখানে যাত্রাগানের আসর বসেছে। সারারাত ধরে চলবে অনুষ্ঠান। সেখানে গিয়ে রাত কাটিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু বাড়িতে সবাই চিন্তা করবে। ভীষণ অস্থির হয়ে উঠল চারজনেই।

'শ্যামদা, শ্যামদা' বলে চিৎকার করল বিনোদদা। যদি অন্য পারে নৌকায় বসে থাকে শ্যামদা। না কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। শুধু 'শ্যামদা', 'শ্যামদা', ডাকটা প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এল তাদের কাছে।

না আর কোনও উপায় নেই। এপারেই রাত কাটাতে হবে আজকে।

হঠাৎ বাচ্চুদা বলল, 'আরে আমরা তো সাঁতার কেটে ওপারে চলে যেতে পারতাম। শুধু সুখময় আছে বলে। ও কি আর সাঁতার কেটে ওপারে যেতে পারবে। বাচ্চা ছেলে।'

বাচ্চুদার এই কথাটা সুখময়ের আঁতে ঘা দিল সজোরে। সুখময় এখন আর বাচ্চা নয়। সে এখন একটা সম্ভ্রান্ত বাড়ির গৃহশিক্ষক। বাচ্চুদাকে বলল, 'কি আমার জন্যে তোমরা সাঁতরে ওপারে যেতে পারছ না। ধরো আমার জামাটা।' এই বলে জামাটা খুলে বিনোদের হাতে ধরিয়ে দিয়েই ঝপাং করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ভরা নদীতে। ঘটনার আকস্মিকতায় প্রথমটা কিছু বুঝতে পারেনি বাকি তিনজন। যখন তাদের বোধদয় হল তখন অনেকটাই সাঁতারে চলে এসেছে সুখময়। জলে সাঁতরাতে সাঁতরাতে ঝপঝপ শব্দের মধ্যে সুখময় শুনতে পেল নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে তিনজনের ভয়ার্ত আকুতি— 'ফিরে আয় সুখময়। ফিরে আয়। অন্ধকারের মধ্যে সাঁতরে যেতে হবে না তোকে। ফিরে আয় ভাই।'

সাঁতার কাটতে বেশ ভালোই লাগছিল সুখময়ের। নদীতে স্রোত নেই। শান্ত জল। জোয়ার ভাটার মাঝখানের সময়। নদী একেবারে স্থির অচঞ্চল। এক সময় চিৎ সাঁতার দিতে শুরু করল সুখময়। জলের মধ্যে চিৎ হয়ে শুয়ে হাত পা সচল রাখল। আকাশে মেঘ নেই একটুকরো। তারা ভরা মেঘমুক্ত আকাশ। তারাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সুতপার কথা মনে পড়ল তার।

— তুমি সাঁতার জানো?

— হ্যাঁ জানি। লাজুক লাজুক মুখে উত্তর দিল সুতপা।

— কীভাবে শিখলে সাঁতার?

— হাঁটতে হাঁটতে।

— যাহ্। হাঁটতে হাঁটতে কেউ আবার সাঁতার শেখে নাকি?

— সত্যি বলছি। সত্যি সত্যি সত্যি। এই তিন সত্যি। বিস্ময়ের সীমা থাকল না সুখময়ের। সত্যিই কি হাঁটতে হাঁটতে সাঁতার শেখা যায়!

— তুমি সত্যি বলছ না সুতপা।

আমাকে কি তুমি বিশ্বাস কর না।

— করি তো। খুব বিশ্বাস করি। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না। কীভাবে মানুষ হাঁটতে হাঁটতে সাঁতার শেখে?

— শেখে। মানুষ হাঁটতে হাঁটতেই সাঁতার শেখে। তুমিও তো হাঁটতে হাঁটতেই সাঁতার শিখেছ। শেখো নি কি? মনে করে দেখো।

গ্রীষ্মকালে পুকুরে যখন কম জল থাকত। তখন সুখময় পুকুরের চারিদিকে কোমরজলে হেঁটে হেঁটে বেড়াত। আর এইভাবেই সে একদিন সাঁতার শিখে গেল। আশ্চর্য! এই ঘটনা তার মনেই ছিল না। অথচ সুতপার ঠিক মনে আছে। বেশ বুদ্ধিমতী মেয়ে। বুদ্ধিতে তার চোখ মুখ সব উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

— কি মশাই মনে পড়ল?

— হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে। তুমি সাঁতার কাটবে আমার সঙ্গে?

— নাহ্ বাবা। আমার বড়ো ভয় করে নদীতে।

— ভয় কীসের?

— যদি কুমির থাকে!

— দূর পাগলি। এই নদীতে কুমির থাকবে কেন? একি সুন্দরবনের নদী নাকি?

— সুন্দরবনের না হোক। কুমির থাকতে দোষ কীসের?

— আহা! এ তো আমাদের ছোটো নদী।

— ছোটো নদী?

— হ্যাঁ। রবি ঠাকুরের কবিতা পড়নি! আমাদের ছোটো নদী চলে আঁকে বাঁকে, বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে।

— হি হি হি হি। ওই টা আঁকে বাঁকে না বাঁকে বাঁকে হবে।

— ওই হল আর কি। এই হল আমাদের সেই ছোটো নদী।

— ছোটোই হোক আর বড়োই হোক ঝোঁকের মাথায় এইভাবে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিৎ হয়নি তোমার। ভরা নদী তার উপর অন্ধকার। বিপদ হতে কতক্ষণ।

— এক্কেবারে পাকা গিন্নিদের মতো কথা বলছ যে।

— কেন, কথাগুলি শুনতে বুঝি ভালো লাগছে না?

— ভালো লাগছে। ভীষণ ভালো লাগছে। তোমার সঙ্গে কথা বলতে বলতেই তো সাঁতার কাটছি। অন্ধকারের মধ্যে সাঁতার কাটার মজাই আলাদা বুঝলে।

— মজা না ছাই। আর কখনো কিন্তু এরকম করবে না। মনে থাকবে?

— মনে থাকবে।

— ঠিক আছে এবার আমার হাতটা ধরো।

— হাত ধরবো?

— হ্যাঁ ধরবে। এক্ষুনি ভাটার টান শুরু হবে। তখন কিন্তু পাড়ে ওঠা কঠিন হবে।

সুখময় হাত বাড়িয়ে দিল সুতপার হাত ধরার জন্যে। নদীর পাড়ে বেড়ে ওঠা আগাছা ধরে পাড়ে উঠে এল সুখময়। ভাটা শুরু হয়েছে। ভাটার টানে খেয়াঘাট থেকে ভেসে বেশ খানিকটা দূরে চলে গিয়েছে সুখময়। পাড়ে উঠে হতভম্বের মতো বসে রইল খানিকক্ষণ। ওপারে জমাট অন্ধকার? নিকষ কালো অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে তখনও ভেসে আসছে বাচ্চুদা, কাশীদা, বিনোদদাদের আর্ত চিৎকার 'সুখময়, কোথায় গেলি ভাই? একবার সাড়া দে ভাই আমার।'

সাড়া দিল সুখময়। 'আমি চলে এসেছি। তোমরা দাঁড়াও ওখানে। দেখি শ্যামদা নৌকায় আছে কিনা।'

আলো আঁধারির মধ্যে দিয়ে কাদা মেখে সুখময় এগিয়ে গেল ফেরিঘাটের কাছে। যেখানে শ্যামদার নৌকা বাঁধা ছিল।

— শ্যামদা। শ্যামদা। ও শ্যাম দা।

— কে?

— আমি।

— আমিটা কে?

— আমি সুখময়।

— একি! তুমি? এলে কী করে? শ্যামদা একটা লণ্ঠন নিয়ে ঘুম চোখে নৌকার ছাউনি থেকে বেরিয়ে এসে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে সুখময়ের দিকে।

— সাঁতার দিয়ে এলাম শ্যামদা।

— সেকি! সাঁতার দিয়ে পার হলে তুমি! এই ঘুটঘুটে অন্ধকারে!

— আমরা অনেকক্ষণ ধরে ডাকছিলাম তোমাকে। সাড়া না পেয়ে বাধ্য হয়েই।

— আমি তোমাদের জন্যেই অপেক্ষা করে করে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তোমরা চারজনে হেঁটে হেঁটে পার হয়েছ দেখেছি। তাই নৌকা বেঁধে বাড়ি চলে যায় নি।

— নৌকাটা তো ওপারে বাঁধতে পারতে।

— ওপারে নদী গভীর। টানও বেশি। নৌকা রাখা যায় না। তাই এপারে এনে বেঁধেছি। তাছাড়া তোমরা ফিরবে কিনা বুঝতে পারছিলাম না।

— যাইহোক, এখন তুমি নৌকা নিয়ে যাও। ওদের নিয়ে এসো।

— আমার ডবল ভাড়া লাগবে কিন্তু। বুড়ো ধেড়েরা ওপারে বসে আছে। আর বাচ্চাটাকে পাঠিয়েছে সাঁতরে নদী পার হতে। দেখাচ্ছি মজা।

শ্যামদা গজগজ করতে করতে নৌকা নিয়ে রওনা হয়। পাড়ে ভিজে প্যান্ট আর খালি গায়ে বসে থাকে সুখময়।

সুখময়ের খুব আনন্দ হচ্ছে। যুদ্ধজয়ের আনন্দ। বিনোদদা, সুতপাদের পাশের বাড়ির ছেলে। আজকের এই ঘটনা সে নিশ্চয় সুতপাদের বাড়িতে একদিন না একদিন গল্প করে বলবে। আর এই ঘটনার বিবরণ শুনে তার মতো দুঃসাহসিক ছেলেকে ভালো না বেসে থাকতে পারবে না সুতপা।

(৬)

ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, 'আপনাকে একটা অপ্রিয় সত্যি কথা বলব। মন খারাপ করবেন না। সত্যিটা মেনে নিতেই হবে।'

— বলুন স্যার।

— আপনার বাবা আর বেশিদিন বাঁচবেন না। আমরা আমাদের সেরাটা দিয়েই আপনার বাবাকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করব। তবে প্রোগনোসিস খুব ভালো নয়।

— কি হয়েছে বাবার?

— লাঙসে একটা লিসন পাওয়া গেছে। একবার ব্রঙ্কোস্কপি করে বায়োপসি করতে হবে। বায়োপসি রিপোর্ট হাতে এলে তবেই ট্রিটমেন্ট শুরু করা যাবে। খরচ সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু খুব কুইক করতে হবে। হাতে একদম সময় নেই।

— এখন তো বাবা কিছু খেতেই পারছে না।

— এই রোগের এটাই তো লক্ষণ। ধীরে ধীরে খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে।

— খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে!

— প্রয়োজনে আমাদের রাইল'স টিউব লাগাতে হবে।

— রাইল'স টিউব?

— হ্যাঁ, নল দিয়ে খাওয়াতে হবে। এছাড়া তো আর উপায় দেখছি না।

আর বেশি কথা বাড়াল না সুখময়। যে মানুষটা নিজে এত খেতে ভালোবাসে। লোকজনকে খাওয়াতে ভালোবাসে। সেই মানুষটার নিজেরই খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে! ঈশ্বরের এ কেমন বিচার! তাছাড়া ডাক্তারবাবু যে বললেন বাবা আর বেশিদিন বাঁচবেন না— এটাই বা কেমনতর কথা। ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠল সুখময়। তার বুকটা বোধহয় ফাঁকা হয়ে গেছে। কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছে তার। হালকা হালকা লাগছে। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। একটু বমি করতে পারলে বোধহয় ভালো লাগত। ডাক্তারবাবুর চেম্বার থেকে বেরিয়ে ফুটপাতে হুড়হুড় করে বমি করে দিল সুখময়।

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের পালমোনারি ডিপার্টমেন্টে ডাক্তার অঙ্কন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্ডারে ভর্তি জলধর। বজবজ জুট মিলের অস্থায়ী শ্রমিক। সব সময় কাজ থাকে না। যখন কাজ থাকে ঠিকাদার ডেকে নেয়। কাজের খোঁজেই কয়েকদিন আগে বজবজে এসেছিল জলধর। বাড়ি ফেরা হয়নি। লোক মারফৎ খবর পাঠিয়েছিল শ্রমিক অসন্তোষের ফলে মিলে কাজ বন্ধ আছে। সব ঠিকঠাক করে বাড়িতে ফিরতে কয়েকদিন দেরি হবে।

আসলে ঘটনাটা ছিল অন্য। বজবজে এসে হঠাৎ করেই অসুস্থ হয়ে পড়ে জলধর। দমকা কাশির সঙ্গে শুরু হয় শ্বাসকষ্ট। কাশির সঙ্গে অল্প অল্প রক্ত আসতেও শুরু করে। ঠিকাদার খুবই ভালো মানুষ। তিনিই জলধরকে নিয়ে লোকাল মেডিসিনের ডাক্তারের কাছে যান। ডাক্তারবাবু প্রথমে রোগটিকে টিবি সন্দেহ করেন। রক্তের অনেকগুলো পরীক্ষা করতে দেন। রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট এলে দেখা যায় না, এটা টিবি নয়। অন্য কিছু। অন্য কিছু কি তা জানার জন্যে সি.ই.সি.টি. করা হয়। আর তাতেই ধরা পড়ে জলধরের লাঙসে জল জমেছে এবং সেখানে একটা মাস ডেভেলপ করেছে। এটাকেই তিনি বড়ো অসুখের আঁতুড়ঘর সন্দেহ করছেন। তাই তিনি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে জলধরকে পাঠিয়েছেন ডাক্তার অঙ্কন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রফেসর। তিনি একটি চিঠিও লিখে দিয়েছিলেন ঠিকাদার চুনী দাসের হাতে। চুনীবাবুই জলধরকে ভর্তি করে দেন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে।

খবর পেয়ে সুখময় এসেছে কলকাতায়। কলকাতায় তার থাকার জায়গা নেই। বাবার বেডের পাশেই বসে বসে সুখময়ের দিন কাটে, রাত কাটে। মাঝে মাঝে চুনী বাবু আসেন বাবাকে দেখতে। চুনীবাবু মানুষটা খুব ভালো। ভীষণ হেল্পফুল। তিনি যেভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তার তুলনা হয় না। তিনি না থাকলে বাবার চিকিৎসা করানো সম্ভব হত না।

জলধরের ব্রঙ্কোস্কপি করলেন ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায়। বায়োপসির জন্যে পাঠালেন ল্যাবরেটরিতে। বায়োপসির রিপোর্ট আসতে লেগে গেল আরো এক সপ্তাহ। রিপোর্ট এলে দেখা গেল ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায়

যা সন্দেহ করেছিলেন তাইই। জলধরের লাঙস ক্যান্সার ধরা পড়ল। শুধু ধরা পড়ল তাই নয়, সেটা গোটা শরীরে যত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে, তত দ্রুত কমে আসছে তার আয়ু।

মা বাড়িতে একা আছে। মা এত কিছু জানে না। মা জানে বাবা অসুস্থ। হাসপাতালে ভর্তি আছে। ছেলে আছে বাবার কাছে। ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে গেলে তার স্বামীকে নিয়ে বাড়ি ফিরবে সুখময়।

দ্রুত কেমোথেরাপি চালাতে হবে। সমস্ত ব্যবস্থা করে দিলেন চুনীবাবু। কেমোথেরাপির আগে আবার একবার রক্ত পরীক্ষা করা হল। রিপোর্ট এলে দেখা গেল রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা একেবারে নেমে গেছে। রক্ত দিতে হবে। আর এক নতুন সমস্যা তৈরি হল। সুখময় চোখের সামনে অন্ধকার দেখতে লাগল। কোথায় পাবে সে রক্ত? প্রয়োজন হলে নিজের শরীরের রক্ত দেবে সে বাবাকে বাঁচাতে।

— আপনি কি খুব বিড়ি সিগারেট খেতেন বাবা?

জলধরকে জিজ্ঞাসা করলেন ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায়।

— না স্যার।

— একদমই না?

— না, একদমই না।

অবাক হলেন ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকৃতির কী অদ্ভুত খেলা। কত লোক কত রকমের নেশা করে। নেশায় বলতে গেলে বুঁদ হয়ে থাকে। তাদের অনেকের ফুসফুসের অনেক ক্ষতি হয়। আবার কারো কারো কিছুই হয় না। দিব্যি সুস্থ থাকে তারা। আবার অনেকেই নেশা দ্রব্যের ধারেবাড়ে যায় না তবুও দেখা যায় তাদের দুরারোগ্য ব্যাধিতে ধরেছে। ধূমপান বা মদ্যপান যার অন্যতম প্রধান কারণ।

— এখন কী অসুবিধা হচ্ছে আপনার?

— অসুবিধা কিছু নেই। শুধু খেতে পারছি না কিছুই। এটাই হল মেন অসুবিধা। খাওয়ার জন্যেই তো বাঁচা ডাক্তারবাবু।

— তা তো ঠিকই। ডাক্তারবাবুর সংক্ষিপ্ত উত্তর।

সুখময়কে ডেকে ডাক্তারবাবু বললেন, 'মনকে শক্ত করো। রোগীর আয়ু কিন্তু আর বেশিদিন নেই। আর একটা কথা, উনি যা খেতে চান ওনাকে তাই খেতে দাও।'

অনেকদিন হয়ে গেল হাসপাতালে আছে সুখময়। তাই ডাক্তারবাবুর সঙ্গে তার একটা সখ্যতা তৈরি হয়েছে। ডাক্তারবাবু আগে তাকে আপনি সম্বোধন করতেন এখন তুমি বলেন। সুখময়ের ভালোই লাগে এই নৈকট্য। বন্ধুর মতো মনে হয় ডাক্তারবাবুকে। তার বাবার আয়ু আর বেশিদিন নেই তাই কি ডাক্তারবাবু তার প্রতি এতটা সহানুভূতিশীল? নাকি ডাক্তারবাবু এরকমই। জীবন্ত অগ্নিশ্বর।

— 'রক্তের ব্যবস্থা হল?' সুখময়ের পিঠে হাত বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ডাক্তারবাবু।

— 'চুনীবাবু সব ব্যবস্থা করছেন স্যার।' সুখময়ের চোখ ছলছল করে উঠল।

— 'মনকে শক্ত করো। চেষ্টা তো আমরা চালিয়ে যাচ্ছি।' অন্য ওয়ার্ডে চলে গেলেন ডাক্তারবাবু।

যত দিন যাচ্ছে বাবা যেন বিছানার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। বাবার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মন খারাপ হয়ে যায় সুখময়ের। এক সময়ের রাশভারি মানুষটার আজ এই অবস্থা নিজের চোখে না দেখলে কল্পনা করা কষ্টসাধ্য। মাঝে মধ্যে তার ভীষণ কষ্ট হয়। বুকের ভিতরটা তোলপাড় করে ওঠে। ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে। বাবার চোখের সামনে সে কাঁদতে পারে না। বাথরুমে গিয়ে অঝোরে কাঁদে। মাঝে মধ্যে সুতপার কথা মনে পড়ে। সুতপার জন্যেও তার হৃদয় হাহাকার করে ওঠে।

তার হাতে মুঠো ফোন নেই। গ্রামীণ জীবন তার, বদ্ধ সরোবরের মতো স্থির অচঞ্চল। মুঠো ফোনের প্রয়োজনীয়তার কথা মনেও পড়েনি কখনও। তার বন্ধুদের মধ্যে অনেকেরই মোবাইল আছে। তারা বড়লোক। তাদের বাবারা কিনে দিয়েছে। সুখময়ের মোবাইলের দরকার পড়েনি কখনও। এখন সে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। তারও একটা মোবাইল ফোনের খুব প্রয়োজন ছিল। বিশেষ করে এই পরিস্থিতিতে। একটা মোবাইল থাকলে মা'কে সে ফোন করতে পারত।

— হ্যালো মা।

— কে খোকা?

— হ্যাঁ মা।

— কেমন আছিস বাবা? তোর বাবা কেমন আছে?

— বাবা ভালো আছে মা। তুমি খেয়েছ মা?

— হ্যাঁ বাবা আমি খেয়েছি। তোরা কবে বাড়ি ফিরবি বাবা? বড় একা লাগেরে বাপধন আমার।

— এই তো ফিরব। বাবা একটু সুস্থ হয়ে গেলেই বাড়ি ফিরে আসব মা। তুমি একটু বাবার সঙ্গে কথা বলবে মা?

ফোনটা বাবার হাতে ধরিয়ে দেয় সুখময়। মা'র সঙ্গে বাবা কথা বলতে থাকে। হাসপাতালের বাথরুমে ঢুকে অঝোরে কাঁদতে থাকে সুখময়।

সুতপার সঙ্গেও মাঝে মধ্যে কথা বলে সুখময়। তখন তার আনন্দের সীমা পরিসীমা থাকে না।

— হ্যালো।

— হ্যাঁ বলো।

— কী করছ এখন?

— পড়ছি।

— কী পড়ছ?

— ইতিহাস।

— অঙ্ক করছ না?

— অঙ্ক করতে আমার ভালো লাগে না।

— কেন?

— বড্ড কঠিন। ওর থেকে ইতিহাস অনেক ভালো। তুমি কী করছ?

— এই তো হাসপাতালে। বাবার বেডের পাশে বসে আছি।

— জ্যেঠু কেমন আছেন?

— ভালো। বাবা এখন ঘুমুচ্ছে।

— কী হয়েছে জ্যেঠুর।

— কিছু না।

— কিচ্ছু না তো হাসপাতালে ভর্তি আছেন কেন?

— ওই আর কী। একটা অসুখ হয়েছে। তার ট্রিটমেন্ট চলছে।

— কবে বাড়ি আসবে।

— ট্রিটমেন্ট শেষ হলেই বাড়ি ফিরে যাব। তোমাকে পড়াতে যাব।

— শুধু আমাকে কেন পড়াবে। ভাইদের পড়াবে না?

— পড়াব তো, সবাইকেই পড়াব। আগে যেমন পড়াতাম।

— আচ্ছা কলকাতা কেমন বলতো? মস্ত বড়ো শহর তাই না?

— মস্ত বড়ো শহর তো বটেই। কিন্তু আমি তো হাসপাতালের বাইরে বের হই না।

— সে কি! তাহলে তুমি কোথায় খাও, কোথায় ঘুমাও?

— হাসপাতালেই। বাবার বেডের পাশে শুয়ে ঘুমাই। ক্যান্টিনে খেতে যাই।

— ক্যান্টিনের খাবার বেশ ভালো তাই না?

— বুঝতে পারি না।

— এ আবার কেমন কথা। খাচ্ছ তুমি আর বলছ বুঝতে পারি না।

— সত্যিই বুঝতে পারি না। সত্যি সত্যি সত্যি। এই তিন সত্যি।

সুতপা হাসছে। খিল খিল করে হাসছে। তার হাসির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সুখময়ের বুকের ভিতরটা হু হু করে উঠছে।

রক্ত পাওয়া গেছে। বি-পজিটিভ গ্রুপের রক্ত। বাবার শরীরে রক্ত চালানো হয়েছে। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঢুকছে বাবার শরীরে। সেও যেন এক দেখার মতো দৃশ্য। সুখময় দেখছে। চোখ বড়ো বড়ো করে দেখছে। বাবা চোখ বন্ধ করে ঘুমুচ্ছে। একটু আগে বাবা চোখ চেয়েছিল। দেখছিল তার শরীরে কীভাবে বাইরের রক্ত ঢুকছে। ফোঁটায় ফোঁটায়। আস্তে আস্তে জীবন ফিরে পাচ্ছে বাবা। এবার বাবা খেতে পারবে। আর শ্বাসকষ্ট থাকবে না। বাবা আবার আগের মতো ভালো হয়ে যাবে। আহা কী শান্তি। সেই শান্তিতেই বাবা চোখ বন্ধ করে ঘুমুচ্ছে। একটু আগেও বাবা নড়ানড়ি করছিল বলে সিস্টার ধমক দিয়ে গেছে। এখন বাবা আর নড়ছে না। শান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছে।

একি! রক্ত আর যাচ্ছে না কেন? হঠাৎ খেয়াল করল সুখময়। রক্ত যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। বাবার গায়ে হাত দিয়ে ধাক্কা দিয়ে ডাকল সুখময়। বাবা-বাবা। ও বাবা। বাবা আর সাড়া দিল না। সিস্টারদের কাছে ছুটে গেল সে। সিস্টাররা এসে বললেন, উনি সেন্সলেস হয়ে গেছেন। ডাক পড়ল বড়ো ডাক্তারবাবুর। 'ম্যাসিভ কার্ডিয়াক অ্যাটাক' মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায়।

মৃত্যু যে এত সুন্দর তা জানতই না সুখময়। তার কাছে মৃত্যু মানে বিভীষিকা। বিখ্যাত এক লেখক বলেছিলেন, মৃত্যুটা খুব আনন্দের। তবে তার থেকেও একটা আনন্দের বিষয় আছে, তা হল মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করা। বাবার মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা হল না। হঠাৎ পাড়ি দিলেন না ফেরার দেশে। নাকি এতদিন বাবা মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। আর অপেক্ষা করতে করতে ভীষণ আনন্দ পাচ্ছিলেন। বাবার কথা ভেবে দু'চোখ ফেটে জল এল সুখময়ের।

(৭)

— মন খারাপ করছে?

— ভীষণ।

— কাঁদতে ইচ্ছে করছে?

— মনে হয় হাত পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসি।

— কেঁদে আর কী করবে। পুরুষ মানুষের কান্না দেখতে ভালো লাগে না।

ভরা পূর্ণিমা। জোছনার আলোয় চারিদিক ভেসে যাচ্ছে। সেজ বউ-এর বারান্দায় বসে আছে সুখময়। সেজ বউ বসে আছে তক্তপোশে। বারান্দার এক কোণায় সেলাই মেশিন চালাচ্ছে অরুণা। ঘটাং ঘটাং শব্দ ভেসে আসছে মেশিনের। সব কিছুরই একটা ছন্দ আছে। প্রকৃতি এইভাবেই সব কিছু তৈরি করেছে। জগতে ছন্দবিহীন কিছুই হতে পারে না। সেজ জ্যেঠু এখনো বাড়ি ফেরেনি। রাত নেহাৎ কম হল না। নেশা করে কোথাও হয়তো পড়ে আছে জ্যেঠু। হয়তো আজ রাতে আর বাড়ি ফিরবে না।

একটা মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে নাকে। সুখময় এখন ভালো করেই বোঝে গন্ধটা কোথা থেকে আসছে। গন্ধটাতে নেশা ধরে যায় তার। বারান্দা থেকে উঠতে ইচ্ছে করে না। এই গন্ধটার সঙ্গে মাঝে মধ্যে মিশে যাচ্ছে ধূপের গন্ধ। যে ধূপটা বাবার মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সময় জ্বেলে দিয়েছিল ছোটো মামা।

— কী ঠিক করলে সুখময়?

— কাজ তো করতেই হবে। না হলে খাব কী?

— কী কাজ করবে তুমি?

— দেখি কী কাজ কপালে জোটে।

— পড়াশোনা করবে না আর?

— বেশি পড়াশোনা করে আর কী করব বলো। এই তো চাকরি বাকরির অবস্থা।

— তা ঠিক। তুমি তাহলে থাকবে না এখানে?

— নিমাইবাবুর লেদের কারখানায় যদি কাজে ঢুকি। তাহলে দাশনগরেই থাকব। নিমাইবাবুকে বাবা বলে রেখেছিলেন আগে থেকে। চুনীবাবুও যোগাযোগ রাখতে বলেছেন। তিনি থাকেন কলকাতার সন্তোষপুরে।

— লেদের কারখানায় খুব পরিশ্রম সুখময়। আমার মনে হয় তুমি পারবে না। এর চেয়ে বরং তুমি সন্তোষপুরেই চলে যাও। কলকাতায় গেলে অনেকরকম সুযোগ সুবিধা পাবে তুমি।

সুখময় কোন উত্তর দিল না। কলকাতার নাম শুনে চুপ করে গেল। কলকাতায় গিয়ে সে বাবাকে হারিয়ে ফেলল। এবার কলকাতায় গেলে সুতপাকে হারাবে নিশ্চিত। সুতপার কথা মনে পড়াতে তার বুকের মধ্যে একটা তরল অনুভূতি হল। সুতপার কথা ভাবলেই তার আজকাল এরকম হয়। কি রকম সে নিজে বুঝতে পারে না। কাউকে বললে ভালো হত বিষয়টা। কিন্তু কাকেই বা বলবে? তার সেরকম কোন বন্ধু নেই। সেজ বউকে বলা যায়। সেজ বউকেই তার একমাত্র বন্ধু বলে মনে হয়।

— অনেক রাত হল সুখময়। বাড়ি যাবে না?

— হ্যাঁ যাব। কিন্তু জ্যেঠু তো এখনও ফিরল না।

— আজ মনে হয় তোমার জ্যেঠু আর ফিরবে না। কোথায় কার বাড়ি গিয়ে নেশা করে পড়ে আছে। তুমি বাড়ি যাও সুখময়। মা একা আছে।

বারান্দা ছেড়ে উঠে পড়ে সুখময়। চারিদিকে ফকফকে জোছনা।

মনে হচ্ছে জোছনার বান ডেকেছে। উথালপাথাল জোছনা। বাড়ির পথ ধরল সুখময়। হাঁটতে হাঁটতে ভাবতে লাগল নারী পুরুষের সম্পর্কের রহস্যটা কী? এ রহস্যের মূলে কি শরীর না মন? যদি শরীর হয় তবে জ্যেঠু কেন জ্যেঠিমাকে এভাবে ছেড়ে ছেড়ে থাকে? আর মন! শরীরের মতো কি তাকে স্পর্শ করা যায়!

সেজ বউ-এর জন্যে তার খুব মন খারাপ হয়। সেজ বউকে তার ভীষণ একা মনে হয়। এক আকাশ সৌন্দর্য নিয়েও মানুষ যে একা হতে পারে সেটা ভাবতেই সুখময়ের বেশ অবাক লাগে। সত্যিই প্রকৃতির কী লীলা।

বাড়ি ফিরে দেখল মা তার জন্যে রান্নাঘরে চুপচাপ বসে আছে। দূর থেকে মা'কে মনে হল বিষাদ প্রতিমা।

— ফিরলি বাবা?

— হ্যাঁ মা।

— তুই কি হালদারবাবুদের বাড়ি পড়াতে গেছিলি?

— না মা।

— তাহলে কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

— সেজ জ্যেঠিমার বাড়ি।

— সেজদির বাড়ি কি করছিলি?

— বসে ছিলুম মা। আমার কিছু ভালো লাগছে না এখন।

— আয় খেয়ে নে। অনেক রাত হল। কাল ভোরেই তো আবার বেরোবি?

— হ্যাঁ মা।

— তোর বাবার কথায় সত্যিই সেদিন আমি খুব রাগ করেছিলুম। তোর বাবার কথাটাই সত্যি হল। নিমাইবাবুর কাছে কাজে যেতে হচ্ছে তোকে।

— ওসব ছাড়ো না মা। আমাদের নিয়তি যেখানে নিয়ে যাবে, সেখানেই যেতে হবে। কারো কিচ্ছু করার নেই। দেখি না গিয়ে কাজটা কীরকম।

— যা ভালো বুঝিস কর। আমি আর কী বলব বল।

শোকের বোঝা ভীষণ ভারী হয়। সেই বোঝা মানুষ বেশিদিন বইতে পারে না। মা'কে দেখে সুখময়ের সেরকম মনে হল। সে রাতে স্বপ্ন দেখল সুখময়। নদী তার কথা শুনেছে। নদীর ধারে বসে আছে সে আর সুতপা। ফুলছাপ একটা ফ্রক পরেছে সে।

— কী সাহস তোমার! একটুও ভয় লাগল না তোমার?

— ভয় লাগবে কেন? তুমি তো সঙ্গে ছিলে।

— যাহ্ যত সব বাজে কথা। বিনোদ কাকু যখন আমাদের বাড়ি এসে সেদিনের নদী পার হওয়ার ঘটনাটা বলছে আমরা তো সবাই রুদ্ধশ্বাসে তা শুনছি। বাপ্‌রে কী সাহস। বাবা শুনেই তো বলল বুকের পাটা আছে ছেলেটার।

সুখময়ের সুখ আর ধরে না। নদী তার মনের কথা শুনেছে। এমনিতে ভীষণ ভীতু সে। ভীরু আর লাজুক। সুতপাকে তার মনের কথা কখনই সে নিজের মুখে বলতে পারত না। নদী তার মনের কথা সুতপাকে জানিয়ে দিয়েছে। নদীর হাওয়া লেগে সুতপার চুল উড়ছে ফুরফুর করে। সেই চুল উড়ে এসে লাগছে সুখময়ের নাকে মুখে। কী সুন্দর একটা গন্ধ ভেসে আসছে।

— তুমি কি চুলে শ্যাম্পু করেছ?

— হ্যাঁ, কেন?

— মিষ্টি একটা গন্ধ পাচ্ছি নাকে।

— না। আমি মাথায় সাবান মেখে স্নান করি।

— এ বাবহ্। চুলে কেউ সাবান মাখে?

চুল উঠে যাবে যে। টেকো বুড়ো হয়ে যাবে। তখন তোমাকে কেউ আর বিয়ে করতে চাইবে না। হি হি হি হি।

সুখময় মাথায় হাত দিল। তার মাথায় একটিও চুল নেই। টাক পড়ে গেছে। তাকে এখন দেখাচ্ছে বুড়োদের মতো। চোয়ালও ভেঙে গেছে তার। সে একা বসে আছে। তার আশেপাশে কেউ নেই। তার কান্না পেল ভীষণ। সেজ বউয়ের কথা মনে পড়ে গেল তার। পুরুষ মানুষদের কান্না মানায় না। প্রাণপণে সে কান্নাটাকে আটকানোর চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই সে চোখের জল আটকে রাখতে পারছে না। চোখ জ্বালা করে উঠল। আর তখনই মায়ের ডাকে ঘুম ভাঙল তার। তাকে তৈরি হতে হবে। বেরোতে হবে কাজের খোঁজে। স্বপ্নের জগৎ থেকে বাস্তবের মাটিতে পা রাখল সুখময়। যে মাটি সত্যিই ভীষণ কঠিন।

(৮)

হঠাৎ ঝাঁকুনিতে গোটা গাড়ি কেঁপে উঠতে ঘুম ভেঙে গেল সুখময়ের। গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে সারি সারি দোকান, বড়ো বাড়ি, ফুটপাতে লোকজনের ব্যস্ততা দেখল। তারপর পাশের সিটে বসে থাকা ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞাসা করল-

— 'সন্তোষপুর এভিনিউটা আর কত দূর স্যার?'

— বেশি দূর নয়। এই তো কাছেই। কোথায় যাবে তুমি? ভদ্রলোকের কথাবার্তায় বেশ আন্তরিকতার ছোঁয়া আছে।

— ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক বাসস্টপ, সন্তোষপুর এভিনিউ।

'সুলেখা-সুলেখা' বলে কয়েকবার চিৎকার করল কন্ডাক্টর। বাসটি রাস্তার এক ধারে দাঁড়াল। কিছু লোক নামল। হুড়মুড়িয়ে কিছু ছেলেমেয়ে উঠল। ছাত্র-ছাত্রী। পরনে কালো প্যান্ট ও স্কাই ব্লু রঙের শার্ট। এটা অবশ্যই ছাত্রদের পোশাক। ছাত্রীদের পরনে আছে সাদা চুড়িদার। প্রত্যেকেরই বয়স তেরো কী চোদ্দোর আশেপাশে। প্রত্যেকের জামার বুক পকেটে একটি স্কুল ব্যাচ। কিন্তু এতই খুদে লেখা যে কিছুই বোঝা যায় না। তাদের কলধ্বনিতে যেন মুখরিত হয়ে উঠল গোটা বাসটা।

হঠাৎ জানালা দিয়ে তাকিয়ে সুখময় দেখল কবি সুকান্ত'র একটি আবক্ষ মূর্তি। চারিদিকে বড়ো বড়ো উলুঘাসে ঢাকা একটি ছোটো পার্ক। পার্ক ঠিক নয়। আইল্যান্ড আর কী, যেমন হয়। মনে পড়ে গেল সুকান্ত'র কবিতার কয়েকটি লাইন। যিনি এ পৃথিবীর জঞ্জাল সরিয়ে সবার বাসযোগ্য করার অঙ্গীকার করেছিলেন, তিনিই আজ উলুবনে দিনযাপন করছেন। হায়রে নিয়তি। ততক্ষণে বাস চলতে শুরু করেছে। কালো মসৃণ রাস্তার বুক চিরে গাড়ি তরতর করে উপরে উঠে যাচ্ছে। আকাশে নয়, সেতুতে। এতক্ষণ পরে ভদ্রলোক আবার মুখ খুলেছেন। তিনি বললেন, 'এটা সুকান্ত সেতু। নীচে যাদবপুর রেলওয়ে স্টেশন। সেতু থেকে বাস নামলেই বটতলা বাজার। তারপরেই ইউনাইটেড

ব্যাঙ্ক বাসস্টপ। এই যে এত ছেলেমেয়ে দেখছ, এরা সবাই ওখানেই নামবে। ওখানে একটা স্কুল আছে। মডার্ন ল্যান্ড হাইস্কুল। এরা সবাই ওই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী। এবার আস্তে আস্তে এগিয়ে যাও।' ভদ্রলোকটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাসের গেটের দিকে এগিয়ে গেল সুখময়। কান্ডাক্টরকে বলল, 'দাদা, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক বাসস্টপে একটু নামিয়ে দেবেন দয়া করে।'

খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি আর উস্‌কো খুস্‌কো চুলওয়ালা কন্ডাক্টরটি সুখময়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'নামুন। এটাই বাসস্টপেজ। এর উল্টোদিকেই ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক। যেমনভাবে উঠেছিল ঠিক তেমনভাবেই হুড়মুড়িয়ে বাস থেকে নেমে পড়ল ছেলেমেয়েগুলো। তাদের পেছনে পেছনে নামল সুখময়। বাস থেকে নেমে খেয়াল করল বাসের জানালা দিয়ে একটি কিশোরী ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। দু'জনের চোখে চোখ পড়তেই দু'জনেই লজ্জা পেয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। বাসটি ধুলো উড়িয়ে চলে গেল।

খুব খিদে পেয়েছে। সেই কোন সকালে দাশনগর থেকে বেরিয়ে এসেছে সে। গত কালকের রাতের কথা ভুলতে পারছেনা সে কিছুতেই।

দাশনগরে নিমাইবাবুর কাছেই সে প্রথম গিয়েছিল কাজের সন্ধানে। দাশনগর স্টেশনে নেমে বেশ কিছুটা হেঁটে গেলে নিমাইবাবুর লেদের কারখানা। সুখময় যখন কারখানায় পৌঁছেছিল তখন নিমাইবাবু জরুরি কোনও কাজে কারখানার বাইরে চলে গিয়েছিলেন। তাই তাকে অপেক্ষা করতে হল অনেকক্ষণ। নিমাইবাবুর সঙ্গে বাবার আলাপ কীভাবে বা সখ্যতা কতখানি তা সুখময় জানে না। কারখানায় ফিরে এসে সুখময়কে দেখে নিমাইবাবু বেশ অবাক হয়েছিলেন।

— তুমি জলধরের ছেলে?

— হ্যাঁ।

— নাম কী তোমার?

— সুখময়।

বাহ্। বেশ ভালো নাম তো তোমার। কিন্তু বাবা মুশকিল হল আমি জলধরকে বলেছিলুম বটে একটি ছেলের কথা। সে অনেকদিন আগে। এখন আমার সেরকম আর রিকোয়ারমেন্ট নেই। বুঝতেই তো পারছ কাজের বাজারও এখন খুব ভালো নয়। কী হয়েছিল জলধরের?

— লাঙ ক্যান্সার।

— ওরে বাবা এ যে একেবারে রাজার অসুখ। এ রোগে কেউ বাঁচে না। যাক্‌গে সেসব। নিয়তি বুঝলে সবই নিয়তি। তুমি কি এখন গ্রামে ফিরে যাবে নাকি?

— এত দেরি হয়ে গেছে, আজ বোধহয় আর ফিরতে পারব না।

— তুমি এক কাজ করো। আজকের রাতটা আমার এখানে থেকে যাও। এখানে মানে একটু দূরেই আমার কারখানার এক কর্মচারী থাকে। তার বাসায় থেকে যাও আজকের রাতটা। কাল সকালে উঠে না হয় বাড়ি চলে যেও। তবে যোগাযোগ রেখো। তোমার জন্যে একটা কাজের ব্যবস্থা আমি ঠিক করে দেব। সত্যেন, এই সত্যেন।

সুখময় আর কিছু কথা বলেনি। নিমাইবাবুর ডাকে চার্লি-চ্যাপলিনের মতো দেখতে এক ভদ্রলোক এসে হাজির। এরই নাম সম্ভবত সত্যেন। এতক্ষণ সুখময় এখানে বসেছিল কিন্তু এই ভদ্রলোকটিকে আগে দেখেনি। সম্ভবত তিনি নিমাইবাবুর সঙ্গে এখানে এসেছেন। সুখময় তো খেয়াল করেনি।

দাশনগর স্টেশনের উপর দিয়ে যে ওভারব্রিজ গিয়েছে সেটি পেরিয়ে নীচে এলে যে রাস্তা চলে গেছে পূর্বদিকে সেই রাস্তা ধরে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেলেই একটা বড়ো ফুটবল খেলার মাঠ। সেই মাঠটা ডানদিকে রেখে আরও খানিকটা এগিয়ে গেলে সার দেওয়া বেড়ার ঘর। দেখেই বোঝা যায় বাইরের লোকজনকে ভাড়া দেওয়ার জন্যেই এই ঘরগুলো বানানো। তার একটি ঘরে থাকেন এই সত্যেনবাবু।

তিনি চেন স্মোকার। সব সময় মুখে সিগ্রেট। ডান হাতে ঘড়ি। কোমরে বেল্ট ছাড়াই জামা ইন করে পরা। তার সঙ্গে একটা রাত কাটাতে হবে সুখময়কে। ভদ্রলোক এমনিতে খুবই ভালো। যখনই নিমাইবাবু তাকে বললেন, 'সত্যেন, ছেলেটা আজ তোর ঘরে থাক। কাল সকালে উঠে চলে যাবে। নাকি? কী বলিস তুই?'

— আমি আর কী বলব। আপনি যা বলবেন তাই হবে।

— ফুলিকে দু'টো রাধা বাড়া করে দিতে বলিস।

— সে আর বলতে দাদা। আজকে উনি আমার অতিথি। আর অতিথি মানে তো নারায়ণ।

— টনটনে জ্ঞান তো আছে দেখি। যা, একে নিয়ে যা তাহলে।

— আচ্ছা ঠিক আছে। চলো ভায়া গরিবের বাড়িতে একটু পায়ের ধুলো দেবে চলো।

অনেকটা রাস্তা এক নাগাড়ে হেঁটে সত্যেনবাবু হাঁপাচ্ছিলেন। বললেন, 'আমার অ্যাজমা আছে বুঝলে ভায়া। একটুতেই হাঁপিয়ে উঠি। আজ রাতে গরিবের বাড়িতে খেয়ে নিও। আচ্ছা, তোমার কাছে পঞ্চাশটা টাকা হবে। কাল তোমাকে দিয়ে দেব। বুঝতেই তো পারছো একটু বাজার করতে হবে।'

সুখময় ভাবল ভালো ফ্যাসাদে পড়া গেল। কিন্তু এখন তার কিছু করার নেই। পকেট থেকে পঞ্চাশ টাকার একটা নোট বের করে সত্যেনবাবুর হাতে দিল সুখময়। সত্যেনবাবু তার ঘর খুলে দিয়ে বললেন, 'তুমি ভায়া ঘরের ভেতরে বসো। আমি একটু বাজার নিয়ে আসি। আমার বউ ফুলি মানে তোমার বৌদি একটু কাজে বেরিয়েছে। এসে পড়বে। আমি বাজারে যাব আর আসব। কাছেই বাজার।' বলেই বেরিয়ে গেলেন সত্যেনবাবু। অচেনা জায়গা সুখময়ের অস্বস্তি হতে লাগল। ঘরের চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল সে। বেড়ার ঘর। উপরে টিনের ছাউনি। ঘরের আসবাব বলতে একটা খাট। যেখানে সে এখন বসে আছে। একটা আয়না সমেত স্টিলের আলমারি আর একটা আলনা।

কিছুক্ষণ পরে এক ভদ্রমহিলা এলেন। ইনিই বোধহয় ফুলি। সত্যেনবাবুর স্ত্রী। মহিলা বেশ সুন্দরী। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের আঁটোসাঁটো শরীর। গরমে উথলে ওঠা বাটির দুধের মতো যৌবন। মহিলাকে দেখে সেজবউয়ের কথা মনে পড়ে গেল তার।

— তুমি সুখময়?

ভদ্রমহিলার কথায় চমকে উঠল সে। মহিলা তার নাম জানে! আমতা আমতা করে সুখময় বলল, 'হ্যাঁ। আপনি আমার নাম জানলেন কীভাবে?

— সতু মানে সত্যেন বলল। রাস্তায় ওর সঙ্গে আমার দেখা

হয়েছিল।

— ও আচ্ছা।

— তুমি অমন জড়সড় হয়ে বসে আছো কেন? আরাম করে বসো। আমি একটু জামাকাপড় ছেড়ে আসি। চা খাবে? তাহলে চা বানাব।

— না না চা খাব না। মহিলার জামা কাপড় ছেড়ে আসি কথাটা ভালো লাগল না সুখময়ের। বাইরে থেকে এসে জামা কাপড় চেঞ্জ করবে এটাই নিয়ম। সেটা বাইরের একজন অপরিচিত তাও আবার ব্যাটাছেলে তার কাছে বলাটা শোভনীয় নয়।

সুখময় যেমন ভাবছিল ফুলি সেরকম নয়। সে খুবই মিশুকে। পরকে অতি সহজেই আপন করে নেওয়ার সহজাত ক্ষমতা তার ছিল। কিছু সময়ের মধ্যেই সুখময়ের সঙ্গে তার হৃদ্যতা হয়ে গেল। সুখময়কে সে এমনভাবে আপন করে নিয়েছিল সুখময়ের মনে হচ্ছিল সে যেন তার কত দিনের চেনা।

অনেক রাত করে ফুলি রান্না চাপাল। রান্নার আয়োজন তেমন কিছু নয়। বেগুন ভাজা আর ডিমের ঝোল। সত্যেনবাবু নেশা করে ফিরলেন আরও রাতে।

খাওয়া শেষ হলে ফুলি মেঝেতে সুখময়ের বিছানা পেতে দিল। সারা দিনের ক্লান্তিতে সুখময়ের ঘুম এসে গেল। গভীর রাতে হঠাৎ তার ঘুমটা ভেঙে গেল কীসের শব্দে। অন্ধকারে খাটের উপর চলছে শরীর খেলা। শরীরি নেশায় মত্ত দু'জনের কারোরই হুঁশ রইল না ঘরের মধ্যে সুখময়ের উপস্থিতি। মাঝে মধ্যেই ছন্দবদ্ধ শ্লোগানে মচমচ করে বিদ্রোহ করে উঠল তাদের খাট। সেই শব্দেই তার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। অন্ধকারে মেঝেয় বিছানার উপর ঘুমের ভান করে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকল সে। মেয়েলি গন্ধে ভরা ঘ্রাণ আর সহস্র সুখের যন্ত্রণা কাতর শিৎকারে সদ্য কৈশোর পেরোনো সুখময়ের শরীরে জেগে উঠল আর এক শরীর।

রাতেই সুখময় ঠিক করে নিয়েছিল এখানে আর এক মুহূর্ত নয়, ভোর হলেই সে বেরিয়ে পড়বে চুনীবাবুর দেওয়া ঠিকানার খোঁজে। যে কোন একটা কাজের পাকা বন্দোবস্ত করেই সে ফিরবে বাড়ি।

গুটি গুটি পায়ে সুখময় এগিয়ে গেল একটি চায়ের দোকানের কাছে। চায়ের দোকানে নানা বয়সের লোকের আড্ডা। মুখরোচক আলোচনা। মোদী-মমতা, বিরাট রোহিত, রাহুল-সোনিয়া কে নেই সেই আলোচনায়। তাদের তাল কেটে দিয়ে সুখময় জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা দাদা, এইট্টি নাইন সন্তোষপুর এভিনিউ কোনটা বলতে পারবেন?'

— ওই সাদা বিল্ডিংটার পেছনে খয়েরি রঙের যে বাড়িটা ওটাই এইট্টি নাইন। দাসবাবুদের বাড়ি তো?

— হ্যাঁ, চুনীলাল দাস।

— ওই তো বাড়িটা।

একখানা খয়েরি রঙের পুরাতন বাড়ি। খুব যে পুরাতন তা বোঝাই যায়। দেয়ালের গায়ের রঙ সব খসে খসে পড়ছে। বাড়ির দেয়ালের কিছু গাছপালা আর চারিদিকে আগাছার ঝোপজঙ্গল। একটি ভাঙা কাঠের লেটার বাক্স। বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে। তার উপর কালো কালির অস্পষ্ট ছাপ। ৮৯ সন্তোষপুর এভিনিউ।

ভয়ে ভয়ে গ্রিল সরিয়ে সুখময় ঢুকল বাড়ির উঠোনে। কলকাতা শহরে বাড়ির উঠোন বলতে যা বোঝায়। একফালি একটু জায়গা। এক কোণে শুয়েছিল একটা ফেঁতি। নতুন লোক দেখে একটু কুঁই কুঁই আওয়াজ করল। ওই পর্যন্তই। আবার যেন সে সুখ নিদ্রায় নিমজ্জিত হল। উঠোনের এক কোণ থেকে, যেখানটাই একটা ঝাঁকড়া কাগজ ফুলের গাছ, সেখান থেকে একটা সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। সুখময় সিঁড়ির কয়েকটি ধাপ উপরে উঠে গেল। পরক্ষণে কী ভেবে আবার নেমে এল। সিঁড়ির দু'দিকে দু'টো বারান্দা। লোহার গ্রিল দিয়ে ঘেরা। কোথাও কোন কলিংবেল নেই যে কাউকে ডাকবে। অগত্যা সুখময় ডানদিকের বারান্দার গ্রিল ধরে নাড়া দিল। কারো কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। ফেঁতিটা আবার চোখ মেলে দেখল আর কুঁই কুঁই করতে লাগল। কোন উপায় না দেখে সে এবার বামদিকের গ্রিলটা ধরে নাড়া দিল। ফেঁতিটা এবার বিরক্ত হয়ে দৌড়ে পালাল। সেই সঙ্গে ভেতর থেকে একটি মেয়েলি কণ্ঠ ভেসে এল।

— কে? কী চাই?

সুখময় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

দরজার রঙিন পর্দাটা সরিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন এক ভদ্রমহিলা। বয়স ষাট কী পঁয়ষট্টি হবে। ঠিক অনুমান করতে পারল না সুখময়। ফর্সা, মাথায় কাঁচা পাকা চুল। স্বাস্থ্য ভালো। পরনে নাইটি। বিরক্তিভরা কণ্ঠে ভদ্রমহিলা বললেন, 'কী চাই বাপু তোমার? গতমাসের ধূপ এখনো ফুরোয় নি।'

— না না মাসিমা, আমি ধূপের কথা বলছি না। আমি বলছিলাম কী এটাই তো ৮৯ সন্তোষপুর এভিনিউ? এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলল সুখময়। তার মনে হল ভদ্রমহিলাকে মাসিমা ডাকাতে তিনি আরও বিরক্ত হয়েছেন। বিরক্তিতে তার চোখ মুখ সব কুঁচকে আছে। এতক্ষণ পর তিনি সুখময়ের দিকে ভালো করে তাকালেন। বললেন, 'কাকে চাই?'

— একটু দাসবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

— দাসবাবু উপরে থাকেন। যত্ত সব। এই হয়েছে এক জ্বালা। সকলেই এসে আমার গ্রিল ধরে নাড়াবে। কেন রে বাবা আমার গ্রিলে কি মধু ছড়ানো আছে। বিরক্তিতে গজগজ করতে করতে পর্দার আড়ালে চলে গেলেন ভদ্রমহিলা।

সুখময়ের বেশ মজা লাগল। হাসিও পেল একটু। সে ফিক্ করে হেসেও ফেলল।

বুকে এক মুঠো সাহস সঞ্চয় করে সুখময় তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল। সিঁড়ির মুখে লোহার গ্রিলের দরজা। সবুজ রঙ করা। এদিক ওদিক উঁকি মারল সুখময়। দেখল ফাঁকা বারান্দায় ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে দু'টি চেয়ার, একটি টেবিল। বারান্দায় দড়ি টাঙানো। তাতে ঝুলে আছে অনেক জামা কাপড়, লুঙ্গি, গামছা, মেয়েদের শাড়ি। এদিক ওদিক আর একবার ঝুঁকে কলিং বেলটি খোঁজার চেষ্টা করল সুখময়। খুঁজে পেল না। সিঁড়ির কয়েকটি ধাপ নীচে নেমেও খুঁজল একবার। এবার সে কলিংবেলটা পেয়েও গেল। সুইচে হাত দিতেই ট্যাঁ ট্যাঁ করে বেজে উঠল বেলটা।

একজন ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন গ্রিলের কাছে। কালো, বেশ মোটাসোটা। মাথার চুল কাঁচা পাকা মিলিয়ে মিশিয়ে। যেন লবণের

মধ্যে গোলমরিচ গুঁড়ো করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। খুব ছোটো ছোটো করে ছাঁটা। চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা। কাচগুলোও বেশ মোটা। মনে হয় খুব পাওয়ার। ভদ্রলোকের বয়সও ঠিক অনুমান করতে পারল না সুখময়। গায়ে গেঞ্জি। পরনে পুরানো একটা লুঙ্গি। দু'হাত জোড়ো করে নমস্কারের ভঙ্গিতে ভদ্রলোক বললেন, 'কাকে চাই, বাবু?'

প্রতি নমস্কার জানিয়ে সুখময় বলল, 'আমার নাম সুখময়। আমি চুনীলালবাবুর সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই। উনি একটা কাজের ব্যাপারে আমাকে দেখা করতে বলেছিলেন। কাগজে এই ঠিকানাটা লিখে দিয়েছিলেন।'

— 'ও হ্যাঁ হ্যাঁ।' সুখময়ের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'আমাকে চুনী বলেছিল বটে। আসুন বাবু, আসুন।'

কখন ভদ্রলোকের পিছনে আর একজন ভদ্রমহিলা এসে দাঁড়িয়েছিল তা খেয়াল করেনি সুখময়। এই ভরা দুপুরেও ভ্যাদভ্যাদে গরমের মধ্যে উনি একটা চাদর মুড়ি দিয়ে আছেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক হাত জোড় করে বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'মা, দয়া করে দরজা একটু খুলে দেবেন?'

— 'হ্যাঁ দিচ্ছি' বলে ভদ্রমহিলা বোধহয় চাবির খোঁজে গেলেন।

চাদর মুড়ি দেওয়ার জন্যে ঠিক আন্দাজ করা গেল না ভদ্রমহিলার বয়স। ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক। তবে ভদ্রলোক ওই মহিলাকে 'মা' বলে ডাকলেন, যখন তখন উনি নিশ্চয় ওনার মেয়ে বা বৌমা হবেন।

গ্রিলের তালা খুলে দিয়ে ভদ্রমহিলা নিজের ঘরে চলে গেলেন। তাঁর হাঁটার গতি দেখে সুখময়ের মনে হল মহিলা ভীষণ অসুস্থ।

— আসুন বাবু, দয়া করে ভেতরে আসুন।' অতি বিনয়ের সঙ্গে ভদ্রলোক ডেকে নিয়ে গেলেন ভেতরে।

— বসুন, এই চেয়ারটাতে বসুন।' বলে একটি চেয়ার সুখময়ের দিকে এগিয়ে দিলেন ভদ্রলোক।

সুখময় চেয়ারটিতে বসল। ঘরের চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। অসংখ্য বাঁধানো ফোটো ঝুলছে দেওয়ালে। তার মধ্যে মা সারদা, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামীজীই একমাত্র তার চেনা। বাকিদের সে চেনে না। তাদের ছবি দেখেনি এর আগে। ঘরের মধ্যে দু'টি বড়ো বড়ো পুরানো আলমারি। ভদ্রলোকের বিছানাতেও একবার চোখ ফেলল সে। অগোছালো। চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অসংখ্য বই। তাদের মধ্যে 'গীতা' উঁকি মারছে। মনে হল ভদ্রলোক খুব ধার্মিক। 'গীতা' দেখে সুখময়ের মনে এক ধরনের অনুভূতি তৈরি হল। সে ভদ্রলোককে কিছু বলতে যাবে। এমন সময় ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কোথা থেকে আসছেন স্যার?'

— একেবারে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল।

— জায়গাটার একটা নাম আছো তো?

— ভবানীপুর।

— সেটা কোথায় স্যার?

— হাওড়া জেলার একেবারে শেষপ্রান্ত।

— বাবাঃ, সে তো অনেক দূর! তা আপনি বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন কখন?

আসলে আজকে আমি আসছি হাওড়া দাশনগর থেকে। দাশনগরে এসেছি গতকাল। একটা কাজের খোঁজে এসেছিলাম। সেখানে কাজটা হল না।

— কেন সেখানে কাজটা হল না কেন?

— মালিক জানাল এখন ব্যবসার অবস্থা ভালো নয়। কারখানা ভালো চলছে না। তাই লোক লাগবে না।

— কীসের কারখানা?

— লেদের।

— রাতে ওখানেই থাকা হয়েছিল বুঝি?

রাতের কথা বলাতে সুখময়ের চোখের সামনে আবার গত রাতের দৃশ্য ভেসে উঠল। কানে স্পষ্ট শুনল খাটের মচমচ শব্দ। কোনরকমে মুখ দিয়ে আওয়াজ বের করল সে। বলল, হ্যাঁ।

— এখানে কীভাবে এলেন বাবু?

— দাশনগর থেকে ট্রেনে করে হাওড়া। সেখান থেকে বাস ধরে আপনার এখানে এসেছি।

— 'আ হা রে, আপনার অনেক কষ্ট হয়েছে। খিদেও পেয়েছে নিশ্চয়। আপনার মা থাকলে কত আদর করে খাওয়াতেন।' এই বলে খাট থেকে উঠলেন ভদ্রলোক। এগিয়ে গেলেন আলমারির কাছে।

মায়ের কথা মনে পড়ল সুখময়ের। মা নিশ্চয় তার জন্যে খুব চিন্তা করছে। মা'কে সে অবশ্য বলেই এসেছে কাজ ঠিক করে ফিরতে একটু দেরি হতে পারে।

ভদ্রলোক আলমারি খুলে দু'টো কৌটো বের করলেন। তার একটি থেকে কয়েকটি বিস্কুট বের করলেন। হ্যাঁ তা চার-পাঁচটা হবে। মেরি বিস্কুট। আর একটি কৌটো থেকে বের করলেন বেশ কয়েকটি বাতাসা। লাল, গুড়ের বাতাসা। একটা রেকাবিতে করে সুখময়ের সামনে ধরলেন ভদ্রলোক। বললেন, 'দয়া করে যদি একটু সেবা করেন।'

ভদ্রলোকের আন্তরিকতায় চোখে জল চলে এল সুখময়ের। বলল, 'আমি আপনার থেকে অনেক ছোটো। আমাকে যদি 'তুমি' সম্বোধন করেন তাহলে আমি খুব খুশি হব।' অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে কথাগুলো বলল সুখময়। তা শুনে ভদ্রলোক নিঃশব্দে হাসলেন। বললেন, 'আমার মধ্যে যে আত্মা; আপনার মধ্যেও সেই আত্মা।'

— কিন্তু আমার আত্মা আপনার আত্মার থেকে অনেক জুনিয়র। বলেই হেসে ফেলল সুখময়। তার কথা শুনে ভদ্রলোকও হেসে ফেললেন। বললেন, 'দয়া করে একটু সেবা করুন বাবু।'

সেই কখন থেকে সুখময়ের পেটে কুকুর ডাকছে। বিস্কুট আর বাতাসা ক'টা দেখে সেই ডাক আরো দ্বিগুণ হয়ে গেল। সে হাত পেতে রেকাবিটা নিল এবং সেগুলির সদ্ব্যবহার করতে শুরু করল। শুকনো খাবার। জল তেষ্টাও পেয়েছে। মনে হচ্ছে এই বুঝি গলায় আটকে গেল। সুখময় মুখ তুলে ভদ্রলোকের দিকে তাকাল। ভদ্রলোক অতি মনোযোগ সহকারে তার খাওয়া দেখছিলেন। সুখময় একটু লজ্জা পেয়ে গেল। বলল, 'দয়া করে এক গ্লাস জল খাওয়াবেন।'

— 'অবশ্যই। একি কথা! আমি একেবারে ভুলেই গেছি। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। আমি মহাপাতক ঈশ্বরের সেবায় আমি জল দিতে ভুলে গেছি।' নিজের মনেই আক্ষেপ করতে করতে ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে চলে গেলেন। বোধহয় জল আনতেই গেলেন। এমন সেবাপরায়ণ লোক

সুখময় এর আগে কখনো দেখেনি। একটু পরেই ভদ্রলোক একটা বড়ো কাচের গ্লাসে করে এক গ্লাস জল নিয়ে তার সামনে দাঁড়ালেন। সুখময় জলের গ্লাসটা হাতে নিয়ে গ্লাসে মুখ না ঠেকিয়ে আলগোছে জলটা খেল। তার যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে এল। বিস্কুটের শেষ টুকরোটা মুখে দিয়ে আবার সে তাকালে ভদ্রলোকের দিকে। তিনি খাটে বসে এক দৃষ্টিতে তার খাওয়া দেখছেন। সুখময় আবারও লজ্জা পেয়ে গেল। তার ভীষণ অস্বস্তি হতে লাগল। সেটা বুঝতে পেরেই বোধহয় ভদ্রলোক বললেন, 'বাবু, আপনি হলেন আমাদের অতিথি। আর অতিথি মানে তো স্বয়ং নারায়ণ। আমি নারায়ণ সেবা দেখছি। যদি আমার একটু পূণ্যি অর্জন হয়।'

বিস্কুট আর বাতাসা ক'টা খেয়ে সুখময়ের পেটের কুকুরটা একটু শান্ত হল। সেই সঙ্গে সে নিজেও একটু শান্তি পেল।

ভদ্রলোক সুখময়কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা ভাই, আপনারা কি সিডিউল কাস্ট?

— 'না, আমরা জেনারেল কাস্ট। উত্তর দিল সুখময়।

এই একটা জায়গাতে তার একটু খটকা লাগল। সিডিউল কাস্ট আবার কীসের। মানুষ তো সকলেই সমান। কিছুতেই তার মাথায় ঢোকে না এই সিডিউল কাস্ট ব্যাপারটা। অনেকদিন আগে বইয়ে পড়েছিল এরা নাকি পিছিয়ে পড়া শ্রেণি। কোন এক সময়ে সমাজে এদের হেয় করা হত। এদের সামাজিক মর্যাদা বলতে কিছুই ছিল না। তাই ভারতীয় সংবিধানের জনক ডাঃ বি. আর. আম্বেদকর সংবিধান রচনার সময় এই পিছিয়ে পড়া শ্রেণি সিডিউল কাস্টদের এত সুযোগ সুবিধা দিয়ে গেছেন। সুযোগ সুবিধা নয় তো কি! পড়াশোনার ক্ষেত্রে নম্বরের কোন কড়াকড়ি নেই। সরকারি চাকরিতে বয়সের ছাড়। চাকরির পরীক্ষায় ফি ছাড়। আর ওদের বেলায় কোন ছাড় নেই। কড়ায় গণ্ডায় সব বুঝে দিতে হবে। অথচ সিডিউল কাস্টদের মধ্যে এমন সব ফ্যামিলি আছে যারা অর্থনৈতিকভাবে বেশ স্বচ্ছল। অনেক বাড়িতে এমনও দেখা যায় যে সে বাড়ির প্রত্যেক সদস্যই সরকারি চাকুরে। তবুও তারা সিডিউল কাস্ট, পিছিয়ে পড়া শ্রেণি। আর অনেক জেনারেল কাস্ট পরিবার আছে যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থা। তবুও তারা পিছিয়ে পড়া শ্রেণি নয়। যদি পিছিয়ে পড়া শ্রেণি বলতেই হয় তবে তাদেরকেই বলা হোক, যারা সত্যিই অর্থনৈতিকভাবে, শিক্ষাগতভাবে পিছিয়ে আছে। যাক্‌গে, এসব ভেবে তার তো কোন লাভ নেই। তার এখন কাজের দরকার।

— 'কী ভাবছেন বাবু?' ভদ্রলোকের কথায় ঘোর কাটল সুখময়ের।

— 'না, কিছু না। আসলে কাজের ব্যাপারে।'

— কাজের ব্যাপারে তো কথা বলবই। আমার ছেলে আসুক। সন্ধ্যে ছ'টার মধ্যেই ও এসে যাবে।

— আমাকে তো আবার ফিরতে হবে।

— ফিরবেন কেন? আপনি আমার এখানেই থেকে যাবেন।

— আপনি কিন্তু তখন থেকেই আমাকে 'আপনি-আপনি' বলছেন। আমার ভীষণ অস্বস্তি লাগছে। আমাকে 'তুমি' বলে ডাকলে আমি খুব খুশি হব।

হে হে হে করে হাসলেন ভদ্রলোক। সুখময় এতক্ষণে খেয়াল করল ভদ্রলোকের দু'পাটিই দাঁতই বাঁধানো।

— 'এই বইটা একটু পড়ুন তো ভাই।' বলে ভদ্রলোক একটি চটি বই সুখময়ের দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

বইটি নিয়ে সুখময় নেড়ে চেড়ে দেখল। ছোটো, চটি বই। বইটির একেবারে উপরের পাতায় লেখা 'মনুষ্য জীবন মহান জীবন লাগো ভালো কাজে'। বেশ বড়ো বড়ো হরফে লেখা। তার নীচে লেখকের নাম লেখা। রামপ্রসাদ দাস।

সুখময় চোখ দু'টো বড়ো বড়ো করে বলল, 'এটা আপনার লেখা বই।'

— এই একটু আধটু লেখালেখি করি আর কী। আমার তো আর যোগ্যতা নেই ভাই। আমি অতি সাধারণ। অতি সাধারণেরও সাধারণ। ধুলোর ধুলো। কীটের কীট। কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বলে গেলেন তিনি।

— একি বলছেন আপনি! আপনার মতো মানুষ এই প্রথম আমি দেখলাম। আমি কোনদিন জীবন্ত কোন লেখককে দেখিনি। আমার মধ্যে একটা কেমন অনুভূতি হচ্ছে, তা আমি বোঝাতে পারব না।

— সত্যি বলছিস ভাই?

— একদম সত্যি। এর মধ্যে এক বিন্দু মিথ্যে নেই।

রামপ্রসাদবাবু নিজের মনেই কী ভাবতে লাগলেন। সুখময় এই সুযোগে বইয়ের মধ্যে ডুবে গেল।

(৯)

পরম পূজনীয় মা,

আশা করি কুশলে আছ। তোমার শরীর কেমন আছে? ভালো আছে নিশ্চয়। আমার জন্যে চিন্তা কোরো না। আমি ভালো আছি।

আমি এখন নিমাইবাবুর কাছে নেই। তুমি ভাবছ আমি নিমাইবাবুর কাছে আছি। না, তা নয়। ওখানে কোন কাজ ছিল না। সেদিন রাতে আমি ওনার পরিচিত একজনের ঘরে ছিলাম। তার পরদিনই আমি চলে আসি কলকাতা সন্তোষপুরে। চুনীবাবুর বাড়ি। চুনীবাবুর বাবার কাছে। নাম রামপ্রসাদ দাস। ভীষণ ভালো মানুষ। আমার জীবনে আমি এরকম মানুষ আর দু'টো দেখিনি।

আমি এখন ওনার কাছেই আছি। ওনার কাছে থেকে কাজ করছি। চুনীবাবু কলকাতায় থাকেন না। তিনি থাকেন বজবজে। সপ্তাহে একদিন বাড়ি ফেরেন। তিনি জুটমিলে আমাকে একটা স্থায়ী কাজ দেবেন বলেছেন।

আমার থাকা খাওয়ার কোন অসুবিধা নেই। তোমার জন্যে একটু একটু করে টাকা জমাচ্ছি। পুজোর সময় বাড়ি ফিরব। তখন তোমার জন্যে একটা সুন্দর জিনিস কিনব। জিনিসটা কী তা এখন বলব না। নিয়ে এলেই বুঝতে পারবে।

তোমার যে দু'টো মুরগি ছিল সে দু'টো কি ডিম দিচ্ছে? প্রতিদিন একটা করে ডিম খেয়ো। খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক করে কোরো।

আমাকে নিয়ে চিন্তা কোরো না। আমি ঠিক আছি। আজ এ পর্যন্তই। ভালো থেকো। প্রণাম নিও।

ইতি

তোমার সুখ

এক নিঃশ্বাসে সুতপা চিঠিটা পড়ে শেষ করল। চিঠিটা এসেছিল বেশ কয়েকদিন আগে। কল্পনা নিজের নামটা কোন রকমে সই করতে পারলেও একটা গোটা চিঠি পড়ার ক্ষমতা তাঁর নেই। তিনি ভেবেছিলেন চিঠিটা বরুণার কাছে নিয়ে যাবেন। কিন্তু নানা কাজের চাপে আর নিয়ে যাওয়া হয়নি। তাছাড়া মেয়েটার মন মেজাজও ভালো নেই। দু'দিন হল সেজগিন্নি নিখোঁজ। বাপের বাড়ি যায়নি। ননদদের বাড়িতেও নেই। পাড়াতে কানাঘুষোয় শোনা যাচ্ছে সেজগিন্নি পালিয়ে গেছে কলকাতায়। সেজগিন্নির আক্কেল বলিহারি বর না হয় পাগল, মাতাল। মেয়েগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে অন্ততঃ তার একাজ করা উচিত হয়নি।

ভাগ্যিস আজ মেয়েটা এসেছিল তার কাছে। যেদিন সুখ বাড়ি থেকে চলে গেল সেদিন থেকেই তার বুকটা বড়ো ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কাউকে কিছু বলতে পারছিলেন না। চিঠিটা শুনে আজ তার শান্তি হল।

লক্ষ্মীমন্ত মেয়েটা এসেছিল সুখের খোঁজ করতে। মুখটা একেবারে লক্ষ্মী ঠাকুরের মতো। রঙটা যদিও একটু চাপা। মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে কল্পনা ভাবতে লাগলেন, আহা এর সঙ্গে যদি আমার সুখের বিয়ে দেওয়া যেত। কী ভালোই না হত। কিন্তু ভগবানের বুঝি সে ইচ্ছা নয়। উনি অকালে চলে গেলেন। সংসারের ভার গিয়ে পড়ল সুখের ঘাড়ে। ছেলেটার পড়াশোনা বোধহয় আর হবে না। বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার পরপরই বের হল সুখের পরীক্ষার রেজাল্ট। ললিতবাবু বলে গিয়েছিলেন ছেলেটার এলেম আছে। খুব ভালো রেজাল্ট করেছে। আর ভালো। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল কল্পনার ফাঁকা বুকের গভীর থেকে।

— জ্যেঠিমা আমি যাই তাহলে ?

— ওমা যাবে কী গো ! একটু জল বাতাসা খেয়ে যাও। হাজার হোক, তুমি আমার ছেলের ছাত্রী। মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি এসেছ। খালি মুখেই চলে যাবে তা কখনো হয়। সুখ শুনলেই বা কী বলবে ? তুমি একটু বসো মা। তোমাকে দু'টো বাতাসা দিই।

— না, থাক, জ্যেঠিমা। সুখদা তো আর আমাদের বাড়িতে পড়াতে যাবে না তাই না। বাবা সেটাই জানতে পাঠিয়েছিল।

— তোমরা একটা অন্য মাস্টারমশাই দেখে নাও মা। বাবাকে গিয়ে বলো। তিনি নিশ্চয় বুঝবেন সব।

— ঠিক আছে জ্যেঠিমা। আমি এখন যাই তাহলে ?

ও দেখেছ, তোমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমি ভুলেই যাচ্ছি। বসো মা, একটু বসো।

একটা রেকাবিতে করে দু'টো বাতাসা আর এক গ্লাস জল সুতপার দিকে এগিয়ে দিলেন কল্পনা। বড়ো মায়া মাখা মুখ মেয়েটার। ডাগর ডাগর চোখ দু'টো তার মায়ায় টলটল করছে।

খুব কান্না পেল সুতপার। যখন সে ভাবল সুখদা তাদের আর পড়াতে আসবে না। সুখদার কাছে পড়ার মজাই ছিল আলাদা। সুখদার পাশে পড়তে বসে তার আলাদা একটা অনুভূতি হত। অলোককাকুর কাছে যখন পড়তে বসত তখন তার এরকমটা হত না। সুখদার জন্যেই বা তার এতো মন খারাপ হচ্ছে কেন কে জানে ! তার জন্যে কি সুখদার মন খারাপ হয় ? হয় বলে তো মনে হয় না। হলে চিঠিতে নিশ্চয় সে লিখত।

নিজের মনকে সে শাসন করল। এসব কী ভাবছে সে। সুখদা কি মা'কে লেখা চিঠিতে লিখবে, মা, সুতপা কেমন আছে ? তার একটু খোঁজ নিও। যত সব বোকা বোকা চিন্তা ভাবনা তার।

জলের গ্লাস নিয়ে জল খেল ঢকঢক করে। বলল, এবার আমি যাই জ্যেঠিমা।

— পাগলি মেয়ে, যাই বলতে নেই। বলতে হয় আসি।

— ঠিক আছে, বলে সুতপা হাসল। কল্পনার মনে হল মেয়েটার হাসিতে জাদু আছে। এই জাদু দিয়ে সে বশ করতে পারে যে কোন পুরুষকে।

(১০)

আপনি থেকে তুমি, তুমি থেকে তুই। সম্পর্কটা যে ধীরে ধীরে গাঢ় হচ্ছে সেটা বেশ ভালোই বুঝতে পারছে সুখময়। সেদিন অনেক দেরি করে বাড়ি ফিরেছিলেন চুনীবাবু। তাই রামপ্রসাদবাবুর সঙ্গে বসে বসেই গল্পে মেতে উঠেছিল সুখময়। তার হাতে চটি বইটা দিয়ে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তিনি। তার মধ্যেই বইটা পড়া হয়ে গিয়েছিল সুখময়ের। রামপ্রসাদবাবু ঘুম ভেঙে বিছানায় উঠে বসলেন। বললেন, 'বইটা পড়া হয়ে গিয়েছে ভাই ?'

— হ্যাঁ।

— কেমন লাগল ?

— ভালো। বইটি সুখময়ের বেশ ভালো লেগেছে। বইটিতে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ, সারদা মা আর স্বামীজীর বাণীগুলি তুলে দেওয়া আছে। তবে সুখময়ের বয়সের তুলনায় বইটি একটু উচ্চ মার্গের। এই বয়সে এইসব বাণী ফাঁকাবুলি বলেই মনে হয় তার।

রামপ্রসাদবাবু ধীরে ধীরে বিছানা ছেড়ে উঠলেন। আলমারির মাথা থেকে একটা ধূপের প্যাকেট পাড়লেন। কয়েকটি কাঠি বের করে একটা ম্যাচিস জ্বালিয়ে ধূপগুলি ধরালেন। তারপর দেওয়ালে ঝোলানো ফোটোগুলোর দিকে মুখ ফিরিয়ে বিড়বিড় করে কীসব বলতে লাগলেন আর ধূপ সমেত ডান হাতটি চারিদিকে ঘোরাতে লাগলেন। টেবিলের উপর রাখা একটি ফোটোর উপর উনি বারবার মাথা ঠুকে প্রণাম করতে লাগলেন। সুখময় সেদিকেই তাকিয়ে ছিল। কিন্তু এটা কোন ঠাকুরের ফোটো সুখময় তা বুঝতে পারল না। সারদা মায়ের ! না, সারদা মায়ের নয়। সারদা মায়ের একটা ফোটো আছে তাদের ঘরে। ফোটো বলতে ছবি। ক্যালেন্ডার। গত বছর গোবিন্দর দোকানে হালখাতার সময় পেয়েছিল। গোবিন্দ তাদেরই পাড়ার ছেলে। মুদির দোকান দিয়েছে মোড়ের মাথায়।

রামপ্রসাদবাবু টেবিলের সেই ফোটোটায় বার বার প্রণাম করায় সুখময়ের মনে বেশ কৌতূহল জাগল। এরপর তিনি এক অদ্ভুত কাণ্ড করলেন। ধূপ ঘোরাতে ঘোরাতে সুখময়ের কাছে এলেন। তার চারিদিকেও ধূপ ঘুরিয়ে তাকে হাত জোড়ো করে প্রণাম করলেন। সুখময় তো অবাক। লোকটি পাগল নাকি !

প্রণামের পালা শেষ করে ধূপের কাঠিগুলি একটি ধূপদানিতে করে টেবিলের উপর সেই ফোটোটার সামনে রাখলেন এবং পুনরায় বিছানার উপর গিয়ে আরাম করে বসলেন। সুখময় আর কৌতূহল চেপে রাখতে

পারল না। সে রামপ্রসাদবাবুকে প্রশ্ন করে বসল।

— আচ্ছা যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি স্যার?

— হ্যাঁ, হ্যাঁ একশোবার।

— ওই ফোটোটা কার? টেবিলে রাখা ফোটোটার দিকে আঙুল দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল সুখময়।

— ওই ছবিটা আমার স্ত্রীর।

— স্ত্রীর! বিস্ময়ের সীমা রইল না সুখময়ের। স্ত্রীকে মাতৃজ্ঞানে পুজো করেছিলেন পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি যুগাবতার। আর ইনি রামপ্রসাদ, ইনিও মাতৃজ্ঞানে স্ত্রী পুজো করেন! ইনি আবার কোন অবতার নন তো। সংশয় জাগে সুখময়ের মনে।

— আচ্ছা স্যার, আমি আপনাকে কী বলে ডাকব। বার বার স্যার বলে ডাকতে ভালো লাগছে না।

রামপ্রসাদবাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'ঠিক আছে ভাই, দাদু বলেই ডাকিস।'

'দাদু' বলাতে সুখময়ের নিজের দাদুর কথা মনে পড়ে গেল। দাদু মানে ঠাকুরদা। তিনি ছিলেন শিক্ষক। শিক্ষকতা তাঁর পেশা ছিল না। ছিল নেশা। বলতে গেলে সুখময় ওর দাদুর কাছেই মানুষ।

সুখময়দের গ্রামের বাড়িটা মাটির। কিন্তু বেশ বড়ো। প্রায় সাত কাঠা জায়গা জুড়ে বাড়ি এবং বাগান। সামনে মস্ত উঠোন। দিব্যি বল খেলা যায়। দক্ষিণমুখো বাড়ি। পূব থেকে পশ্চিমে লম্বা দালান। বাড়িটাকে পেছন থেকে দেখলে এক নজরে স্কুলবাড়ি বলেই মনে হয়। সকাল বিকাল দু'বেলাই কচিকাঁচাদের ভিড়। বাড়ির ভেতরে দাদুর পড়ানো চলছে। 'অ-এ অজগর আসছে তেড়ে, আ-এ আমটি খাব পেড়ে।' 'ছায়ার ঘোমটা মুখে টানি/আছে আমাদের পাড়াখানি।' 'একে চন্দ্র, দুইয়ে পক্ষ' কিচ্ছু বাদ নেই। গ্রামে দাদু 'মাস্টারমশাই' নামেই পরিচিত। বিনা নোটিসে দাদু হঠাৎ একদিন চলে গেলেন না ফেরার দেশে। সুখময়ের মাথার উপর থেকে ছাতাটা সরে গেল। তারপর তো বাবাও চলে গেলেন। এখন নীল আকাশের নীচে তার বাস। বাবার কথা মনে পড়তেই তার মন খারাপ হয়ে গেল।

— মা, একটু এদিকে আসবেন। কাউকে ডাকলেন রামপ্রসাদবাবু। আর সেই ডাকেই সুখময়ের ঘোর কাটল।

চাদরমুড়ি দিয়ে সেই ভদ্রমহিলা, যিনি গেটের তালা খুলে দিয়েছিলেন। এসে উপস্থিত হলেন রামপ্রসাদবাবুর ঘরে।

ভদ্রমহিলার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন রামপ্রসাদবাবু। 'ইনি আমার মা। আমার ছেলে চুনীর বউ।' তারপর সুখময়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'মা এই যে ছেলেটিকে দেখছেন, এর নাম সুখময়। গ্রাম থেকে এসেছে। বাবা নেই। মা খুব গরিব।'

— 'ও আচ্ছা।' বলে ভদ্রমহিলা সুখময়ের মুখের দিকে তাকাল।

সুখময় হাত জোড়ো করে নমস্কার জানাল। ভদ্রমহিলার মুখাবয়বের কোন রূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করল না সে। যেমন এসেছিলেন তেমনই চলে গেলেন।

— 'এই যে বাবুসোনা, কে এসেছে দেখে যাও।' বলে রামপ্রসাদবাবু মুখ বাড়িয়ে কাউকে ডাকলেন।

— কে দাদু? বলে একটি বছর ছয়-সাতের ছেলে ঘরে ঢুকল।

— 'ভগবান।' বললেন রামপ্রসাদবাবু।

— 'ভগবান না ছাই। এই তোর নাম কী রে?' সুখময়ের দিকে আঙুল তুলে জিজ্ঞাসা করল ছেলেটি।

লজ্জায় অপমানে সুখময়ের মুখ কালো হয়ে গিয়েছিল। এইটুকু বাচ্চা। তাকে 'তুই' সম্বোধন করছে। সে রামপ্রাসাদবাবুর দিকে তাকাল। দেখল তিনি হাঁ করে নিঃশব্দে হাসছেন।

ছেলেটির দিকে তাকাল সুখময়। ছেলেটি তখন কোমরে দু'হাত দিয়ে তার দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে। কোনোরকমে সুখময় বলল, 'আমার নাম সুখময়। তোমার নাম কী?'

ছেলেটি মুখ বিকৃত করে বলল, 'আমার নাম শক্তিমান।' বলেই দৌড় দিল।

রামপ্রসাদবাবু বললেন, 'ছেলেটার যে কী হয় মাঝেমধ্যে। বড়োদের সম্মান করতে জানে না। ওর মা কোনও শিক্ষা দেয় না। আসলে আমার বৌমার মধ্যেই তো কোন শিক্ষা নেই। যা আছে তা কাগজে কলমে। ছেলেটা একদম পশু হয়ে যাচ্ছে। ওর বাবাও দেখি কিচ্ছু বলে না। আমার স্ত্রী থাকলে ওকে তুলে আছাড় মারত।

চুনীবাবু সেদিন বাড়ি ফিরলেন রাত আটটার পর।

(১১)

মন ভালো নেই প্রদীপের।

সংসারে তার মতের সঙ্গে কারো মতের মিল হচ্ছে না। মেজভাই সংসারে শুধু আলাদা হল তা নয়। সে ব্যবসাও ভাগ করে নিয়েছে, এতে প্রদীপের মন একদম ভেঙে গেছে। সব থেকে অবাক লেগেছে মা'কে দেখে। প্রতীপ যখন মা'কে গিয়ে বলল সে আলাদা হতে চায়। মা'র অন্ততঃ এটুকু তো বলা উচিত ছিল যে, 'আলাদা হবি কী জন্যে দাদা এত পরিশ্রম করে তোদের দাঁড় করিয়েছে। তোরা এখন কোথায় সংসারের হাল ধরবি, দাদার পাশে এসে দাঁড়াবি তা না করে বউয়ের কথায় তুই সব কিছু আলাদা করে নিতে চাচ্ছিস।' মা একথা না বলে প্রতীপকে বলল, 'তুমি যা ভালো বোঝো করো, আমি আর কী বলব।'

মা'র এই নির্লিপ্ত মনোভাব দেখে আশ্চর্য হয়েছে প্রদীপ। মা'র এই উদাসীনতা ভালো লাগেনি তার। বরং তার মনে হয়েছে মা'র প্রশ্রয়েই প্রতীপ আর নয়নার এত বাড়বাড়ন্ত। তারা শুধু বাড়ি সম্পত্তি আর ব্যবসার ভাগই নিয়েছে। মা'র কোনও দায়ভার নেয়নি। প্রদীপ তো আর নিজের মুখে বলতে পারে না যে সব কিছুর ভাগ যখন নিয়েছ মায়ের দায়ভারও তোমাদের নিতে হবে। সুনিপা এই কথাটা বলতে চেয়েছিল। প্রদীপ বলতে দেয়নি। বলে কী লাভ। মা যখন নিজের মুখে কিছু বলছে না। যে কথা মা'র বলা উচিত সে কথা সুনিপা বলে সবার কাছে অপ্রিয় হবে কেন।

প্রতীকের হাবভাবও আজকাল আর ভালো লাগছে না প্রদীপের। সেও এখন অনেক কাজই তার সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই করে। মা'র ঘরে দীর্ঘক্ষণ গিয়ে চুপিচুপি কী সব আলোচনা করে। স্নেহ সর্বদা নিম্নগামী। প্রদীপ তা জানে। মায়ের প্রশ্রয়ও তেমনি নিম্নগামী। মা ছোটদের প্রশ্রয় দেবেই। সেই প্রশ্রয় পেয়েই তারা সাজানো সংসার ভেঙে তছনছ করে দেবে। এই চিন্তায় প্রদীপের রাতের ঘুম চলে

গেছে। শরীরে নানা রোগ বাসা বেঁধেছে। প্রেসার, সুগার, কোলেস্টেরল কী নেই তার এখন।

সুনিপার কাছে মাঝে মধ্যে মুখ খায় প্রদীপ। ঝাঁঝাল স্বরে বলে ওঠে,

— 'তোমার অত চিন্তা কীসের?'

— 'মা'র কথা ভেবেই কষ্ট হয় নিপা।'

— 'কই তোমার মা'র তো কোন কষ্ট হচ্ছে না। উনি তো দিব্যি আছেন।

— মনের কষ্ট কি আর বাইরে থেকে বোঝা যায় নিপা?

— তুমি সব বুঝে বসে আছ। দেখ গিয়ে তোমার ছোটো ভাই আর তার বউ তলায় তলায় মায়ের ঘরে কী ফন্দি আঁটছে।

চুপ করে থাকে প্রদীপ। বোঝে কথায় কথা বাড়ে। আজকাল সুনিপাকেও কেউ আর তেমন গুরুত্ব দেয় না। সে যে বাড়ির বড়ো বউ তা যেন সবাই ভুলে গেছে। প্রতীপ, প্রতীক বৌদির স্নেহ মমতার কথা কী করে ভুলে গেল সেটা ভেবেই ভীষণ অবাক হয় প্রদীপ। মাঝে মধ্যে তার মনে হয় এরা কি মানুষ!

অসীমের কথা মনে পড়ে প্রদীপের। অসীম তার অসময়ের বন্ধু। সুসময়ের বন্ধু হতে পারে সবাই। অসময়ের বন্ধু হতে পারে ক'জন! আপদে বিপদে সব সময় অসীমই তার পাশে এসে দাঁড়ায়। অসীমই একবার বলেছিল, 'ঘরের থেকে পর ভালো। পরের থেকে জঙ্গল ভালো।' কথাটা অবশ্য অসীমের নয়। কথাটা অসীমের মায়ের। মাসিমার এই কথাটার গভীরতা আজ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে সে।

মেয়েটাকে নিয়েও আজকাল খুব চিন্তায় থাকে প্রদীপ। কথায় বলে কলাগাছের বাড় মেয়েদের। দেখতে দেখতে চোখের সামনেই কীরকম তরতর করে বড়ো হয়ে গেল মেয়েটা। মনে হয় যেন এই তো সেদিনের ঘটনা। সুনিপার কোল আলো করে এল একটা ফুটফুটে বাচ্চা। সবাই আশা করেছিল ছেলে হবে। মেয়ে হয়েছিল বলে সবাই যেন খুশি হতে পারেনি। তবে প্রদীপ খুব খুশি হয়েছিল। সে মনে মনে কন্যা সন্তানই চেয়েছিল। এতবড় সংসার চালাতে গিয়ে আর সবার মন জুগিয়ে চলতে গিয়ে মেয়েটার দিকে সেরকম নজর দেওয়া হয়নি। মেয়েটার দিকে এখন একটু দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

পড়াশোনায় এখন আর সেরকম মনোসংযোগ করতে পারে না সুতপা। আগে ভাইরা মিলে একসঙ্গে পড়তে বসত। সুখময়দা পড়াতে আসত তাদের বাড়ি। সেসব দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। অমনি তার মনোসংযোগ ছিঁড়ে যায়। এখন সবাই আলাদা হয়ে গেছে। সবাই আলাদা আলাদা পড়তে যায়। কাকিমারা এখন নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত থাকে। মেজ কাকু, মেজকাকিমা তো দোতলা থেকে নীচেই নামে না। ঠাকুমার শরীরটা ভালো নেই। বয়স হয়েছে। বয়সের ভারে আসতে আসতে নুয়ে পড়ছে ঠাকুমা। বাবার শরীরটাও দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছে। কতরকম ওষুধ খায় বাবা। আগে বাবা কী সুন্দর দেখতে ছিল। ফর্সা মোটাসোটা। এখন বাবাকে দেখলে কেমন দুর্বল দুর্বল লাগে। মা'রও মেজাজ ঠিক থাকে না। সব সময় খিটখিট করতে থাকে। ভালো লাগে না সুতপার। স্কুলেও যেতে মন লাগে না তার। ছেলেরা বিশেষ করে তার থেকে উঁচু ক্লাসের ছেলেরা যাদের সে দাদা ডাকে তারা যেন কেমন করে তাকায় তার দিকে। তার ভীষণ খারাপ লাগে। তাদের চোখের দৃষ্টিগুলো যেন কেমন। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। একদিন মা'কে বাড়ি ফিরে বলেওছিল সেকথা। মা তাকেই বকাবকি করেছিল। বলেছিল, 'স্কুলে গিয়ে একদম ধিঙ্গিপনা করবে না।' এতে তার কী দোষ কিছুতেই বুঝতে পারে না সে। এখন যদি সুখময়দা কলকাতা থেকে ফিরে আসত বাড়ি। আর তাকে পড়াতে আসত তাহলে বোধহয় মা বাবার কোন আপত্তি থাকত না। বাবা তাকে একদিন সুখময়দার বাড়িতে খোঁজ করতেও পাঠিয়েছিল। কিন্তু সুখময়দা মা'কে লেখা চিঠিতে জানিয়েছে সে এখন একটা কাজ পেয়েছে। মায়ের জন্যে টাকা জমাচ্ছে। পুজোর সময় বাড়ি ফিরবে। বাড়িতে এসে একথা সে বাবাকে জানিয়েছিল।

বাবা মা তাকে এখন কোন ছেলে টিচারের কাছে আর পড়তে পাঠায় না। মেয়ে টিচার খোঁজে। গ্রামে মেয়ে টিচার আর কোথায় পাওয়া যাবে। মা এখন তাকে একা একা স্কুলে যেতে দেয় না। মা তাকে স্কুলে পৌঁছে দেয়। স্কুল ছুটির পর মা আবার গিয়ে নিয়ে আসে তাকে। এত পরিশ্রম মা'রও সহ্য হচ্ছে না। তার শরীরও ভেঙে পড়ছে। এক অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে সময় কাটছে তাদের। এরই মধ্যে একদিন সুখময়কে স্বপ্নে দেখল সুতপা। স্কুল ছুটি হয়েছে তাদের। পিঠে স্কুল ব্যাগ নিয়ে একা একা বাড়ি ফিরছে সে। হেঁটে হেঁটেই ফিরছে। হঠাৎ ক্রিং ক্রিং করে শব্দ হল পেছনে। ঘাড় ঘুরিয়ে সুতপা দেখল সাইকেল নিয়ে তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে সুখময়। সে হাসছে। অপার্থিব হাসি। সুতপা বলল, 'হাসছ কেন?'

— তোমাকে দেখে।

— আমাকে দেখে!

— হ্যাঁ, তোমাকে দেখে। তোমাকে দেখে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে।

— আমাকে দেখে তোমার আনন্দ হচ্ছে?

— হ্যাঁ। খুব আনন্দ হচ্ছে।

— কেন?

— তা বলতে পারব না।

— এদিকে কি কোথাও গেছিলে?

— না তোমাকে আনতে এসেছি।

— এই যে বলো, তুমি সাইকেল চালাতে পারো না।

— পারি নাই তো।

— তাহলে আমাকে নিয়ে যাবে কী করে?

— তুমি সাইকেলের ক্যারিয়ারে বসবে। আমি সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যাব।

— যাহ্, তাই কখনো হয় নাকি।

— অবশ্যই হয়। বসো ক্যারিয়ারে। তোমার ব্যাগটা আমাকে দাও। সামনের হ্যান্ডেলে ঝুলিয়ে দিই।

সুতপার কাঁধ থেকে ব্যাগটা নিয়ে নেয় সুখময়। সাইকেলের সামনের হ্যান্ডেলে ঝুলিয়ে দেয় সে। সুতপা ক্যারিয়ারে চেপে বসে। তাকে অবাক করে দিয়ে সুখময় চেপে বসল সাইকেলের সিটে। সাইকেল এগিয়ে চলেছে হাওয়ার গতিতে। হঠাৎ সুতপা খেয়াল করল সাইকেল আর মাটিতে নেই। হাওয়ার মধ্যে দিয়ে উড়ে উড়ে যাচ্ছে। সাইকেল আর সাইকেল নেই। হয়ে গেল পক্ষীরাজের ঘোড়া। পক্ষীরাজের ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে তারা। কোথায় যাচ্ছে তারা জানে না। মেঘের ভিতর

দিয়ে উড়ে উড়ে যাচ্ছে। সাদা মেঘ। কালো। হঠাৎ করে কালো মেঘ ঘিরে ধরল তাদের। চারিদিকে কী জমাট অন্ধকার। সেই অন্ধকারে সুখময়কে আর দেখা যায় না। পক্ষীরাজের ঘোড়াটিও আর নেই। সুতপা হাওয়ায় ভাসছে। হাওয়ায় সে সাঁতার কাটছে। সাঁতার কাটতে কাটতে তার হাত পা ব্যথা হয়ে গেছে। সে আর সাঁতার কাটতে পারছে না। সে পড়ে যাচ্ছে নীচে। ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল সুতপা।

— কি রে কী হল তোর? মায়ের ডাকে ঘোর কাটল সুতপার।

— ওঠ্। স্কুলে যাবি তো?

— সুতপা দেখল অনেক বেলা হয়ে গেছে। সকালের ঝকঝকে রোদ্দুর এসে পড়েছে তার বিছানায়। হঠাৎ সুখময়ের জন্যে তার খুব মন খারাপ করতে লাগল।

(১২)

পুজোর সময় বাড়ি ফেরা হল না সুখময়ের। চুনীবাবু বউ বাচ্চাকে নিয়ে পুরী বেড়াতে গেলেন। রামপ্রসাদবাবুকে দেখাশোনার দায়িত্ব এসে পড়ল তার কাঁধে।

থাকা খাওয়া আর মাস মাইনের বিনিময়ে রামপ্রসাদবাবুর দেখাশোনা করে সুখময়। কাজটা করতে তার ভালো লাগে। বৃদ্ধ মানুষটার সঙ্গ তাকে সুখ দেয়। মানুষটার প্রতি তার একটা মায়া পড়ে গেছে। তাঁকে দাদু ডাকে সে। দাদু তাকে বলেছে চাইলে সে ডিস্ট্যান্স কোর্সের মাধ্যমে পড়াশোনাটা চালাতে পারে। অন্তত পক্ষে গ্র্যাজুয়েশনটা কমপ্লিট করতে হবে তাকে। মাঝে মধ্যে বেশ জোর দেন তিনি। তার জোরাজুরিতেই সুখময় আবার লেখাপড়াটা শুরু করবে ঠিক করেছে।

পুজোতে বাড়িতে যাবে বলে সে কেনাকাটা করে ফেলেছিল। মায়ের জন্যে একটা ফোন কিনেছিল সে। এটা ছিল মা'র সারপ্রাইজ গিফ্‌ট। চুনীবাবু পরিবার নিয়ে পুরীতে বেড়াতে গেল বলে তার আর বাড়ি যাওয়া হল না।

পুজোর পরে পরেই বেশ শীত শীত ভাব চলে এসেছে। এখন তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা নামে। গুটি গুটি পায়ে কখন সন্ধ্যা এসে গেছে তা খেয়ালই করেনি সুখময়। ইলেকট্রিকের বাতি জ্বলে উঠেছে রাস্তায়। বাড়ির মধ্যে জ্বলে উঠেছে টিউবলাইট। অবশ্য এগুলিকে সে ছোটো বেলায় বাঁশ লাইট বলে জানত। পরে জেনেছে এগুলি টিউবলাইট। মায়ের কথা মনে পড়ে গেল সুখময়ের। মা এখন কী করছে কে জানে! হয়তো বা চাদর মুড়ি দিয়ে বারান্দায় বসে আছে চুপচাপ। হয়তো বা তার কথাই ভাবছে। মায়ের চাদরটা অনেক দিনের পুরানো। ছেঁড়া। শীত কাটে না। মায়ের জন্যে বেশ সুন্দর দেখে ঘিয়ে রঙের একটা শাল কিনে নিয়ে যেতে হবে। মা কত স্বল্পে খুশি হয়ে যায়। মায়েরা বুঝি এরকমই হয়। দূর থেকে সুখময়ের কানে ভেসে এল গাড়ির হর্নের আওয়াজ। তার মনে পড়ে গেল সন্ধ্যা হয়ে গেল এখানে কেউ শাঁখ বাজাল না তো। কেউ সন্ধ্যেও দিল না। তাদের বাড়িতে উঠোনের ঠিক মাঝখানে একটা বড়ো তুলসী মঞ্চ আছে। সেখানে রোজ সন্ধ্যা বেলায় মা প্রদীপ জ্বালিয়ে, শাঁখ বাজিয়ে সন্ধ্যে দেখায়। প্রদীপ নিয়ে প্রত্যেকটি ঘরের দরজায় প্রণাম করে।

— 'চল্ ভাই, একটু মন্দির থেকে বেড়িয়ে আসি।' একটা ফিনফিনে পাতলা পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে স্টিলের চকচকে লাঠিটা নিয়ে তৈরি রামপ্রসাদবাবু।

— 'আপনি শাল বা চাদর, কিছুই নেবেন না? বাইরে কিন্তু বেশ ঠান্ডা।' বলল সুখময়।

রামপ্রসাদবাবু হেসে বললেন, 'দেখ ভাই, তোমরা এখন ইয়ং। তবুও তোমাদের ঠান্ডা লাগছে। তার মানে কী? তার মানে তোমরা ব্রহ্মচর্য পালন করনি। আর আমি ব্রহ্মচর্য পালন করেছি। আমি বীর্য্য ধারণ করেছি। বীর্য্য ধারণং ব্রহ্মচর্য্যম।' রামপ্রসাদবাবুর এই কথাগুলো সুখময়ের মুখস্থ হয়ে গেছে। প্রথম প্রথম এই কথাগুলো শুনে সে ঘাবড়ে যেত। এখন আর ঘাবড়ায় না। বরং সে একটু মজা পায়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা দু'জন সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নীচে। ফেঁতিটা আজ আর উঠোনে শুয়ে নেই। বোধহয় একটু খাদ্য আর একটা নিশ্চিন্ত উষ্ণ আশ্রয়ের খোঁজে বেরিয়েছে।

ওরা দু'জনে ধীর পায়ে হেঁটে চলেছে ফুটপাতের উপর দিয়ে। চারিদিকে একটা ধোঁয়াশা ভাব। কুয়াশা পড়ছে। একটা ছোট গলির ভিতরে ঢুকল তারা। গলিটার মধ্যে কোন আলো ছিল না। আবার অন্ধকার যে ছিল তাও না। আসলে মেইন রাস্তার আলো গলিটাকে সামান্য হলেও আলোকিত করে রেখেছিল।

— 'সাবধানে আসিস্ ভাই।' বলে আগে আগে চললেন রামপ্রসাদবাবু।

— 'হ্যাঁ দাদু, চলুন।' বলে পিছন পিছন চলল সুখময়।

ভেতর থেকে ভেসে আসছে হরিনাম সংকীর্তনের সুরেলা আওয়াজ। সুখময়ের মনে পড়ল সন্ধ্যেবেলায় ওদের পাড়াতেও এরকম হরিনাম সংকীর্তন হয়।

সরু একটা সিঁড়ি দিয়ে ওরা দু'জন আগে পিছে উপরে উঠতে লাগল। অন্ধকার সিঁড়ি। হঠাৎ করেই সিঁড়ির আলো জ্বলে উঠল। সম্ভবতঃ তাদের আগমন উপরের মানুষজন টের পেয়েছে। 'আয়েন, আয়েন, বয়েন' সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে এক বয়স্ক ভদ্রলোক রামপ্রসাদবাবুকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। তিনি সবাইকে নমস্কার জানিয়ে চোখ বুজে বসে থাকা বয়স্ক এক পক্ককেশ ভদ্রলোকের পাশে বসলেন। সুখময়কে নিজের পাশে বসার জন্যে ইশারা করলেন।

জায়গাটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চারিদিকে শ্বেতপাথরে বাঁধানো। মেঝেতে নানা নক্‌শা কাটা। তার উপর শীতকাল আসছে বলে আগে থেকেই রঙিন কার্পেট বিছানো। সামনে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি। মূর্তির সামনে বড়ো বড়ো কাঁসার থালায় ফুল নৈবেদ্য সাজানো। ধূপ ও ধুনোর গন্ধে জায়গাটা একেবারে মম করছে। কয়েকটি বাচ্চা ছেলেমেয়ে মেঝের চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করছে। এটা সাহাবাবুর রাধাকৃষ্ণের মন্দির। তিনি ত্রিপুরার লোক। এখানে তার মশলাপাতির ব্যবসা। সেই ব্যবসায় তিনি প্রভূত অর্থ সম্পদ করেছেন। এখন বয়সকালে তিনি রাধাকৃষ্ণের প্রেমে পড়েছেন।

রামপ্রসাদবাবু যার পাশে গিয়ে বসলেন, সেই পক্ককেশ ভদ্রলোকই হলেন সাহাবাবু। সবার কপালেই শ্বেত চন্দনের ফোঁটা। একজন এসে রামপ্রসাদবাবুর কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে গেলেন। তিনি মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে হাত জোড়ো করে তাকে প্রণাম করলেন। যিনি ফোঁটা

দিতে এসেছিলেন তিনি শুধু মহিলাই নন, বয়সে প্রায় রামপ্রসাদবাবুর অর্দ্ধেক। সেই মহিলা প্রায় লাফিয়ে সরে গেলেন। সুখময়ের কপালেও একটা চন্দনের ফোঁটা দিয়ে গেলেন তিনি। সুখময়ও হাত জোড়ো করে নমস্কার করল তাঁকে। নমস্কার করাটাও বোধহয় সংক্রামক ব্যাধির মতো। রামপ্রসাদবাবুর থেকেই এই সংক্রমণ তার মধ্যে সংক্রামিত হয়েছে।

দশ-বারোজনের একটা দল মন্দিরের মেঝেয় বসে হরিনাম সংকীর্তন গাইছে। দলের মধ্যে একজনের হাতে খোল। বাকি সবার হাতে কিছু না কিছু বাদ্যযন্ত্র। কারো হাতে করতাল, কারো হাতে খঞ্জনি। একজন এসে রামপ্রসাদবাবুর হাতে একটা করতাল, সুখময়ের হাতে খঞ্জনি দিয়ে গেল। ওরা দু'জন তালে তালে বাজাতে শুরু করল। প্রধান গায়ক গেয়ে চলেছেন—

আমারও মরণ হইলে
না পুড়াইয়ো, না ভাসাইয়ো
তুলে রেখো তমালের ডালে
আর হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে
গান শুনাইয়ো কর্ণমূলে।
সখি গো .....

দুয়ারিরাও গলা ছেড়ে ধরেছেন গান। একসময় রামপ্রসাদবাবু ও সুখময় তাতে যোগ দিল এবং ডুবে গেল নিমেষে। এইভাবে কতক্ষণ চলল তা আর সুখময়ের খেয়াল নেই।

ঘোর কাটল সবার কথাবার্তাতে। নামসংকীর্তন শেষ হয়েছে। এবার সবার যাবার পালা। একে একে সাহাবাবুকে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিচ্ছে সবাই। এরই মধ্যে সাহাবাবুর সঙ্গে রামপ্রসাদবাবুর কিছু কথাবার্তা হল। সাহাবাবু বললেন, 'এখন আর কিছুই খাইতে পারি না।'

রামপ্রসাদবাবু বললেন, 'আহা, আপনার কত কষ্ট।

— কষ্ট তো হইবই। যখন খাওনের ইচ্ছা আছিল তখন খেতে পারি নাই। হাতে এক নুয়া পয়সা ছিল না। খাব কী কইরা। এখন হাতে দু'টো পয়সা হইছে কিন্তু খাবার ইচ্ছা নাই। শরীল দেয় না। 'সব ভগবানের খেলা বাবু। ভগবানকে ডাকুন উনি সব ঠিক করে দেবেন। উনি চাইলে কিনা হয়। জলেও পাথর ভাসে।' জয় রাধাকৃষ্ণ। জয় রামকৃষ্ণ।'

বলতে বলতে রামপ্রসাদবাবু সুখময়ের হাত ধরলেন বাড়ি ফেরার জন্যে। সে রাতে সহজে ঘুম এল না সুখময়ের। চোখের সামনে শুধু সুতপার মুখটা ভেসে ভেসে উঠতে লাগল। আর কানের কাছে বাজতে লাগল সেই গান।

সখি গো, আমারও মরণ হইলে .....

(১৩)

আজ আনন্দের কোন সীমা পরিসীমা নেই কল্পনার। কী করবে আর কী করবে না তা ঠিক করতেই পারছে না নিজে। কী রাঁধবে, কী খাওয়াবে তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না। সব কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। আজ সুখময় বাড়ি ফিরেছে।

কতদিন পরে দেখল সুখময়কে। সুখময়ের স্বাস্থ্য এখন বেশ ভালো হয়েছে। রঙ উজ্জ্বল হয়েছে। তবুও কল্পনার মনে হল ছেলে যেন তার একটু রোগা হয়ে গিয়েছে। রঙটাও যেন একটু মরে গেছে।

— তোর খাওয়ার খুব কষ্ট হত তাই নারে বাবা!

— না, কষ্ট হবে কেন?

— বড্ড রোগা হয়ে গেছিস।

— তুমি না মা সত্যি! কোথায় রোগা হয়ে গেছি? বরং আগের থেকে মোটা হয়ে গেছি। তোমাকে একটু রোগা রোগা লাগছে।

— না রে বাবা আমি ঠিক আছি।

— মোটেও না। খাওয়া দাওয়া নিশ্চয় ঠিকঠাক করে করতে না।

— করতামরে বাবা করতাম। তুই আজ কী খাবি বল?

— তুমি যা খাওয়াবে।

ছেলের এই কথাতেই খুব অস্থির হয়ে উঠেছে কল্পনা। ছেলেকে কী খাওয়াবে সেই ভাবনাতেই পাগল হয়ে যাচ্ছে মায়ের মন।

বারান্দায় বাবার ফোটোটায় চোখ গেল সুখময়ের। মা খুব সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে বাবার ফোটোটা। সুখময়ের মনটা খারাপ হয়ে গেল। মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে মনে মনে বলল সে, তুমি বড়ো অসময়ে চলে গেলে বাবা। বড়ো অসময়ে। এই কি তোমার যাবার সময়!

মা'র কাছ থেকে আরো একটা খবর শুনে সুখময়ের মন খারাপ হয়ে গেল।

সেজগিন্নি বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে। নানা লোকে নানা রটনা রটায়। কেউ কেউ তাকে নাকি দেখেছে খারাপ মেয়েদের পাড়ায়।

— খারাপ মেয়েদের পাড়া মানে! অবাক হল সুখময়।

মা হয়ে ছেলেকে খারাপ মেয়েদের পাড়া সম্পর্কে কী বলবে বুঝে পেল না কল্পনা।

যেদিন শেষ সেজ বউয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল সেদিন ছিল ভরা পূর্ণিমা। চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছিল চারিদিক। বারান্দায় বসে বসে সেজ বউয়ের সঙ্গে গল্প করেছিল অনেকক্ষণ। একটা পাগল করা গন্ধে মাতাল হয়ে যাচ্ছিল সুখময়। ঘটাং ঘটাং করে সেলাই মেশিন চালাচ্ছিল বরুণা।

আজও পূর্ণিমা। পূর্ণ চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে চারিদিক। সেজ বউ নেই। বরুণা এখন সেলাই মেশিন চালায় না। সে কুনকুন করে কাঁদে।

সুখময়ের মন ভালো নেই। সুতপার জন্যেও মন কেমন করতে লাগল তার। কতদিন দেখেনি মেয়েটাকে। কেমন আছে কে জানে। এই জ্যোৎস্না রাতে হাঁটতে হাঁটতে তার কাছে চলে যাওয়া যায়। কিন্তু সেটা বড়ো দৃষ্টিকটু দেখায়।

অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকল সুখময়। আধো ঘুম আধো জাগরণে তার ঘরটাকে মনে হল নদী। সেই নদীর উপর একটা নৌকা ভাসছে। সেই নৌকায় রয়েছে একটা ঘর। তার ভিতর বিছানায় শুয়ে আছে সুখময়। নদীর জলে চাঁদের আলো ভেঙে ভেঙে পড়ছে। একটা ছায়া ভেসে এল নদীর জলে। সেই ছায়া আর কারো নয়। সুখময় দেখল সুতপা। সুতপা হাসতে হাসতে বলল, 'এরকম চমৎকার রাতে তুমি বিছানায় শুয়ে আছ? পাগল নাকি?'

— কী করব?

— চলো ঘুরে আসি।

— কোথায় যাব?

কোথায় আবার, নৌকার ছাদে গিয়ে বসে থাকব।

দু'জনে ছাদে গিয়ে বসে। নদীর জলে চাঁদের আলো পড়ে চকচক করছে। তিরি তিরি বাতাস বইছে। কী মধুর সে বাতাস। সেই বাতাসে ভেসে আসছে একটা মিষ্টি গন্ধ। সুখময় চোখ বন্ধ করে বুক ভরে সেই ঘ্রাণ নেয়। সুখময়ের হাতের উপর হাত রাখে সুতপা। সুখময়ের ভীষণ রোমাঞ্চ বোধ হয়। তার গা শিরশির করে। গভীর আনন্দে চোখ ভিজে ওঠে। এরপর এক অদ্ভুত কাণ্ড হল। সুখময়ের হাতে সুতপা টুকটুকে লাল একটা গোলাপ দিল। সুখময় সেটিকে নাকের কাছে নিয়ে গেল। এই গন্ধটাই তো ভেসে আসছিল নাকে। অবাক বিস্ময়ে সুখময় বলল, 'এই গোলাপটি তুমি কোথায় পেলে?'

সুতপা বলল, এর মধ্যে সব ভুলে গেলে? তুমি আমাকে একটা গোলাপ গাছ দিয়েছিলে না?

আমি? তোমাকে? গোলাপ গাছ? বিস্ময় আর ধরে না সুখময়ের।

— হ্যাঁ মশাই। তুমি। তুমিই দিয়েছিলে গোলাপ গাছটা।

সুখময় কিছুতেই মনে করতে পারল না। সে মনে করার চেষ্টা করতে লাগল। একটা সময় তার কপালের মাঝখানটাতে ভীষণ ব্যথা হতে শুরু করল। সুখময়ের ঘুম ঘুম ভাবটা কেটে গেল।

এরপর সারা রাত আর ঘুম এল না। কষ্টে চোখে জল চলে এল। কেবলি মনে হল একদিন না একদিন সুতপা আসবে এ বাড়িতে।

(১৪)

বারান্দায় বসেছিল প্রদীপ।

বাজার ভালো নয়। হাতে তেমন কাজ নেই। তাই এ সপ্তাহে আর কলকাতায় যায়নি সে। শরীরটা ক'দিন খুব ভালো যাচ্ছে না। পেটের প্রবলেম। কিছু খেলে পেটে সয়ছে না। সইদুল ডাক্তার দেখে ওষুধ দিয়ে গেছেন। তাতে খুব একটা লাভ হচ্ছে বলে তার মনে হচ্ছে না। আর সময় নষ্ট না করে কলকাতায় একটা বড়ো ডাক্তার দেখাতে হবে।

বাড়ির দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল সুখময়। উঠোন পেরিয়ে এগিয়ে গেল বারান্দার দিকে। প্রদীপের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল সে।

— আরে করো কী, করো কী। তোমাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না বাবা?

— আমি সুখময়। একসময় আপনাদের বাড়িতে পড়াতে আসতাম।

— ও, আচ্ছা আচ্ছা। তুমি জলধরদার ছেলে?

— হ্যাঁ কাকাবাবু।

— তোমাকে সেই কোন ছোটবেলায় দেখেছি। মা'র হাত ধরে আসতে জগদীশদের বাড়ি।

— জগদীশ মামা আমার মা'র মাসতুতো দাদা।

— জানি তো। তোমার মা'র বিয়ে হতে দেখলুম আমরা। মনে হয় এই তো সেদিনের কথা। জলধরদা যে এমন হঠাৎ করে চলে যাবে। পরে সবই শুনেছি তোমার কাকিমার কাছে। তা তোমার খবর বলো। ভালো আছ তো?

— হ্যাঁ কাকাবাবু, ভালো আছি।

— ঠান্ডা এবার কেমন পড়বে বলে তোমার মনে হয়?

— বুঝতে পারছি না। অন্যান্য বছর তো এই সময় বেশ ঠান্ডা পড়ে যায়।

প্রদীপ সুখময়কে বসতে বলল তার পাশের চেয়ারটাতে। সুখময় বসল।

সুতপার বাবার সঙ্গে কোন দিন কথা বলেনি সে। বস্তুত সুতপার বাবা কোন জন সেটাও জানত না সে। একদিন দূর থেকে দেখেছিল। বাজারে। সেদিন সুতপা ছিল বাবার সঙ্গে। পরে পড়াতে এসে সুতপাকে জিজ্ঞাসা করেছিল। বাজারে যে ভদ্রলোকটির সঙ্গে তুমি যাচ্ছিলে সেটি কে?

— এ মা ওটাই তো আমার বাবা। তুমি জানো না? হাসতে শুরু করেছিল সুতপা।

— না সত্যিই আমি জানতাম না। লাজুক হেসে বলেছিল সুখময়।

কিন্তু তখনকার ভদ্রলোকের শরীর স্বাস্থ্যের সঙ্গে এখন যিনি তার সামনে বসে আছেন তার কিছুই মিল নেই। সেদিন ভদ্রলোক ধবধবে সাদা পাজামা পাঞ্জাবী পরেছিলেন। এখন পরে আছেন একটা ময়লা লুঙ্গি। তাও সেটা হাঁটু পর্যন্ত তোলা। গায়ে একটা হলুদ রঙের মোটা গেঞ্জি। লুঙ্গির সঙ্গে গেঞ্জিটার ম্যাচ হয়নি একেবারে। এই কম্বিনেশনে তাকে ভীষণ অসুস্থ দেখাচ্ছে। তিনি সুখময়ের দিকে তাকালেন। সুন্দর করে হাসলেন। চমকে উঠল সুখময়। শুধু এই হাসিটা দেখেই চট করে বলে দেওয়া যায় ইনিই সুতপার বাবা।

চেয়ারে বসে সুখময় বলল, 'আপনার শরীর কেমন আছে?'

— এই আছি আর কী। মন ভেঙে গেলে শরীরও ভেঙে যায় বাবা।

— কেন কী হয়েছে?

— বাড়ির ব্যাপার। তুমি বাইরের ছেলে। তোমাকে কী আর বলব বলো?

বেশ জোর একটা ধাক্কা খেয়েছে সুখময়। এতক্ষণ সে ভেবে আসছিল যে সুতপাদের বাড়িতে গেলে তাকে অনেকদিন পরে দেখছে বলে সবাই সাদর অভ্যর্থনা জানাবে। কিন্তু তা হল না। উপরন্তু সুতপার বাবার মুখে এই বাইরের ছেলে কথাটায় জোর আঘাত পেয়েছে সে। এরপর কোন কথা বলবে সে বুঝে উঠতে পারল না।

প্রদীপই বলল, 'তুমি তো এখন শহরে থাকো, তাই না?

— হ্যাঁ কাকাবাবু।

— কোথায় থাকা হয় যেন?

— সন্তোষপুর।

— বজবজ সন্তোষপুর?

— না কাকাবাবু। সন্তোষপুর এভিনিউ। কলকাতা। অনেকে যাদবপুর সন্তোষপুর বলে।

— বুঝেছি। যাদবপুর স্টেশনের ওই পারে।

— হ্যাঁ কাকাবাবু, ঠিক ধরেছেন।

— আমাদের অনেক পার্টি আসত সন্তোষপুর থেকে। সে একসময় ছিল। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে প্রদীপ আবার বলল, এখন সব কিছু কেমন যেন বদলে গেছে। তা কী কাজ করা হয় সেখানে?

কী কাজ সুখময় তা বলতে পারল না। শুধু বলল, 'নতুন করে

আবার লেখাপড়া করার চেষ্টা করছি কাকাবাবু।

— লেগে থাকো। লেগে থাকতে হয়। কষ্ট করলে অবশ্যই কেষ্ট মেলে।

অনেকক্ষণ হয়ে গেল সুখময় এসেছে। বাড়িতে আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কোথাও গেছে বোধহয়। একবার ভাবল সুতপার কথা জিজ্ঞাসা করবে। পরক্ষণেই তার মনে হল শুধু সুতপার কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত হবে না। সুখময় কথা খুঁজে না পেয়ে চেয়ারে চুপচাপ বসে থাকল।

প্রদীপই মুখ খুলল। বলল, 'চুপচাপ বসে আছ কেন? শহরের গল্প বলো শুনি। তোমার কাছ থেকে শহরের হাল হকিকৎ শুনতে বেশ ভালোই লাগবে।

— আমার কাছে শহরের সেরকম কোনো খবরা-খবর নেই কাকাবাবু।

— সে কি কথা! শহরে থাক অথচ তোমার কাছে শহরের কোনো খবরা-খবর নেই? বলো কী হে?

এবার উঠে পড়বে কিনা বুঝতে পারছে না সুখময়। এভাবে কথা বলতে বলতে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়াটাও বোধহয় দৃষ্টিকটূ লাগবে।

— চা খাবে?

— না কাকাবাবু। আমি চা খেয়েই এসেছি।

চা এমনই জিনিস যা বারবার খাওয়া যায়। আমি কলকাতায় থাকলে তো দিনে চব্বিশ-পঁচিশ কাপ চা খায়। চা খেয়ে খেয়েই পেট ভর্তি।

— আসলে আমার চায়ের নেশা নেই।

— নেশা না থাকাই ভালো।

চা খাবার কথা বলবে কিনা তা ভাবতে লাগল সুখময়। হয়তো ভদ্রলোকের চায়ের নেশা লেগেছে এখন। সুখময় খেলে তিনিও এক কাপ খেতেন এরকম একটা ব্যাপার। 'ঠিক আছে আপনি যখন বলছেন, তখন এক কাপ চা খাওয়া যেতেই পারে।' এই কথাটা বলতে যাবে সুখময় ঠিক তখনই প্রদীপ বলল, 'অবশ্য এখন চা খেতে চাইলে আমাকেই বানাতে হবে। কারণ বাড়িতে কেউ নেই।'

কাউকে না দেখতে পাওয়ার কারণটা এতক্ষণ পরে বুঝল সুখময়। সে বলল, কোথায় গেছে সব?

— তোমার কাকিমা মেয়েকে নিয়ে গেছে বাপের বাড়ি। মেয়েকে সেখানেই রেখে আসবে। সেখান থেকেই সে পড়াশোনা করবে।

একথা শুনে সুখময়ের বুকে যেন হাতুড়ির ঘা পড়ল। কোনরকমে সে বলল, বাড়ির আর কাকিরা?

— তাদের কারোর সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই।

এরপর সুখময় কী বলবে ভেবে পেল না। সে দাঁতে দাঁত চেপে থাকল।

প্রদীপ বলল, 'মেয়েটাকে নিয়ে ভীষণ চিন্তায় আছি হে। মেয়ে বড়ো হচ্ছে। তোমরা ছেলে। তোমাদের নিয়ে বাবা-মা'র অত চিন্তা থাকে না। কিন্তু মেয়ে বড়ো হলে বিশাল টেনশন। সে তুমি বুঝবে না। তাই এই স্কুলে আর মেয়েটাকে রাখব না। মেয়েটা শুধু শরীরেই বড় হয়েছে। বুদ্ধিশুদ্ধি কিছুই হয়নি। কবে একটা অঘটন ঘটে যাবে। ওর চেয়ে বরং ও মামার বাড়িতেই থাক। ওখানে ওর মামাদের খুব দাপট আছে। ছেলেপিলের দল মেয়েটার পেছনে লাগতে সাহস পাবে না। কি ভালো ডিসিশন না?

ভালো মন্দ কিছুই বলল না সুখময়। সুতপাকে আজকে একটা কথা বলবে বলে এসেছিল সে। সযত্নে সাজিয়ে রাখা গোপন একটি কথা।

বাড়ি ফিরে যাচ্ছে সুখময়। হয়তো আজই আবার কলকাতায় ফিরে যাবে। হয়তো অন্যসব রাতের মতোই স্বপ্নে দেখবে সুতপাকে। সারা রাত আর ঘুম আসবে না তার। নিদারুণ কষ্টে চোখে জল চলে আসবে। হয়তো সুতপার সঙ্গে তার আবার দেখা হবে। দেখা হলেও তখন আর এই গোপন কথাটি তাকে বলার ইচ্ছে তার থাকবে না। ইচ্ছে থাকলেও সুতপার শোনার সময় থাকবে না নিশ্চয়।

With Best Compliments from...

All Well Wisher

Anindita Dev

গান্ধীজীর কথাতেই ননীগোপাল মৈত্র সুলেখা কালির ব্যবসা শুরু করেন

যাদবপুর সহ দক্ষিণ কলকাতার প্রায় সবাই 'সুলেখা মোড়' চেনেন বা নাম শুনেছেন। কিন্তু এই এলাকার কেন এমন নাম, তা নতুন প্রজন্মের অনেকেই জানে না। সর্বভারতীয় স্তরে বাঙালি ব্যবসা করে না এমন অনেক কথা শোনা যায়। অথচ স্বাধীনতার আগে এক বাঙালির হাত ধরেই কালির ব্যবসা সর্বভারতীয় স্তর থেকে আন্তর্জাতিক স্তরে উঠে আসে। তিনি হলেন ননীগোপাল মৈত্র-সুলেখা কালির প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর ছেলে মানস মৈত্রর সঙ্গে আলাপচারিতায় সুলেখা কালির ইতিহাস জানা গেল।

সুলেখা কালি তৈরির পেছনে একটা ইতিহাস রয়েছে। মহাত্মা গান্ধী যখন সোদপুরে ননীগোপাল মৈত্রের সঙ্গে দেখা করেন, তখন গান্ধীজী বলেছিলেন, 'আমার বিদেশি কালি দিয়ে লিখতে একদম ভালো লাগে না, তোমরা স্বদেশি কালি বানানোর চেষ্টা করো'।

এরপর ননীগোপালবাবু কালি তৈরির ব্যবসায় নিজেকে নিয়োজিত করেন এবং দেশের পাশাপাশি দক্ষিণ এশিয়াতেও এই ব্যবসা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। মানস মৈত্র জানান, আমাদের কালি শ্রীলঙ্কা, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, বার্মা সহ নানা দেশে যেত। আমি যখন ব্যবসায় মার্কেটিংয়ের ব্যাপারটা দেখতাম, তখন আনুমানিক ৪৫ লাখ টাকার বরাত আমাদের কাছে থাকত। আসলে সুলেখার মার্কেটিং বিভাগটা বেশ ভালোই ছিল। কলকাতা ছাড়াও শিলিগুড়ি, গুয়াহাটি, পাটনা, কটক, দিল্লি, মাদ্রাজে মার্কেটিংয়ের অফিস ছিল। প্রথম কারখানা হয় মদন মিত্র লেনে। তারপর বালিগঞ্জের কসবা এলাকায় কারখানা সরিয়ে আনা হয়। কসবায় আমাদের বাড়ির পাশে একটা বড়ো জায়গায় টালির শেডে সুলেখার কারখানা ছিল। তখন সবকিছুই হাতে তৈরি হত।

১৯৪৯ সাল পর্যন্ত ওখানেই কারখানা ছিল। এরপর যাদবপুরে কারখানা হয়। ১৯৫৮ সালে সোদপুরে দ্বিতীয় কারখানা হয়। সোদপুরের কারখানাটি ইংরেজ আমলে শুয়োর কাটার কারখানা ছিল। ৪ বিঘা জমির ওপর এই কারখানার শেড ছিল। ১৯৬০ সালে এই কারখানটি চালু হয়। এখানে কালি ছাড়াও ফিনাইল, গাম, গালা তৈরি হত। তখন সুলেখার নাম সারা দেশজুড়ে। এরপর ১৯৭১ সালের ১ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের বাইরে গাজিয়াবাদে তৃতীয় কারখানা হয়।

একেবারে শুরু থেকে এই সংস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল, কোম্পানির সঙ্গে দোকানদারদের নিবিড় সম্পর্ক। যখন আমাদের সংস্থা বন্ধ হয়ে যায়, তখনও অনেকে লাখ লাখ টাকা নিয়ে আসতেন মাল নেওয়ার জন্য। ওই সময় (১৯৮৮ সাল) একটা সার্ভেতে দেখা যায় ৮৯ শতাংশ শেয়ার মার্কেট সুলেখার দখলে ছিল।

সুলেখা কালি তৈরির অনেক গল্প বা ইতিহাস রয়েছে। যা শুনলে চমকে উঠতে হয়। দেশভাগের আগেই যাঁরা এদেশে এসেছিলেন তাঁরা রোজ সকালে বাবার সঙ্গে দেখা করে তাদের দুঃখের কথা বলতেন। বাবা যেহেতু স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন এবং সবার শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন তাই তিনি কাউকে ফিরিয়ে দিতেন না। এভাবেই তিনি সুলেখাকে বড়ো করে তোলেন। যাদবপুরর কারখানায় ৪০০ শ্রমিক ছিল।

স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা যখন উঠল, তখন একটা ছোটো ঘটনা বলা যাক। কর্ণধারের কথায়, 'বাবার নামে হুলিয়া বেরিয়েছে। বাবার মাথার দাম ১০ হাজার টাকা রাখে ব্রিটিশরা। বাবা রাতারাতি রাজশাহী থেকে কলকাতা চলে আসেন। বাড়ির সবাই বাবাকে দেখতে অস্থির। ব্রিটিশরা বাড়ি ঘিরে ফেলে। বাবা ধোপা সেজে বাড়িতে আসেন। প্রথমে কেউ চিনতে পারেনি। বাবা আবার ধোপা সেজেই বেরিয়ে যান। রেলস্টেশনে বাবার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়। তিনি তখন আনন্দবাজারে কাজ করেন। বাবা তাঁকে কথা বলতে বলতে সানন্দা যাওয়ার কথা বলেন। পরেরদিন খবরের কাগজে খবর হয়। বাবা মালদায় তাঁর এক মাসতুতো বোনের বাড়ি যান। তাঁর স্বামী ছিলেন মালদার দারোগা। বাবা যখন তাঁদের বাড়ি যান, তখন সেই বোনের স্বামী ব্যাপারটা আঁচ করেন। বাবাকে বিশ্রাম নিতে বলেন। বাবা স্নান সেরে গল্প করে খেতে বসেন। তখনই পুলিশ আসে তাঁকে গ্রেফতার করে সেখান থেকে বাবাকে সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে যাওয়া হয়।'

১৯৬৪ সালে বার্মা সরকার একটি ইন্টারন্যাশনাল টেন্ডার ডাকে। যাতে তাবড় তাবড় কালি তৈরির সংস্থা যোগ দিয়েছিল। তার মধ্যে থেকে বরাত পেয়েছিল সুলেখা। ১৯৭৭ সালে ইউনেস্কো একটি সমীক্ষা করে দেখে আফ্রিকাতে কোনও ফাউন্টেন পেনের কারখানা নেই। তখন তারা ভারত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে। আর ভারত সরকারের এনআরডিসি বিভাগ সুলেখার সঙ্গে যোগাযোগ করে কেনিয়ায় একটি কারখানা করার জন্য। ওই কারখানা করার জন্য সব জিনিসপত্র এখান থেকেই কেনিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। এমনকী অনুসারী শিল্পের উপাদান নাট, বল্টুগুলোও আমাদের দেশের তৈরি এবং আমার তত্ত্বাবধানেই কেনিয়ার কারখানা তৈরি হয়। যা সুলেখার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশের গর্ব।

২০০৬ সালে এই সংস্থার নতুন কারখানা তৈরি হয়। বর্তমানে সুলেখা হোমকেয়ার ও বিচিত্র জিনিস তৈরি করছে। ইন্ডিয়ান ওয়েল ও হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়ামের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে। আউটলেটে সুলেখার যাবতীয় পণ্যসামগ্রী পাওয়া যাচ্ছে। নতুন করে ফাউন্টেন পেন তৈরি হচ্ছে। খুব শিগগির সবার কাছে যাবে। বাবাই আমাদের সৎভাবে ব্যবসা করতে শিখিয়েছেন। আর আমরাই ভারতবর্ষের প্রথম সংস্থা যারা অ্যাডভান্সড নিয়ে ব্যবসা করতাম।

রামমোহন রায়ের অজানা কাহিনি

নিত্যব্রত মুখোপাধ্যায়, দৌহিত্র-রাজা রামমোহন রায়

রাজা রামমোহন রায় ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে ২২মে মতান্তরে ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে ১০মে হুগলি জেলার রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রামকান্ত ও মা তারিণী দেবী। রামকান্ত রায়ের তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ জগমোহন, মেজ রামমোহন ও ছোটো বৈমাত্রেয় ভাই রামলোচন রায়।

রঘুনাথপুরে রামমোহনের বাড়ি :

ধর্ম সম্পর্কে পিতার সঙ্গে বাদানুবাদ ছিল। পৌত্তলিকতা, ধর্মবিরোধী মতামত এবং হিন্দুধর্মের আচার সর্বস্ব সতীদাহ বিরোধী মতামত ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে পিতা ও পুত্রের সম্পর্ক এমন তিক্ততায় পরিণত হল যে রামমোহনকে ত্যাজ্যপুত্র করে রাধানগর গ্রামের বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়। তখন রামমোহন রাধানগর থেকে কিছুটা দূরে অর্থাৎ বর্ধমান জেলার অন্তর্ভুক্ত রঘুনাথপুর গ্রামে বর্ধমানের জমিদার উদয়চাঁদ মহাদেবের কাছে খানিকটা জায়গা প্রার্থনা করেন। তিনি জমিদারকে বলেন, আমি পিতা কর্তৃক বিতাড়িত এবং এই মুহূর্তে পরিবারবর্গ নিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছি। আমাকে বসবাসের জন্য একটু জায়গা দিন। তখন বর্ধমানের জমিদার তাঁকে সামান্যই জায়গা দিয়েছিলেন তাও শ্মশানভূমিতে। রামমোহন এতই দৃঢ়চেতা ছিলেন যে তিনি বলেছিলেন, শ্মশান যেহেতু কারোর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় সাধারণের, তাই আমি এইখানেই বাড়ি বানাব। তাই রামমোহন রত্নাকর নদীতীরে মহাশ্মশানে বসবাসের ইচ্ছায় বাড়ি নির্মাণ করেন। তিনি যে বাড়িটি নির্মাণ করেন তার প্রতিটি ইটের উপর 'ওম তৎসৎ' লেখা ছিল। রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদের এই বাড়িতেই জন্ম হয়। রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতি বিজড়িত সেই বাড়িটির ধ্বংসাবশেষ আজও দাঁড়িয়ে আছে।

বাড়ির সামনেই ত্রিকোণ সাধনমঞ্চ। তারই উপরে ওম তৎসৎ একমেবাদ্বিতীয়ম বাণী লেখাছিল। এই সাধনমঞ্চে তিনি পরমব্রহ্মের উপাসনা করতেন। ওঁর এই আসল সাধনমঞ্চটি বর্তমানে আর নেই। তার পরিবর্তে ওই স্থানে একটি বেদি নির্মাণ করে সাধনমঞ্চ কথাটি লেখা আছে।

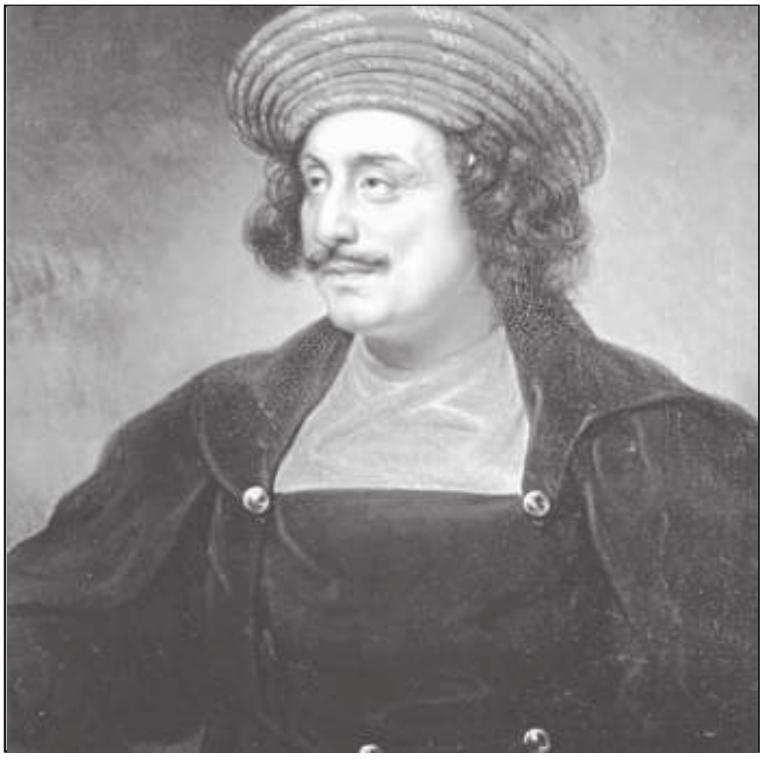

রামমোহন রায় ও তাঁর বড়ো বৌদি :

রামমোহন রায়ের বড়ো বৌদি অলকমঞ্জুরি দেবী একদিন তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, ধর্ম নিয়ে পরিবারের সকলের সঙ্গে তোমার এত বিবাদ কেন? ধর্মটা কি তুমি আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারবে? উত্তরে রামমোহন বলেছিলেন, দেখ, বৌদি আমাদের বাড়ির সামনে একটি মাঠ সেখানে অনেকগুলো গরু চড়ছে। এদের কারোর গায়ের রং লাল, কারোর গায়ের রং কালো, আবার কারোর গায়ের রং সাদা। কিন্তু এদের সকলের দুধের রং হল সাদা। ধর্মও সেই একই জিনিস। তৎকালীন অল্প লেখাপড়া জানা গ্রাম্য রাজবধূকে তিনি এইভাবে সহজ উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। কাছারি বাড়ির সামনেই আছে অশোক গাছ। রামমোহনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগমোহন রায়ের স্ত্রী তাঁকে পুত্র স্নেহে ভালোবাসতেন। রাজা রামমোহন রায়ের অনুপস্থিতিতেই তাঁর বড়বৌদিকে পৈশাচিক সতীদাহ প্রথার বলি হতে হয়েদিল। এত বড়ো আঘাত রামমোহন সহ্য করতে পারেননি। ওইসময় তিনি রংপুরে ব্রিটিশ সিভিলিয়ান ডিগ্রী (ঢব্জক্সচ) সাহেবের অধীনে পার্সোনাল মুন্সি ছিলেন। পরে দেওয়ান নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৮১১ খ্রিস্টাব্দে রামমোহন শ্মশানে সতীদাহের চিতাভস্ম ছুঁয়ে অঝোরে কেঁদে শপথ করেছিলেন, সমাজের বুক থেকে এই প্রথা তিনি যে করেই হোক উচ্ছেদ করবেন নচেৎ তাঁর নাম রামমোহন রায় নয়। এরপর তিনি ভারতশাসক লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ককে বুঝিয়ে সতীদাহ প্রথা রদ করতে আইন আনেন। এবং ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর সমাজের বুক থেকে এই প্রথা চিরতরে উচ্ছেদ করেছিলেন। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর ইংল্যান্ডের ব্রিস্টল শহরে রাজা রামমোহন রায়ের মহাপ্রয়াণ ঘটে। তাঁর জন্মের ২৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই 'জয়তু রামমোহন'।

রামমোহনের বাণী :

"ভাব সেই একে জলে-স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে, যে রচিলে এ সংসার আদি অন্ত নেই যার সে জানে সকল কেহ নাহি জানে তাকে।"

অনন্য প্রবাদপ্রতিম পুরুষ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য

অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অধ্যয়নশীল মানুষ বিনয়তোষ ভট্টাচার্যকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করলেন বর্তমান সাহিত্য জগতের দিকপাল রমেশ মুখোপাধ্যায়। যিনি সম্পর্কে বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের দৌহিত্র হন।

প্রবাদপুরুষ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর চতুর্থ পুত্র বিনয়তোষ ভট্টাচার্য ছিলেন সম্পর্কে আমার মায়ের বাবা। এক অদ্ভুত পাণ্ডিত্য, অসাধারণ জ্ঞানভাণ্ডার এবং অধ্যায়নশীল মানুষ ছিলেন তিনি। বৌদ্ধ শাস্ত্রের ওপর তাঁর গবেষণা বা বিশ্লেষণ বৌদ্ধ দর্শনে এক অন্য মাত্রা এনে দিয়েছিল। দুঃখের বিষয়, ভারতে ওঁর বিশ্লেষণ খুব বেশি জনপ্রিয় বা প্রভাব ফেলতে পারেনি। যদিও কেমব্রিজ এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ওঁর বই রেফারেন্স বুক হিসেবে যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য। কথিত আছে, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও আশুতোষ মুখার্জি দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু হওয়ার জন্য তাঁদের মধ্যে অলিখিত চুক্তি হয় যে, হরপ্রসাদ তাঁর ছেলেদের নামে 'তোষ' যোগ করবে আর আশুতোষ তাঁর সন্তানদের 'প্রসাদ' যোগ করবেন। সেখান থেকেই দেখা যায় বিনয়তোষ বা শ্যামাপ্রসাদ নামটি এসেছে। ড. বিনয়তোষ ভট্টাচার্য এম.এ.পি.এইচ.ডি, রাজ্যরত্ন হওয়ার পরেও সম্পদের ওপর আকৃষ্ট না হয়ে মনুষ্যত্ব বিকাশে নিজেকে নিয়োজিত করেন।

বিনয়তোষ ভট্টাচার্য ১৮৯৭ সালে ৬ জানুয়ারিতে ওড়িশার কটকে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই তিনি তাঁর মা হেমন্তকুমারীকে হারান। বাবার খুব প্রিয় ছেলে হওয়া সত্ত্বেও অতিরিক্ত বা অন্ধ স্নেহ দেখাননি কখনো। বিনয়তোষ ভট্টাচার্য যেমন দুরন্ত তেমনি মেধাবী ছিলেন। বর্ষার ভাগলপুরের গঙ্গা হোক বা গাছে উঠে ভূতের ভয় দেখানোর ব্যাপার সব জায়গাতেই তিনি ছিলেন এক নম্বরে। এদিকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী খুব কড়া মনোভাবাপন্ন ছিলেন। ছেলেমেয়েদের মধ্যবিত্তদের মতোই মানুষ করেছিলেন। শোনা যায়, দাদু বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের দুষ্টুমিতে জুরি মেলা ভার ছিল। একবার দাদু ও তাঁর বন্ধুদের ঘুগনি, চানাচুর খাওয়ার খুব ইচ্ছে হল। পকেটে পর্যাপ্ত টাকা নেই। সেই সময় প্রায় ২৫- ২৬ জন বন্ধু সবাই জানত বিনয় যখন ইচ্ছে প্রকাশ করেছে তখন একটা উপায় বের করবে। এরপর যখন ঘুগনিওয়ালা ওদের সামনে এল তখন ওকে থামিয়ে কিছু কথা বলে রাজি করানো গেল। ঠিক হল বিনয় আগে টেস্ট করবে। দাদু ওটা খেয়ে মুহূর্তের মধ্যে মাটিতে পড়ে মুখ দিয়ে বমি এবং পরবর্তীতে গ্যাজলা বেরোতে লাগল। ঘুগনিওয়ালা খুব ভয় পেয়ে গেল। সবাই ওকে বলল পুলিশে দেবে। সে তো ভয়ে টাকা না নিয়ে তার সর্বস্ব ফেলে পালিয়ে গেল। সে চলে গেলেই দাদু উঠে পড়লেন এবং বন্ধুরা সবাই মিলে মজা করে সব ঘুগনি খেয়ে ফেলল। তবে এটা ঠিক, বিনয়তোষ ভট্টাচার্য মনের দিক থেকে খুব উন্নত ও উদার ছিলেন। কয়েকদিন পরে সেই ঘুগনিওয়ালাকে খুঁজে বার করে তার সব টাকা, বাসনপত্র ফিরিয়ে দেন।

চুরি করে খাওয়া বা গাছ থেকে নারকেল পাড়াতেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এইসব ছিল তাঁর আনন্দ, তবে তিনি কারোর ক্ষতি করতেন না। সবার বিপদে এগিয়ে আসতেন বলে, তাঁকে সবাই খুব ভালোবাসতো।

তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল Buddhist Iconography যা তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম P.H.D করেন।

তৎকালীন বরোদার মহারাজা তৃতীয় সয়াজিরাও গাইকোয়ারের উৎসাহে রাজ্যে প্রতিভা সম্পন্ন বিদ্বজনের দিকে বিশেষ নজর ছিল। বিনয়তোষ ভট্টাচার্যও তাঁর নজরে ছিলেন। কিন্তু তখনও P.H.D ফলাফল আসেনি। স্যার আশুতোষ মুখার্জী দাদুকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়োগ করতে চাইলেন। কিন্তু তিনি বরোদায় Oriental Institute এর ডিরেক্টর পদে যোগ দেন ১৯২৪ সালে শুধু চ্যালেঞ্জ নেওয়ার

জন্য। ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত তাঁর সম্পাদনায় ১৩৪টি পুস্তক (সংস্কৃত ও পালি ধর্মগ্রন্থের উপর) প্রকাশিত হয়। মহারাজা তৃতীয় সয়াজিরাও তাঁর কাজের সন্তুষ্ট হয়ে প্রথমে রাজ্যরত্ন পড়ে জ্ঞানজ্যোতি উপাধিতে ভূষিত করেন।

বিনয়তোষ ভট্টাচার্য M.A পাশের পর বিবাহের তোড়জোড় চলে। শোনা যায়, স্যার আর এন মুখার্জি তাঁর মেয়ের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব দেন। তার সঙ্গে এটাও তিনি বলেন, 'আমার মেয়ে আধুনিক, সে ধূমপানে অভ্যস্ত। সেই জন্য কিছু টাকা আমি আমার মেয়েকে দেব'। এই কথা শুনে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও বিনয়তোষ ভট্টাচার্য দু'জনেই বেজায় রেগে যান। তাঁরা বলেন, 'এটা সমাজের যোগ্য নয়'। এর পরে বিয়ে ভেঙে যায়। সেই সময় ভারতে হোমিওপ্যাথির ব্যবহার বা প্রচার সেইভাবে ছিল না। দাদু হঠাৎ হোমিওপ্যাথির ওপর আস্থা ফিরে পান ও পড়াশোনা শুরু করেন। দিনে দিনে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। একসময় এত রোগী আসত যে তিনি খাওয়ার সময় পেতেন না। যদিও তথাকথিত ডিগ্রি তাঁর ছিল না। ওঁর এক বিশেষ পদ্ধতি ছিল--চৌম্বক আবেশের দ্বারা রোগ নির্ণয়।

তাঁর আর এক গবেষণার বিষয় ছিল সুদীর্ঘ জীবনে। তিব্বতের অনেকদিন বাঁচে কীভাবে সেটার পরীক্ষা করতে তিনি তিব্বত যান। সেখানে তিনি সাউন্ড ভাইব্রেটিয়া - এ স্ফটিক আলো বিচ্ছুরণ প্রত্যক্ষ করেন। ফিরে গিয়ে তিনি অনেক জায়গায় এর বিশ্লেষণ করেন। ডক্টর স্ট্যানলি তাঁর কাছে আসেন এবং এর আইডিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করেন। পরে তিনি আমেরিকা ফিরে যান এবং দাদুর সঙ্গে কথোপকথন চলতই এই নতুন বৈজ্ঞানিক ধারা নিয়ে।

পরবর্তীকালে দেখা যায় উনি রে এবং ভাইব্রেশন দিয়ে বহু রোগীকে সুস্থ করেছেন। অবসরপ্রাপ্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য নৈহাটির পৈত্রিক ভবনে রেডিওথেরাপির ওপর গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। তাতে অনেক লোক এই চিকিৎসায় উপকৃত হন। তাঁর মৃত্যুর পর ভারতের বহু জায়গায় এই থেরাপির ওপর কাজ ও কেন্দ্র স্থাপিত হয়।

বিনয়তোষ ভট্টাচার্য জ্যোতিষ শাস্ত্রেও অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন।

নেতাজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শৈলেন বোস প্রায়ই আসতেন হোমিওপ্যাথি ওষুধ নিতে। উনি অবশ্য নেতাজীর বিমান দুর্ঘটনার কথা বিশ্বাস করতেন না। উনি বলতেন, সুভাষচন্দ্রের মতো নেতা ভারতে ছিলেন বলেই চক্রান্ত হয়। একইসঙ্গে উনি দাদুকে বলতেন কোষ্ঠি বিচার করে বলে দিতে আসল ঘটনাটা ঠিক কী হয়েছিল।

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ছিলেন বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের ভাগ্নি। বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের পাণ্ডিত্য আর বহুমুখী প্রতিভার জন্য রবিশঙ্কর, উদয়শঙ্কর, অমলাশঙ্কররা আসতেন। ভারত সেবাশ্রম সংঘের শিবানন্দজী, অদ্বৈতানন্দজী মহারাজরা বছরে একবার বা দু'বার দেখা করতে আসতেন।

সংগীতশিল্পী হৈদয়াজ খাঁ বেশ কয়েকবার সদলবলে এসেছেন তাঁর বাড়িতে। বিনয়তোষ ভট্টাচার্য যখন অবসর নিয়ে নৈহাটিতে ফিরে যাচ্ছেন তখন তাঁর গাড়ির ড্রাইভারকে নিজের গাড়িটি দান করে আসেন পরবর্তী জীবনের জন্য।

জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সকল শাখায় নৈপুণ্য, সাহস, বোধশক্তি, বাগ্মি, কষ্টসহিষ্ণু, সৎ, ত্যাগ স্বীকার, কৃতজ্ঞতাবোধ এবং আত্ম সংযমী এই মানুষটিকে সাধারণ মানুষ দিনে দিনে ভুলে যেতে বসেছে। কিন্তু তিনি স্বমহিমায় দেবালোকে আনন্দে বিচরণ করছেন বলে আমরা মনে করি।

To :

HINDUSTAN PLYWOOD EMPORIUM

1942, V.S.S.MARG

SAKHIGOPINATH

SAMBALPUR - 768001

GSTN : 21AADPH6006J2Z7

আইনস্টাইন চিঠি না লিখলে বিদেশে যাওয়াই হত না সত্যেন্দ্রনাথ বোসের

'ওঁর আদর্শ, চিন্তাভাবনা, কাজ আমরা কিছুই নিতে পারিনি। যদি নিতে পারতাম তবে আমাদের এই অবক্ষয়টা হয়তো হত না— বর্তমানে যাঁরা শিক্ষক তাঁরা ছাত্রদের মোটিভেশন বা অনুপ্রেরণা দিতে পারছেন না। এখন সমাজে অনুপ্রাণিত করার লোকের বড়ো অভাব। তাই হয়তো এত অবক্ষয়, চারদিকে এত হাহাকার। আমাদের দেশে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের পরিকাঠামো ও প্রসার যা হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি।'— এই কথাগুলো যাঁর মুখ থেকে শুনছি তিনি ভারতের বিখ্যাত গণিতজ্ঞ বিজ্ঞানী ভারতরত্ন সত্যেন্দ্রনাথ বোসের সুযোগ্য সন্তান বিজ্ঞানী রমেন বোস।

রূপকথার পুজো বার্ষিকীর জন্য সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে এক অন্য অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হলাম আমরা। ধীর, শান্ত কিন্তু নিথর কথার দৃঢ়তার সঙ্গে আমাদের বলেন রমেন বসু, 'একবার বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ক্লাসে একটি প্রশ্ন করেন। তার উত্তর কোনও ছাত্রই দিতে পারেনি। তখন তিনি রেগে গিয়ে বলেন, তোমরা কী পড়াশোনা করছ যে একটা সাধারণ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারো না! তখন বাবা দাঁড়িয়ে বলেন, স্যার প্রশ্নটাই তো ভুল উত্তর দেব কী করে!' বাবা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন তখন তিনি শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুকে। যিনি বলেছিলেন, 'আমি ততদিন বেতন নেব না যতদিন না বিদেশিদের সমান সমান বেতন দেওয়া হবে'। বাবা শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন প্রফুল্ল রায়কে। এই সমস্ত মানুষের কাছ থেকে বাবা অনুপ্রেরণা পেতেন। বাবার শোওয়ার ঘরে দেওয়ালে দুটো ছবি লাগানো ছিল। একটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আর একটি আইনস্টাইনের। বিপ্লবী অবনীবাবু ছিলেন বাবার বন্ধু। বাবা অনুশীলন সমিতির সঙ্গেও যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। ৩০জন গোয়েন্দা বাবার সব খবর রাখত। আইনস্টাইন যদি নিজে চিঠি লিখে বাবাকে না ডাকতেন তাহলে বাবার বিদেশে যাওয়াই হত না।

আমাদের পরিবারের সঙ্গে সেই সময় ধুর্জুটি প্রসাদ, যামিনী রায়, বিষ্ণু দে, অতুল ঘোষের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ ছিল। ফলে ছোটো থেকেই বাংলার শিল্প ও সাহিত্য আমাদের মনে গেঁথে গিয়েছিল। আমরা সংস্কৃতির অভাব কোনোদিনই বুঝিনি। এখন চারদিকে যেসব ঘটনা ঘটে চলেছে, চারদিকে এত হাহাকার, এখানে ভালো লাগে না। তাই বহুদিন আগেই খবরের কাগজ পড়া বন্ধ করে দিয়েছি। টোকিওতে থাকাকালীন বাবা খেয়াল করেন, জাপানিরা জাপানি ভাষায় বিজ্ঞান সাধনা করেন কিন্তু আমাদের দেশে তা হয় না। বাবা তো সারাজীবন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান সাধনা করে গিয়েছেন। বাবা বলতেন, যাঁরা বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা করে না তাঁরা হয় বাংলা জানেন না আর না হয় বিজ্ঞান জানেন না। আসলে আমাদের শিক্ষা দফতর চায় না। শিক্ষা দফতর চাইলে আর অবশ্যই ছেলেরা যদি চায় তবে বাংলা ভাষাতেই বিজ্ঞান সাধনা করা যেতে পারে।

দেশের জন্য যতটা কাজ করা উচিত আমরা ততটা করে উঠতে পারি না। যেমন, আমিই দেশের জন্য কিছু করে উঠতে পারিনি। কিন্তু আমার বিদেশি স্ত্রী (সুস্মিতা দেবী) যখন আমাদের দেশে এলেন ও আমাদের দেশের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের প্রসারের জন্য বেশ কিছু কাজ করে গিয়েছেন। কলকাতার প্রথম অল্টারনেটিভ মেডিসিন নিয়ে কাজ করতেন। বেশ কিছু অনাথকে মানুষ করেছিলেন। ওঁর এক পালিত পুত্রকে তার দেশের বাড়ি ঘোরাতে নিয়ে যান। সেখানকার মানুষরা বলেন, মা তোমায় আমরা জমি দেব আমাদের একটা স্কুল করে দেবেন। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে পুরুলিয়ায় একটি স্কুল গড়ে তোলেন। বর্তমানে অবশ্য স্কুলটি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশনের অধীনে আছে। ২০২১ সালে ৮০ বছর বয়সে তিনি দেহ রাখেন। উনি একজন বিদেশি হয়ে এই দেশের শিক্ষা স্থায়ীত্বের প্রসারের জন্য যা করেছেন আমি এদেশের সন্তান হয়েও তা করে উঠতে পারিনি।

সাক্ষাৎকারের শেষে এসে ওঁকে বলা হল, আপনার ছেলেবেলার কথা আমাদের পাঠকদের জন্য বলুন। তাঁর সংক্ষিপ্ত উত্তর, 'বাবা আমাদের ওপর কোনো কিছু জোর করে চাপিয়ে দিতেন না। আমি স্কুল ফাইনাল পাশ করার পর বাবা বলেন, ফিজিক্স নিয়ে পড়তে কিন্তু আমি সহমত না হওয়ার জন্য বাবা জানতে চাইলেন আমি কী নিয়ে পড়তে চাই। আমি বললাম, ইঞ্জিনিয়ারিং। বাবা তখন সম্মতি দিয়ে বলেন, ঠিক আছে। ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে উনি আমায় পড়তে বলেন। পরে বুঝতে পেরেছিলাম বাবার ভাবনা কত সুদূরপ্রসারী ছিল।

বাবার কাছে নিজের ছেলে, পরের ছেলে, ছাত্র কেউ আলাদা নয়। সবাইকে সমান চোখে দেখতেন। বাবার ঘর সবার জন্য সবসময় খোলা থাকত। যে কেউ যখন খুশি বাবার কাছে যেতে পারত। সকলকে সমান ভাগ, সকলের জন্য চিন্তা করা এমন লোকের বড়ো অভাব আজ।

হাসির আড়ালে 'সিরিয়াস' ভানু

পর্দা ও মঞ্চ তাঁর অসাধারণ অভিনয়ের মাধ্যমে মাতিয়ে রাখার মতো কিংবদন্তি ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের গল্পও ছিল রঙিন ও নাটকীয়। নানা গল্পে ঠাসা। তাঁর ১০২ বছর জন্মবার্ষিকীতে সেসব কাহিনি একঝলক তুলে ধরা হল।

যদি একটু কিচেনে আসেন...

সামনেই ছবির শুটিং। সবাই নিজের কাজ সামলাচ্ছেন। আচমকা ঠিক হল দিল্লি যেতে হবে। সেখানে ছবির কিছু অংশ শুট করা হবে। ছবিতে রয়েছেন উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া দেবীর মতো তারকারা। তখন উত্তমকুমারের খ্যাতি মধ্য গগনে। দিল্লির হোটেলের বাইরে তাঁকে একঝলক দেখার জন্য ভিড়। এমন সময় হোটেলের কিচেনে গুঞ্জন শোনা গেল, একটু-একটু করে ভিড় বাড়ছে। ওঁরাও নিশ্চয়ই মহানায়কের ভক্ত? হোটেলের ম্যানেজার এগিয়ে এসে বললেন, না না ওঁরা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখার জন্য এরকম করছেন। তিনিও এ ছবিতে আছেন আর সবার সঙ্গে দিল্লি এসেছেন। কাজেই, 'যদি একটু কিচেনে আসেন'।

স্বাধীনতার একবছর আগে ভানু ও নীলিমার বিয়ে

১৯৪৫ সালের ঘটনা। সঙ্গীতশিল্পী সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় চলেছেন শ্রীরামপুর কোর্টে। সঙ্গে যাচ্ছেন অবিবাহিতা নীলিমা দেবী। রাস্তাতেই ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে গাড়িতে তুলে নিলেন সিদ্ধেশ্বর। তখন ভানু'র রোগাটে চেহারা, সিনেমার জগতে আসার জন্য লড়াই করছেন। আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানির অফিসে চাকরি করেন। গাড়ির মধ্যে দু'জনে এমন গল্প জুড়লেন, নীলিমা দেবীর উপস্থিতি সবাই ভুলে গেলেন। আদালতে গিয়ে তাঁদের গান পরিবেশনের পর শুরু হল ভানুর খেল। তাঁর হাসানোর ঠেলায় সবার প্রাণ ওষ্ঠাগত। আচমকা সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় নীলিমা দেবীর কাছে জানতে চাইলেন, 'ওকে বিয়ে করবি?' তারপর কথাবার্তা শুরু ও স্বাধীনতার ঠিক একবছর আগে বিয়ে করেন ভানু ও নীলিমা।

ভানু ও জহরের জুটিতে ৯০টির বেশি ছবি

বাংলা সিনেমার সবচেয়ে জনপ্রিয় নায়ক উত্তম কুমারের নাম নিয়ে কোনও ছবি হয়নি। অথচ কৌতুক অভিনেতা ভানুর নাম দিয়ে দু'টো ছবি হয়— ভানু পেল লটারি (১৯৫৮) ও ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট (১৯৭১)। ভানু ও জহর জুটিতে দর্শকরা প্রাণ খুলে হাসেন। 'চাটুজ্জে বাঁড়ুজ্জে', 'জয় মা কালী বোর্ডিং', 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ', আশিতে আসিও না', 'মিস প্রিয়ংবদা'র মতো আরও কিছু ছবি দেখে। দু'জনের জুটিতে ৯০টির বেশি ছবি হয়। এই জুটি নিয়ে ১৯৫৬ সালে 'আফ্রিকায় ভানু জহর' নামে একটা ছবি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু কোনো কারণে তা হয়ে ওঠেনি।

কালীঘাটের নেলোকে হুংকার ভানুর

রাসবিহারী মোড়ে আড্ডার জায়গায় একদিন এসে হাজির এলাকার ত্রাস 'নেলো'। সঙ্গে বেশ কয়েকজন সাগরেদ। এসেই ভানুকে জিজ্ঞেস করল, এই ছোকরা তোর নাম কী? ভানুও পাল্টা জানতে চাইলেন, তুই কে? অমন এক গুণ্ডার সামনে এরকম কথা বলা কেউ ভাবতেই পারেনি। নেলোও বুঝতে পারেনি প্রথমে। তারপর বুক বাজিয়ে হুংকার, 'আমি কালীঘাটের নেলো'। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'আমি ঢাকার ভুলো'। শুধু তাই নয়। একইসঙ্গে তাঁর হাতে উঠে এল দোকানের কয়লা ভাঙার হাতুড়িটাও। ওইদিনের বাকি গল্পটা জানা না গেলেও, এই নেলোই পরে ভানুভক্ত হয়ে ওঠেন। প্রায় একই ঘটনা ঘটে রাম চ্যাটার্জির সঙ্গে। চন্দননগরের নামকরা বাহুবলী নেতা, পরে মন্ত্রী হন। তাঁর নামে সবাই বাপ বাপ বলে। একদিন তাঁর সাগরেদরা ভানুকে এসে রীতিমতো শাসানি দিয়ে বলে, অমুক দিন রামদার ফাংশন, ঠিক সময়ে পৌঁছে যাবেন। এমন ঔদ্ধত্য দেখে ভানু নিজের রণমূর্তি ধারণ করলেন। বললেন, 'নিয়া যাইতে পারে তবে আমার লাশ নিতে লাগবে'। নেলোর মতো অবশ্য ভুল করেননি রাম চ্যাটার্জি। দিন দুয়েক পরে নিজেই ভানুর কাছে এসে ক্ষমা চেয়ে বলেন, ভানু না গেলে তাঁর মানসম্মান থাকবে না! শেষপর্যন্ত ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, রাম চ্যাটার্জির অনুরোধে ফাংশানে যান।

সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন, আমি ওঁর খুবই গুণগ্রাহী

বসুশ্রীতে সত্যজিৎ রায়ের 'সোনার কেল্লা' শোয়ের শেষে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে ভানুর জবাব ছিল, 'লেখাপড়া না জানলে উনি (সত্যজিৎ রায়) তাঁর ছবিতে পার্ট দেন না।' এটা শুনে অপ্রস্তুত সত্যজিৎ রায় তখনই 'না-না' বলে ওঠেন। এরপর সবিনয়ে বলেন, 'আমি ওঁর খুবই গুণগ্রাহী। উপযুক্ত রোল থাকলে অবশ্যই ভানুবাবুকে নেব'। মঞ্চে 'নতুন ইহুদি', সিনেমায় 'বসু পরিবার' আর 'সাড়ে চুয়াত্তর' ছবিতে ভানুকে দেখে নিজের মুগ্ধতার কথাও সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন। কিন্তু তাঁর ছবিতে শেষ পর্যন্ত ভানুর অভিনয়ের সুযোগ হয়নি। দু'জনের পরিচয় অবশ্য 'পথের পাঁচালি'র সময় থেকে। বসুশ্রীতে এই ছবি দেখে মন্টু বসুদের অফিসঘরে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। সত্যজিৎ তখন সেখানে বসে। ভানু তাঁকে চেনেন না। পরিচয় হতেই ভানু'র ভবিষ্যৎবাণী 'মশাই, করেছেন কী! আপনি তো কালে-কালে কাননদেবীর মতো বিখ্যাত হবেন!'

টেকনিশিয়ানদের পাশে ছিলেন ভানু

অন্যায়ের সঙ্গে কোনওদিন আপোশ করেননি ভানু। যেখানেই অন্যায় দেখেছেন প্রতিবাদ করেছেন। গত শতকের ছয়ের দশকের শেষের দিকে বাংলা সিনেমার জগতে শুরু হয় আন্দোলন। প্রযোজকদের বিরুদ্ধে টেকনিশিয়ানদের এই আন্দোলনে তাঁদের পাশে দাঁড়ান ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন তাঁরা সবাই মিলে তৈরি করেন 'অভিনেত্রী সংঘ'। সব ঠিকঠাক চলছিল, আচমকা ফাটল ধরে। উত্তম কুমারের মতো কয়েকজন সংগঠন থেকে বেরিয়ে গেলেন। প্রযোজকদের বিরুদ্ধে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের ছবিতে নিতে অস্বীকার করা হয়। ওই সময় ভানুর প্রথম হার্ট অ্যাটাক হয়। প্রযোজকদের সঙ্গে আপোশ তিনি মানতে পারেননি।

বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তের নির্দেশে গুপ্তচরের কাজ

কৈশোরে বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তের সান্নিধ্যে আসেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। সাম্যময় ওরফে ভানু'র দিদি প্রকৃতি বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন লীলা রায়ের স্বদেশী দল 'জয়শ্রী পার্টি'র সদস্য। আর সেই সমিতিতে দীনেশ গুপ্তের সঙ্গে পরিচয় হয় ভানু'র। ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। দীনেশদার সাইকেলে চেপে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন ভানু। এমনকী তাঁর আদেশে ঢাকার সদরঘাটে 'গুপ্তচর'এর কাজ করেন। ভানু'র দায়িত্ব ছিল সদরঘাটে কোথায় কোন পুলিশ যাচ্ছে, কে আসছে, কোন দিকে যাচ্ছে প্রভৃতি দীনেশ গুপ্তকে জানানো। এই দীনেশদার সঙ্গে ভানু চ্যাপলিনের 'গোল্ড রাশ' সিনেমা দেখেন।

ঢাকায় সত্যেন বসু'র জন্মদিন করতেন ভানু

ঢাকার জগন্নাথ কলেজে পড়ার সময় ভানুর শিক্ষকের তালিকায় ছিলেন কবি জসিমুদ্দিন, মোহিতলাল মজুমদার, মহম্মদ শহিদুল্লা ও রমেশচন্দ্র মজুমদার। ভানু বিএ ক্লাসের ছাত্র হলেও সত্যেন্দ্রনাথ বসুর পদার্থবিদ্যার ক্লাস শুনতে যেতেন। তখন থেকে দু'জনের সম্পর্ক। ঢাকায় থাকতে 'সত্যেনদা'র জন্মদিন পালন করতেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে কলকাতায় দেখা হলে ছাত্রের কাছে কলেজ জীবনের সব কমিক স্কেচ শুনতে চাইতেন মাস্টারমশাই। একবার সিদ্ধার্থশঙ্করের আমলে ভানু তখন সরকারি যাত্রা সম্মেলনের সদস্য হয়েছেন। বড়ো সম্মেলনের পরিকল্পনা হচ্ছে। বসুশ্রী সিনেমা হলের আলোচনায় বসে ভানু তরুণ সংস্কৃতিমন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের কাছে সম্মেলনের উদ্বোধনের জন্য সত্যেন বসুর নাম প্রস্তাব করেন। সেই মতো এক সরকারি আমলা বিজ্ঞানী সত্যেন বসুর বাড়ি যান ও আমন্ত্রণ জানান। প্রস্তাব শুনে সত্যেন বসু বলেন, ভানু থাকতে তিনি কেন উদ্বোধন করবেন। ওই আধিকারিক তাঁকে বোঝান ভানুর উদ্যোগে এটা হচ্ছে। প্রবীণ বিজ্ঞানী রাজি হননি, উল্টে তাঁকে রসগোল্লা খাইয়ে বলেন, 'এই যা খাচ্ছ, আমার কাছে এই গোল্লাই পাবে, প্রকৃত রসটা ভানুর কাছে রয়েছে'।

বাবা মাছ খেতে ভালোবাসতেন

(গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়, বড়ো ছেলে)

বাবার জন্ম ১৯২০ সালের ২৬ আগস্ট ঢাকার মৈসণ্ডিতে। ভালো নাম সাম্যময় বন্দ্যোপাধ্যায়। সবার কাছে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় নামে পরিচিত ছিলেন। আমরা তিন ভাইবোন। আমি বড়ো। মা নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সেকালের নামি সঙ্গীতশিল্পী। সিনেমা ও মঞ্চের অভিনয় নিয়ে বাবা এত ব্যস্ত থাকতেন, ছোটোবেলায় আমরা বাবাকে সেভাবে পাইনি। আমরা ঘুম থেকে ওঠার আগে বাবা বেরিয়ে পড়তেন। আবার রাতে আমরা ঘুমিয়ে পড়ার পর বাড়িতে ঢুকতেন। আমরা কে কোন ক্লাসে পড়ি তাও জানতেন না। তবে নিজের দায়িত্ব পালনে সচেতন ছিলেন। পর্দা আর মঞ্চে বাবা যতই হাসাতেন, বাড়িতে ছিলেন সিরিয়াস। ছোটোবেলায় আমরা তিন ভাই-বোন 'অর্ধাঙ্গিনী' বলে একটা ছবিতে অভিনয় করি। বোন অবশ্য পরে আরও কিছু ছবিতে অভিনয় করেছে। সিনেমায় আমাদের অভিনয়ের ক্ষেত্রে বাবা তেমন উৎসাহ দেখাতেন না। বলতেন, শিখে কাজ কর। বাবা খুব খাদ্যরসিক ছিলেন। মাছ খেতে খুব পছন্দ করতেন। আমাদের বাড়িতে তিন ধরনের মাছের পদ রান্না হত- ছোটো, মাঝারি ও বড়ো মাছ। সবজি খুব পছন্দ না করলেও বাঁধাকপি ও লাউয়ের নানা পদ পছন্দ করতেন। পূর্ববঙ্গের পদ তাঁর খুব পছন্দের ছিল।

বাবা সময়ের ব্যাপারে খুব সচেতন ছিলেন

(বাসবিঘটক বন্দ্যোপাধ্যায়, মেয়ে)

বাবা ছিলেন খুব সাধাসিধে মানুষ, অন্য পাঁচটা মধ্যবিত্ত পরিবারের বাবারা যেমন হয়। আমি যখন স্কুলে পড়তাম আমার বাবাকে নিয়ে বন্ধুদের খুব কৌতুহল ছিল। তারা প্রায় জানতে চাইত, বাবা বাড়িতে কিনা। কথাটা একদিন বাবাকে বলতে উনি বলেন, ওই বন্ধুর বাবা কী করেন? জবাবে বলেছিলাম, সার্জন। তখন বাবা ওই বন্ধুকে জিজ্ঞেস করতে বলেন, তাঁর বাবা কি বাড়িতেও অস্ত্রোপচার করেন? কারোর পেশা যেমন ডাক্তারি, ওকালতি তেমনি অভিনয়টাও আমার পেশা। বাবার সরলতার আর একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করি। বাবা বাড়িতে থাকলে লুঙ্গি পরে কালি গায়ে থাকতেন। বাবা-মা দু'জনে বাঙাল ভাষায় কথা বলতেন। একদিন বাড়িতে অতিথি আসায় মা বাঙাল ভাষায় বাবাকে বলেন, জামা পরতে। তখন বাবা জানতে চান কেন? আসলে অন্য লোকের কাছে অভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় হিসাবে জাহির করার তাঁর কোনো দায় ছিল না। তবে বাবা সময়ের ব্যাপারে খুব সচেতন ছিলেন। রাত ৯টার মধ্যে সবাইকে খাওয়ার টেবিলে চলে আসতে হত। দাদারা যখন অনেক বড় হয়ে যায়, তখনও এই নিয়ম মেনে চলতে হত।

অসুস্থ হলেই বাবার ওপর ভরসা করতেন উত্তমকুমার

উত্তমকুমারের সমসাময়িক আরেক জনপ্রিয় অভিনেতা ছিলেন শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়। অভিনয়ের বাইরে তিনি বাবা ও মানুষ হিসেবে কেমন ছিলেন, সেই গল্পই শোনালেন তাঁর বড়ো ছেলে শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়।

মানিক জ্যেঠু বলেছিলেন, একেবারে বাটি ছাঁট দিয়েছ শুভেন্দু!

বাবা যখন টপ ফর্মে, আমি তখন বেশ ছোটো। আমাদের বাড়ি ছিল রাজা বসন্ত রায় রোডে। তার কিছু দূরে ছিল আমার দাদামশাইয়ের বাড়ি। শনি-রবিবার হলেই আমি দাদুর বাড়ি চলে যেতাম। কারণ বাবা সাইকেল চালাতে দিতেন না। এদিকে, দাদুর বাড়ি এসবের জন্য ছিল স্বর্গভূমি। ছোটোবেলায় জন্মদিনে বাবা আমাকে যে সব বই উপহার দিতেন, তা মোটেই পছন্দ হত না। তিনি একটা বাচ্চা ছেলেকে উপহার দিচ্ছেন 'আইভ্যানহো' 'টেকনোলজি অফ ম্যানকাইন্ড' — ওসব তখন আমার কাছে দুর্বোধ্য ছিল। অবশ্য কখনও সখনও এই সব মোটা বইয়ের সঙ্গে 'ফেলুদা'র মতো বইও দিতেন। এক একবছর দাদামশাই মা, মামা, পরিবারের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে যেতেন। বাবা আমাদের সঙ্গে যেতে পারতেন না, পরে শুটিং শেষ করে এসে যোগ দিতেন। বাবা অন্যান্য ব্যাপারে কড়া হলেও সিনেমা দেখার ব্যাপারে ছিলেন খুব উদার। মনে আছে, ১৯৭৯ সালে 'ক্র্যামার ভার্সেস ক্র্যামার' রিলিজ হওয়ার পর বাবা আমাকে গ্লোব সিনেমা হলে নিয়ে গিয়েছিলেন দেখাতে। ছবিটা প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ব্যাপারটা জানতে পেরে মা ভীষণ রেগে গিয়ে বলেছিলেন, 'পোস্টারে বড়ো বড়ো করে এ লেখা আছে, আর সেই ছবি কিনা বাচ্চা ছেলেকে দেখালে'? উত্তরে বাবা বলেছিলেন, ভালো ছবি দেখা উচিত। অনেকেই জানেন না, 'জয় বাবা ফেলুনাথ' —এ রুকুর চরিত্রটা আমার করার কথা ছিল। বাবার কাছ থেকে মানিক জ্যেঠুর প্রস্তাব শুনে মা ভীষণ রেগে গিয়েছিলেন। মা মনে করেছিলেন, সিনেমা করলে আর পড়াশোনা হবে না। তাই আমার চুল এমনভাবে কেটে দেন যে, তা দেখে বাবার মাথায় হাত! তুমুল ঝগড়া হল বাবা-মার। পরের দিন মানিক জ্যেঠুর বাড়িতে কাঁচুমাচু মুখ করে বাবা আমাকে নিয়ে গেলেন। আমাকে দেকে মানিক জ্যেঠু বলেছিলেন, 'একেবারে বাটি ছাঁট দিয়েছ শুভেন্দু! আমার হাতে তো আর সময় নেই'।

বাবার কথার চেয়ে রেডিয়োর গান কানে বেশি ঢুকত

বরাবর আমি পড়াশোনায় ফাঁকিবাজ। একবার হোম ওয়ার্কে পেলাম জিরো। মা তো বাড়ি মাথায় করলেন। বাবার কানে ব্যাপারটা যেতে, গম্ভীরভাবে তিনি বললেন, 'তোমার মা রত্নগর্ভা। আমি তোমার মার জন্য গর্ববোধ করি। হোম ওয়ার্কে কেউ জিরো পায়, আজ অবধি শুনিনি। একে ওকে জিজ্ঞেস করেও তো লিখে দিতে পারতিস। সেটুকু চেষ্টাও করিসনি'! সেই জিরো পাওয়ার জন্যে বাবা আমাকে গ্র্যান্ড হোটেলে খাওয়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন। তখন বাবা বলেছিলেন, এই যে চৌরঙ্গী চৌরঙ্গী শুনিস, এই দ্যাখ সেই শাজাহান হোটেল! বড়ো অদ্ভুত ছিলেন বাবা! বাবাই শিখিয়েছিলেন ভগবান দুটো কান দিয়েছেন, একটা শোনার জন্য অন্যটা বের করে দেওয়ার জন্য। বাবার এই শিক্ষা প্রয়োজনে বাবার ওপরেই প্রয়োগ করেছি। প্রতিদিন কাজ শেষ করে বাবা বাড়িতে ঢুকতে না ঢুকতেই মা আমার সম্পর্কে ওঁকে অভিযোগ করতেন। লুকিয়ে দেখতাম, বাবা শুনছেন, কিন্তু কোনো উত্তর করতেন না। ভাবখানা এমন যেন তিনি ঘরে নেই। মা কিন্তু বলে যাচ্ছেন। ফ্রেশ হয়ে বাবা ছাদে চলে যেতেন এবং রেডিয়োয় গান শুনতেন। ধীরে সুস্থে বোঝাতেন, জীবনদর্শন নিয়ে কথা বলতেন। তখন আমি বাবার শেখানো অস্ত্রটাই প্রয়োগ করতাম। বাবার কথার চেয়ে রেডিয়োর গান আমার কানে বেশি ঢুকত।

বাবা প্রফেশনালি ডাক্তারিটা করেননি

চিড়িয়াখানার শুটিংয়ের সময় একদিন ফ্লোরে অসুস্থ হয়ে পড়েন উত্তমকুমার। বাবা বুঝতে পারেন হার্ট অ্যাটাক হয়েছে কিন্তু তিনি তা উত্তমকুমারকে না বলে প্রাথমিক ওষুধ খাইয়ে ডাক্তার সুনীল সেনকে ডেকেছিলেন। শোনা যায়, তারপর থেকে অসুস্থ হলেই বাবার ওপর ভরসা করতেন উত্তমকুমার। আমি একবার চোখের সামনে বাবাকে দেখেছিলাম ডাক্তারি করতে। তখন আমার ভাই কোলের শিশু। ঝিনুক দিয়ে দুধ খাওয়াচ্ছিলেন ঠাকুমা। বেকায়দায় দুধ ওর শ্বাসনালিতে ঢুকে যায়। দমবন্ধ হয়ে নীল হয়ে যায় ভাই। বাবা দৌড়ে এসে ভাইকে থাবড়ে, প্রেশার দিয়ে দুধ বার করেন। বাবা কিন্তু ঠাকুমাকে কিছু বলেননি। শুধু বলেছিলেন, 'কাল থেকে এ বাড়িতে ঝিনুক বন্ধ। ফিডিং বোতলে খাওয়াবে। আরে, খিদে পেলে কুকুরের বাচ্চাও কেড়ে খায়। এ তো মানুষের বাচ্চা! বলতে পারবে, বোঝাতে পারবে'। বাবা প্রফেশনালি ডাক্তারিটা করেননি ঠিকই কিন্তু পুরোদস্তুর ডাক্তারিটা ঝেড়ে ফেলতে পারেননি। একদিন খবর এল, বুম্বাদা (প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়) ফ্লোরে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। বাবা খবরটা শুনেই বললেন, 'চল, বুম্বাকে ঝেড়ে আসি'। বুম্বাদা চুপচাপ শান্ত ছেলেটি হয়ে বাবার উপদেশ শুনলেন।

বাবার পকেট থেকে সিগারেট চুরি করেছি

একসময় বাবা খুব ধূমপান করতেন। আমি সদ্য সিগারেট খেতে শিখেছি। বাবার পকেট থেকে সিগারেট চুরি করছি। বাবা একদিন বললেন, 'আমি বুঝতে পারছি, ঠোঁটে সিগারেট ঝুলিয়ে রাখলে নিজেকে উত্তমকুমার মনে হয়। ওটা ঝুলিয়ে রাখিস, টানিস না'!

বাবাকে দেখে অমিতাভ, আরে দাদা, আপ...

১৯৭৯ সালে বন্যা ত্রাণের ফান্ড তোলার জন্য ইডেনে হয়েছিল বলিউডের তারকাদের সঙ্গে বাংলার শিল্পীদের ক্রিকেট ম্যাচ। বাবাকে বলে রেখেছিলাম, আমার কিন্তু অমিতাভ বচ্চনের অটোগ্রাফ চাই-ই-চাই। বাবা কথা রেখেছিলেন। ইডেনের ড্রেসিংরুমে নিয়ে গেলেন। দেখি, অমিতাভ বচ্চন ও রেখা পাশাপাশি বসে আছেন। বাবাকে দেখে অমিতাভ, 'আরে দাদা, আপ! আইয়ে, আইয়ে' বলে উঠে দাঁড়িয়ে প্রণাম করলেন। আমি তো মন্ত্রমুগ্ধ। আমিতাভ ও রেখা দু'জনের অটোগ্রাফ নেওয়ার পর বেরিয়ে আসার সময় দেখি, দরজা ঠেলে ঢুকলেন বিনোদ খান্না। তাঁর দিকেও অটোগ্রাফের খাতা বাড়িয়ে দিলাম। তখনই ঢুকলেন আরেক অভিনেত্রী। যিনি আমার পছন্দের তালিকায় ছিলেন না। তাই তাঁকে এড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করতেই বাবা পেছন থেকে আমার হাতটা টেনে অভিনেত্রীর দিকে বাড়িয়ে দিলেন। তিনিও হাসিমুখে অটোগ্রাফ দিলেন। দরজার বাইরে বেরিয়ে এসে বাবা কড়া গলায় বলেন, 'তুই যখন পাঁচজনের সই নিচ্ছিস, তখন উচিত ছিল ওঁরটাও নেওয়া! কাউকে বাদ দেওয়া কখনও ভদ্রতা হতে পারে না। তুমি কাউকে এমন করে অপমান করতে পারো না'। পদে পদে এমন অনেক ছোটো ছোটো জিনিস বাবা শিখিয়েছেন আমাদের দুই ভাইকে।

আমাকে নিয়ে চিন্তা

তখন কলেজে পড়ি। নাইট কলেজে। সারা সকাল ক্রিকেট, ফুটবল নিয়ে মেতে থাকতাম। বাবা দেখতেন, আর বলতেন, পাড়ার ক্রিকেট খেলে কেউ গাভাসকর হতে পারে না। আমি বলতাম গাভাসকার হতে কে চেয়েছে? আনন্দ হয়, তাই খেলি। ভাই পড়াশোনায় বরাবরই ভালো। ওর কেরিয়ার নিয়ে বাবা-মার চিন্তা ছিল না। চিন্তা ছিল আমাকে নিয়ে। একদিন সকালে বাবা তাঁর লাল-সাদা ইতালিয়ান ফিয়েটে বসিয়ে নিয়ে গেলেন বাইপাসের ধারে এক রিসর্টে। সেখানে গিয়ে বিয়ার অর্ডার দিলেন। তারপর প্যাডেল বোটে করে নিয়ে গেলেন রিসর্ট লাগোয়া ঝিলের মাঝে। বোট থামিয়ে জানতে চাইলেন, 'জীবনে কী করতে চাস তুই'? ফস করে বললাম, অভিনয়। 'তুই কি অভিনয় জানিস'? আমার ভাবটা এমন ছিল যে, অভিনয় জানার কী আছে! তাই বললাম, 'ও ঠিক হয়ে যাবে'। বাবা তখন বিভিন্ন উদাহারণ দিয়ে বুঝিয়েছিলেন, অভিনয়টা এমনি এমনি হয় না, শিখতে হয়। এরপর চার্বাক-এ ভরতি করে দিয়েছিলেন। মনে আছে, প্রথম দিন ঘর মুছেছিলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বাবাই বোধহয় জোছন দস্তিদারকে বলেছিলেন, একে একেবারে ছাড়বে না। বেশ অনেক দিন পরে ঘরের টেবিলে বাবার লেখা একটা চিরকুট পেয়েছিলাম, 'ইন্টারেস্টিং ক্যারেকটারাইজেশন'। আমার একটা টেলিফিল্ম দেখে রিক্যাকশন দিয়েছিলেন বাবা।

With Best Compliments from...

All Well Wisher

Subhankar Saha

রবীন্দ্রনাথও শরৎচন্দ্রের লেখার ভূয়সী প্রশংসা করতেন

জয় চট্টোপাধ্যায়, নাতি

আমার বাবা অমল কুমার চট্টোপাধ্যায় ছিলেন অমর কথাশিল্পী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভাইপো, সেই সূত্রে আমি তাঁর নাতি। এই বংশের উত্তরাধিকার হিসাবে গর্বিত।

বাংলা সাহিত্যের অপরাজেয় ও অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্প ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে গিয়েছেন। জনপ্রিয়তার দিক থেকে শরৎচন্দ্র আজও সবার ওপরে। ফরাসি ঔপন্যাসিক রোমেইন রোল্যান্ড শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত পড়ে বলেছিলেন, 'নোবেল পুরস্কার পাওয়ার মতো উপন্যাস। তাঁর সাহিত্যকৃতী নিয়ে নতুন কিছু বলার মতো ধৃষ্টতা আমার নেই। পৃথিবীতে যতদিন শরৎ সাহিত্য থাকবে, ততদিন পাঠকদের মনে শরৎচন্দ্র অমর হয়ে থাকবেন'।

হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে ১৮৭৬ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথা সাহিত্যিক অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের জন্ম। বাবার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায় ও মায়ের নাম ভুবনমোহিনী দেবী। তাঁরা ছিলেন ছয় ভাইবোন। সবার বড়ো বোন অনিলা, তারপর শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্রের পর দুই ভাই তারপর দুই বোন। শরৎচন্দ্রের বাবা মতিলাল চট্টোপাধ্যায় ছিলেন উদাসী প্রকৃতির মানুষ। পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁর খ্যাতি ছিল। গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটক রচনা করতেন। কিন্তু কোনওটাই শেষ করতে পারেননি। সংসারের প্রতি উদাসীন ছিলেন। অনটন ছিল নিত্য সঙ্গী। তাই শরৎচন্দ্রের ছেলেবেলা কেটেছে অভাব অনটনে। পরে কিশোর বয়সে ভাগলপুরের মামার বাড়িতে থাকতে হয়েছিল তাঁকে। শরৎচন্দ্র ছোটোবেলায় খুব দুরন্ত ছিলেন। তাঁর ডাকনাম ছিল ন্যাড়া। তিনি ভালো গান গাইতেন ও অভিনয় ক্ষেত্রেও আগ্রহ ছিল।

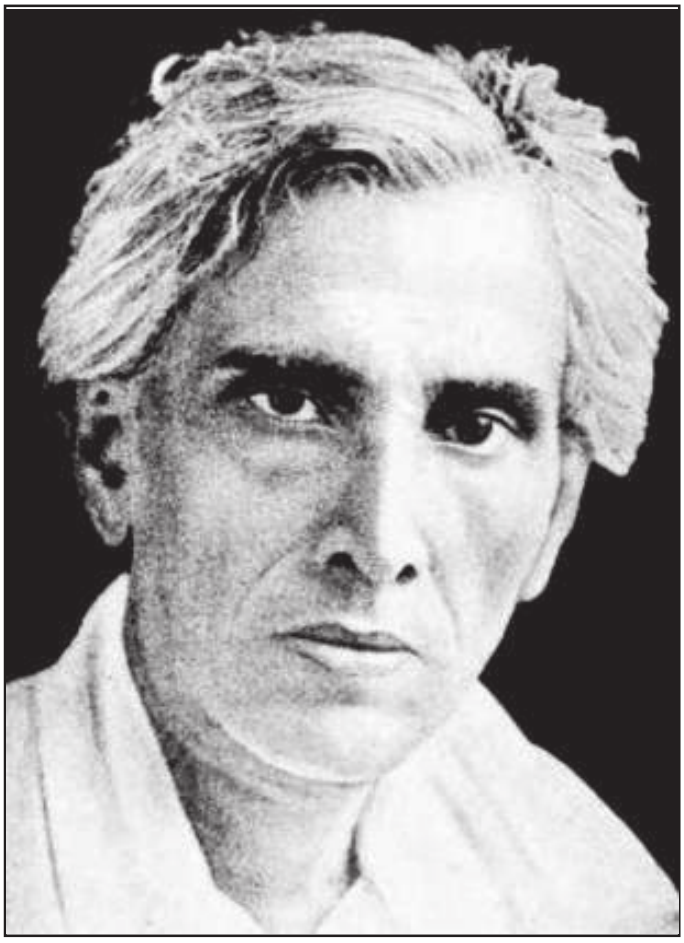

শরৎচন্দ্রের পাঁচ বছর বয়সে মতিলাল তাঁকে দেবানন্দপুরের প্যারী পণ্ডিতের পাঠশালায় ভর্তি করে দেন, সেখানে তিনি ২-৩ বছর পড়াশোনা করেন। এরপর ভাগলপুর শহরে থাকার সময়ে তাঁর মামা স্থানীয় দুর্গাচরণ বালক বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন। ১৮৮৭ সালে শরৎচন্দ্র ভাগলপুরের জেলা স্কুলে ভর্তি হন। ১৮৮৯ সালে মতিলালের ডিহিরির চাকরি চলে গেলে তিনি তার পরিবার নিয়ে দেবানন্দপুরে ফিরে গেলে শরৎচন্দ্র জেলা স্কুল ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এই সময় শরৎচন্দ্র হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুলে ভর্তি হন, কিন্তু ১৮৯২ সালে দারিদ্র্যের কারণে স্কুলের ফি দিতে না পারার কারণে তাঁকে এই বিদ্যালয়ও ছাড়তে হয়। এই সময় তিনি কাশীনাথ ও ব্রহ্মদৈত্য নামে দুটো গল্প লেখেন। ১৮৯৩ সালে মতিলাল ফের ভাগলপুরে ফিরে গেলে প্রতিবেশী সাহিত্যিক তথা তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় পড়াশোনার প্রতি শরৎচন্দ্রের আগ্রহ দেখে তাঁকে ওই স্কুলে ভর্তি করে নেন। এই স্কুল থেকে ১৮৯৪ সালে দ্বিতীয় বিভাগে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করে তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজে ভর্তি হন। এই সময় শরৎচন্দ্র মাতামহের ছোটো ভাই অঘোরনাথের দুই ছেলে সুরেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথকে প্রতি রাতে পড়াতেন, তার বিনিময়ে অঘোরনাথ তাঁর কলেজে পড়ালেখার টাকা জোগাতেন। এসব সত্ত্বেও এফএ পরীক্ষার ফি জোগাড় করতে না পারার জন্য তিনি পরীক্ষায় বসতে পারেননি।

কলেজ ছাড়ার পর শরৎচন্দ্র ভাগলপুর শহরের

আদমপুর ক্লাবের সদস্যদের সঙ্গে খেলাধুলো ও অভিনয় করে সময় কাটাতেন। এই সময় প্রতিবেশী বিভূতিভূষণ ভট্টের বাড়ি এক সাহিত্যসভার আয়োজন হয়। এরপরই তিনি বড়দিদি, দেবদাস, চন্দ্রনাথ, শুভদা প্রভৃতি উপন্যাস আর অনুপমার প্রেম, আলো ও ছায়া, বোঝা, হরিচরণ ইত্যাদি গল্প লিখেছিলেন বলে শোনা যায়। ওই সময় শরৎচন্দ্র বনেলী রাজ এস্টেটে কিছুদিন চাকরি করেন। কিন্তু বাবার ওপর কোনো কারণে অভিমানবশত তিনি সন্ন্যাস নিয়ে ঘর ছেড়ে চলে যান। এরপর বাবার মৃত্যু হলে তিনি ভাগলপুরে ফিরে এসে বাবার শ্রাদ্ধ শেষ করে কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সেখানে শরৎচন্দ্র কলকাতা উচ্চ আদালতের উকিল লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে হিন্দি বইয়ের ইংরেজি তর্জমা করার জন্য মাসে ৩০টাকা বেতনের চাকরি পান। ওই সময় শরৎচন্দ্র 'মন্দির' নামে একটা গল্প লিখে 'কুন্তলীন' প্রতিযোগিতায় পাঠালে তা বিজয়ী ঘোষিত হয়। এটাই শরৎচন্দ্রের মুদ্রিত প্রথম গল্প। ছয় মাস ওই বাড়িতে কাটানোর পর শরৎচন্দ্র ১৯০৩ সালের জানুয়ারি মাসে রেঙ্গুনে লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের ভগ্নিপতি উকিল অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে চলে আসেন। অঘোরনাথ তাঁকে বর্মা রেলওয়ের অডিট অফিসে একটা অস্থায়ী চাকরির ব্যবস্থা করে দেন। দু' বছর পর চাকরি চলে গেলে শরৎচন্দ্র তাঁর বন্ধু গিরীন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্গে পেগু চলে যান ও সেখানে অবিনাশ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে থাকতে শুরু করেন। ১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে বর্মার পাবলিক ওয়ার্কস অ্যাকাউন্টস অফিসে ডেপুটি একজামিনার মণীন্দ্রনাথ মিত্রের সাহায্যে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে এক অফিসে চাকরি পান। ১০ বছর ধরে তিনি ওই চাকরি করেন। ১৯৯২ সালের অক্টোবর মাসে শরৎচন্দ্র এক মাসের ছুটি নিয়ে দেশে ফিরে এলে 'যমুনা' নামে এক পত্রিকার সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল তাঁকে পত্রিকার জন্য লেখা পাঠাতে অনুরোধ করেন। সেই অনুযায়ী শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে ফিরে গিয়ে রামের সুমতি গল্পটি পাঠিয়ে দেন বলে শোনা যায়। যা যমুনা পত্রিকায় ১৩১৯ সালে ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এরপর তিনি ভারতবর্ষ পত্রিকার জন্য লেখা পাঠাতে শুরু করেন। ফণীন্দ্রনাথ পাল তাঁর উপন্যাস 'বড়দিদি' বই আকারে প্রকাশ করেন। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স ও উরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স উপন্যাসগুলো পুস্তক আকারে প্রকাশ করেন। ১৯১৬ সালে অফিস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ছুটি নিয়ে মনোমালিন্যের কারণে শরৎচন্দ্র চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে রেঙ্গুন ছেড়ে বাংলায় ফিরে আসেন।

বৈবাহিক জীবন

শরৎচন্দ্র যখন বার্মা রেলের হিসাব পরীক্ষকের চাকরি করতেন, তখন রেঙ্গুনের উপকণ্ঠে বোটাটং পোজনডং অঞ্চলে কলকারখানার মিস্ত্রিদের পল্লিতে থাকতেন। তাঁর বাসার নীচে শান্তিদেবী নামে এক ব্রাহ্মণ মিস্ত্রির মেয়ে থাকতেন। মেয়েটির বাবা এক মদ্যপের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করলে শান্তিদেবী শরৎচন্দ্রকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে অনুরোধ করায় তিনি মেয়েটিকে বিয়ে করতে বাধ্য হন। তাঁদের এক ছেলে হয়। কিন্তু রেঙ্গুনের প্লেগে আক্রান্ত হয়ে শান্তিদেবী ও তাঁদের ১ বছরের ছেলের মৃত্যু হয়। এর অনেক দিন পরে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে কৃষ্ণদাস অধিকারী নামে এক ভাগ্যান্বেষী ব্যক্তির অনুরোধে তাঁর ১৪ বছরের মেয়ে মোক্ষদাকে বিয়ে করেন। বিয়ের পর তিনি মোক্ষদার নাম রাখেন হিরন্ময়ী দেবী। তাঁরা নিঃসন্তান ছিলেন। সন্তান না থাকায় শরৎচন্দ্রের স্নেহবাৎসল্য গিয়ে পড়েছিল পশুপাখিদের ওপর।

স্বদেশিদের সঙ্গে যোগাযোগ

স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গেও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। প্রকাশ্যে নানা রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হয়েছিলেন। পরে বীতশ্রদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে সরে আসেন। স্বদেশি যুগে তাঁর 'পথের দাবী' উপন্যাসটি দেশজুড়ে সাড়া ফেলেছিল। বাংলার বিপ্লববাদের সমর্থক অভিযোগ তুলে ব্রিটিশ সরকার এই উপন্যাস ১৯২৫ সালে বাজেয়াপ্ত করেছিল। বলাবাহুল্য, ওই সময়ের জাতীয়তাবাদী নানা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁর গুণগ্রাহী ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।

শেষ জীবন

মাঝবয়সে এসে শরৎচন্দ্র হাওড়া জেলার পানিত্রাস (সামতাবেড়) গ্রামের মাটির বাড়িতে থাকতে শুরু করেন। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের দেউলটি স্টেশন থেকে চার-পাঁচ কিলোমিটারের পথ সামতাবেড়ের বাড়িটা রূপনারায়ণ নদের তীরে এক মনোরম পরিবেশে অবস্থিত। পরে শরৎচন্দ্র শিবপুরেও থাকতেন। শিবপুর ব্যাতাইতলা বাজার থেকে চ্যাটার্জিহাট পর্যন্ত রাস্তা শরৎচন্দ্রের নামেই চালু রয়েছে। ১৯৩৭ সাল নাগাদ শরৎচন্দ্র প্রায়ই অসুস্থ থাকতেন। ডাক্তারদের পরামর্শে দেওঘরে তিন-চার মাস কাটিয়ে কলকাতায় ফিরে এলে ফের অসুস্থ হয়ে পড়েন। ওই সময় তাঁর যকৃতের ক্যান্সার ধরা পড়ে। বিধানচন্দ্র রায়, কুমুদশঙ্কর রায় প্রমুখ ডাক্তারার তাঁর অপারেশনের পক্ষে মত দেন। চিকিৎসার জন্য তাঁকে প্রথমে দক্ষিণ কলকাতার সাবার্বান হসপিটাল রোডের একটা নার্সিংহোমে ও পরে ৪ নম্বর ভিক্টোরিয়া টেরাসের পার্ক নার্সিংহোমে ভরতি করা হয়। ১৯৩৮ সালের ১২ জানুয়ারি শল্য চিকিৎসক ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অস্ত্রোপচার করেন, কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। ৪ দিন পরে ১৬ জানুয়ারি সকাল দশটায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

শরৎচন্দ্রের প্রথম ছাপা গল্প 'মন্দির'। তিনি ২০টা উপন্যাস, ৪টে নাটক, ১২টা প্রবন্ধ ও ২১টা ছোটো গল্প লিখেছিলেন। তাঁর সৃষ্টি নিয়ে প্রায় ৫০টা সিনেমা নানা ভাষায় হয়। তার মধ্যে 'দেবদাস' বাংলা, হিন্দি ছাড়াও তেলেগু ভাষায় ৮ বার হয়। সাহিত্যে অমর সৃষ্টির জন্য তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'জগত্তারিনী', ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডি লিট উপাধি দেন। শরৎচন্দ্র সাহিত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে গুরুর মর্যাদা দিতেন। তিনি একবার বলেছিলেন, 'আমরা পড়ি রবীন্দ্রনাথের লেখা আর অন্যরা পড়েন আমার লেখা'। রবীন্দ্রনাথও তাঁকে খুব স্নেহ করতেন ও তাঁর লেখার ভূয়সী প্রশংসা করতেন।

শোনা যায়, শরৎচন্দ্র তাঁর জীবনে দেখা চরিত্রগুলোই লেখায় তুলে ধরতেন, তাই এত জীবন্ত হত সব চরিত্র। দাদুর স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছি। তাঁর বসতবাড়ি হেরিটেজ হিসাবে ঘোষণা হয়েছে। আমার কলকাতার বাড়িতে দাদুর স্মৃতি চিহ্ন হিসাবে রয়েছে তাঁর প্রিয় গড়গড়া।

সময়ের থেকে এগিয়ে ছিলেন আশুতোষ

একটা রাস্তা, একটা কলেজ, দুটো সভাগৃহ আর দুটো হলঘর- নতুন প্রজন্ম কি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বলতে এইটুকুই বোঝে? কোনো ক্যুইজে প্রশ্ন এলে উত্তর তৈরি থাকে ঠোঁটের গোড়ায়। 'বাংলার বাঘ' কাকে বলা হয়? উত্তর, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে। সত্যি তাই। এর বেশি কিছু আর নতুন প্রজন্ম তেমন জানেই না স্যার আশুতোষ সম্পর্কে।

'কাজ, কীর্তিতে ভরা ওঁর বিরাট বহির্অঙ্গের আলোচনাই সব জায়গায়, অন্তরঙ্গ আশুতোষকে জানে না তেমন কেউই।' বললেন রিনা ভাদুড়ি। আশুতোষ-কন্যা অমলার মেয়ে এই শহরে আশুতোষ-চর্চা ও গবেষণার ধারা বয়ে নিয়ে চলেছেন প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে। দাদুকে অবশ্য তিনি পাননি। কিন্তু একজন শিক্ষাবিদ ও গবেষক হিসাবে তিনি চান নতুন প্রজন্ম স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অন্তরঙ্গ বিষয়টা নিয়ে বেশি চর্চা ও আলোচনা করুক। একজন শিক্ষাবিদ হিসাবে তিনি স্যার আশুতোষের দু'টো গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাণ্ডারি ও শিক্ষার উন্নতি

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'দফায় উপাচার্য ছিলেন। ১৯০৬ সালে তাঁকে যখন উপাচার্য করল ব্রিটিশ সরকার, তখন বঙ্গভঙ্গের বয়স এক বছর। লর্ড কার্জনের ইউনিভার্সিটি কমিশন আর ইউনিভার্সিটি অ্যাক্টের তীব্র প্রতিক্রিয়া বাংলার সুশীল সমাজে। জাতীয় শিক্ষা কমিশন তৈরি হয়েছে, ব্রিটিশ বিরোধিতাও তুঙ্গে। ওই পরিস্থিতিতে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা দুটোর জন্যই টাকার দরকার। তারকানাথ পালিত, রাসবিহারী ঘোষ সহ বহু বিদ্যোৎসাহী ও অর্থবান মানুষের থেকে দান-অনুদান জোগাড় করেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। পাঠ্যসূচি সংস্কার করলেন, স্নাতকোত্তরে খুললেন নতুন নতুন বিষয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ব, ফলিত রসায়ন, প্রাচীন ভারত ও ইসলামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতির মতো বিষয়ের শুরু তাঁর আমলেই। পরীক্ষার প্রশ্নে তিনি প্রথমবার 'অথবা' এনেছিলেন। দীনেশচন্দ্রের বইটা পড়লে জানা যায়, এর আগে যা প্রশ্ন আসত সবই লিখতে হত পরীক্ষার্থীকে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সেই প্রথম দীর্ঘদিনের নিয়মকে পালটে ফেলেছিলেন। আর নিয়ম করে দেন, পড়ুয়াদের জন্য করা প্রশ্ন, প্রশ্নকর্তার পাণ্ডিত্য পরিমাপের জায়গা নয়। বিশ্ববিদ্যালয় ফেল করার কারখানাও নয়। পাশের হার বাড়তে লাগল হুহু করে। শিক্ষার্থীদের মুখে হাসি ফুটল। পৃথিবীর সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মানচিত্রে গর্বের সঙ্গে জায়গা করে নিয়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

শুধু নতুন বিভাগ খোলেন তাই নয়, উপযুক্ত শিক্ষকও আনেন তিনি। পদার্থবিদ্যায় সিভি রমণ, রসায়নে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে নিয়ে এলেন পড়াতে। গণেশ প্রসাদ, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, কে না ছিলেন সেই তালিকায়! এম এ পাশ করার পরই সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে এম এ ক্লাসে পড়ানোর ভার দিয়েছিলেন। দর্শনের চেয়ার-অধ্যাপক করে বসিয়ে দিয়েছিলেন দক্ষিণী তরুণকে- নাম সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণান। অক্সফোর্ডের অধ্যাপক পল ভিনোগ্রাডফ, বন ইউনিভার্সিটির সংস্কৃতের প্রফেসর হার্মান জেকবি, ফরাসি অধ্যাপক সিলভাঁ লেভি- সবাই এসেছেন আশুতোষের ডাকে সাড়া দিয়ে। শিক্ষার পাশাপাশি গুরুত্ব দিতেন গবেষণাকে। তাঁর উদ্যোগে তৈরি হয় ক্যালকাটা ম্যাথমেটিক্যাল সোসাইটি, চালু হয় ইউনিভার্সিটি কলেজ, রাজাবাজার সায়েন্স কলেজের দুয়ার খুলেছিল, তাঁরই সৌজন্যে।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মানেই গণিত শাস্ত্র। যেখানে অসাধারণ বুৎপত্তি ছিল। স্কুল জীবনে কেমব্রিজ মেসেঞ্জার অফ ম্যাথম্যাটিক্সে তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৮০ সাল থেকে ১৮৯০ সালের মধ্যে উচ্চতর গণিত নিয়ে প্রায় ২০টা মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন, সেগুলো প্রকাশিত হয়েছিল নানা গবেষণামূলক পত্রিকায়। ১৯০৮ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'ক্যালকাটা ম্যাথমেটিক্যাল সোসাইটি'।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নাতনি রিনা ভাদুড়ীর মতে, স্যার আশুতোষের সবচেয়ে অনালোচিত দিক হল, বাংলা ভাষা ও তার ব্যবহারে আশুতোষের ভূমিকা। এই বাংলা নিয়ে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চিন্তাভাবনার নমুনা লিখে গিয়েছেন দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'আশুতোষ-স্মৃতিকথা' গ্রন্থে। আশুতোষ মুখার্জিকে চিনতে হলে এই বই পড়া অবশ্যই জরুরি।

গবেষক রিনা ভাদুড়ির কথায়, 'ক'জন জানেন, সমাজে ওই সময়ের বিরুদ্ধে গিয়ে বিধবা বড়ো মেয়ে কমলার ফের বিয়ে দিয়েছিলেন আশুতোষ! জল ঘোলা কম হয়নি। ছোটো মেয়ে রমলার বিয়ের সম্বন্ধ এলে পাত্রপক্ষ কমলার প্রসঙ্গ টেনে তাঁকে প্রায়শ্চিত্তের কথা বলেছিলেন। আশুতোষ উড়িয়ে দিয়েছিলেন সে প্রস্তাব!'

আসলে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন সময়ের থেকে এগিয়ে।

কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তর কলকাতার বইপাড়া কলেজ স্ট্রিটে কফি হাউস যুগ যুগ ধরে এক ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। বাঙালির জমাটি আড্ডার এই জায়গা অন্য সব কফি হাউসের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন। আদতে এটি ইন্ডিয়ান কফি হাউসের একটি স্থানীয় শাখা। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্টোদিকে অবস্থিত কফি হাউসটি কলকাতার সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। কলেজ পড়ুয়া থেকে শুরু করে শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, গীতিকার, সুরকার ও নাট্যকার তথা শিল্প-সাহিত্য জগতের নানা বিশারদদের এটি পছন্দের জায়গা। এই কফি হাউসে যেমন আলোচনার আসর বসে তেমনই মত বিনিময়ের পক্ষেও এক আদর্শ জায়গা। এই জায়গায় বসেই সৃষ্টি হয়েছে শিল্পের নানা ধারার বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই এই স্থানের মাহাত্ম্যই আলাদা।

সুরকার নচিকেতা ঘোষ ছিলেন আধুনিক বাংলা গানের কিংবদন্তি গীতিকার ও কবি গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের বিশেষ বন্ধু। তাঁরই ছেলে সুপর্ণকান্তি ঘোষকে গৌরীপ্রসন্ন খুবই স্নেহ করতেন। তাঁর নিজের কোনও সন্তান ছিল না। সেই সুপর্ণকান্তি একবার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সে আমার ছোটো বোন, বড়ো আদরের ছোটো বোন' এই গানটিতে সুর করেন। এই ঘটনায় গৌরীপ্রসন্নের মনে বড়ো অভিমান হয়। এই নিয়ে তাঁদের মধ্যে উত্তপ্ত মত বিনিময়ও হয়। সুপর্ণকান্তি বলেছিলেন, "জীবনের প্রথম সুর করেছিলাম, 'সে আমার ছোটো বোন'...পুলককাকুর লেখা গানটিতে। এতে মোটেও খুশি হননি গৌরীকাকা। অভিমান করেছিলেন। একদিন দেরি করে বাড়িতে ঢুকছি দেখে বলেছিলেন, কী, বাইরে আড্ডা মেরে সময় কাটাচ্ছ? উত্তরে আড্ডা, বিশেষ করে কফি হাউসের আড্ডা নিয়ে গান লেখার চ্যালেঞ্জ করেছিলাম ওঁকে। শুরু হল তর্কাতর্কি। তার মধ্যেই গৌরীকাকা দু'লাইন লিখে ফেললেন, 'কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই / কোথায় হারিয়ে গেল সোনালি বিকেলগুলি সেই'! পরদিন সকালে কাকিমা ফোন করে বলেছিলেন, কী গান লিখতে দিয়েছিস রে? সারারাত ধরে লিখছেন। কিন্তু তিনি আমার কথা রেখেছিলেন।' গানের শেষ স্তবক নিয়ে নাকি গৌরীপ্রসন্ন ও সুপর্ণকান্তির মধ্যে বিস্তর ঝামেলা শুরু হয়। তখন প্রায় মুখ দেখাদেখি বন্ধ। ওই সময় তিনি খুব অসুস্থ। চেন্নাইয়ে চিকিৎসা করাতে যাওয়ার পথে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার হাওড়া স্টেশনে বসে একটি সিগারেটের প্যাকেটের উল্টো পিঠে লিখে ফেললেন, 'সেই সাতজন নেই আজ টেবিলটা তবু আছে সাতটা পেয়ালা আজও খালি নেই...'। তারপর এক চেনা লোকের হাত দিয়ে সেই লেখা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সুপর্ণকান্তি ঘোষের কাছে। পরে মান্না দে'র কণ্ঠে তৈরি হয় আর এক ইতিহাস। এসব স্মৃতি মনে করে চোখের কোণ চিকচিক করে ওঠে সুপর্ণকান্তির।

এই গানটি ১৯৮৩ সালে মুক্তি পাওয়ার পর ২০০৬ সালে বিবিসি'র জরিপে সর্বকালের সর্বশ্রে' ২০টি বাংলা গানের মধ্যে ঠাঁই করে নিয়ে চতুর্থ স্থান লাভ করে। গানটি রচনার মধ্য দিয়ে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার বুঝিয়ে দেন তিনি কত বড়ো মাপের গীতিকার ছিলেন। তিনি যে শুধু প্রেমের গান রচনার ক্ষেত্রেই দক্ষ কারিগর নন, সকল ধরনের গান রচনাতেই তাঁর দক্ষতা অপরিসীম এটা কারোর বুঝতে বাকি থাকেনি।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে বাংলা ছায়াছবি ও আধুনিক গানের জগতকে যাঁরা প্রেমাবেগে ভরিয়ে রেখেছিলেন গৌরীপ্রসন্ন তাঁদের মধ্যে অন্যতম শ্রে'। তাঁকে বাংলা আধুনিক গান ও বাংলা ছায়াছবির শ্রে' গীতিকার বললেও অত্যুক্তি হয় না। বাংলা গানের সুর বেড়ে উঠেছে যাঁর কথার আশ্রয়ে সেই গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কাছে বাংলা সঙ্গীত ভাণ্ডার চিরঋণী।

বাংলা ভাষার একজন সফল গীতিকার ও কবি গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। বিংশ শতাব্দীর বাঙালি গীতিকারদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় গান তিনি লিখেছেন। পাশাপাশি লিখেছেন অনেক চিত্রকাহিনি। তার মধ্যে অন্যতম 'দেয়ানেয়া'। শিল্পী শ্যামল মিত্রের জীবনের আঁধারের ওপর এই গল্পটি লেখা। এরকম অনেক সিনেমার গল্প লিখেছেন গৌরীপ্রসন্ন। তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল কলকাতা ও সেসময়ের বোম্বাই চলচ্চিত্র দুনিয়াকে ঘিরে। তেমনই আধুনিক বাংলা গান ও ছায়াছবির গান দু'দিকেই ছিল তাঁর সমান রচনা সামর্থ্য।

মান্না দের সঙ্গে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার জন্মেছিলেন ১৯২৫ সালের ৫ ডিসেম্বর, অবিভক্ত বাংলাদেশের পাবনাতে। ডাক নাম ছিল বাচ্চু। বাবা গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের খ্যাতনামা অধ্যাপক। মা সুধা মজুমদার ছিলেন একজন স্নাতক। তাঁর ছিল কবিতা ও প্রবন্ধ লেখার প্রতি অসীম আগ্রহ। সেই সাহিত্যপ্রীতি সঞ্চারিত হয়েছিল গৌরীপ্রসন্নের রক্তে। বাড়িতেই ছিল প্রচুর বাংলা, ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষার বই। খুব অল্প বয়সেই মাত্র পনেরো দিনে ইংরেজিতে অনুবাদ করে ফেলেছিলেন কালিদাসের 'মেঘদূতম'। পরবর্তীকালে ইংরেজি ও বাংলা দুটি ভাষাতেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ পাশ করেন তিনি। বাবার ইচ্ছে ছিল ছেলে বিলেতে গিয়ে সিভিল সার্ভিস পাশ করে আসুক। নতুবা ব্যারিস্টার হোক। কিন্তু বাংলা গানের টানে গৌরীপ্রসন্ন বঙ্গদেশেই রয়ে গেলেন। খুব বেশি স্বচ্ছল ছিল না তাঁর জীবন। কলকাতায় গান লেখার বিনিময়ে খুব বেশি পারিশ্রমিক পেতেন না। অনেকেই ঠিকমতো সম্মানমূল্য দিতেন না। নিজের সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, 'চল্লিশ বছর ধরে শুধু শব্দ সাজিয়েছি। নিজের জীবন নিয়ে অন্য কিছু ভাববার সময় পাইনি'।

খুব ছোটোবেলায় খেলাধুলোর প্রতি আগ্রহী হলেও ক্রমশ তিনি আকৃষ্ট হন ছবি আঁকা, লেখালেখি, কবিতা রচনা ও সঙ্গীতের মায়ায়। বেশ কিছুদিন অনুপম ঘটকের কাছে গানও শেখেন। অনুপম ঘটককে তিনি আজীবন গুরু বলে সম্মান দিতেন। কলেজে পড়ার সময় পার্কস্ট্রিটের সঙ্গীত সম্মেলনীতে গৌরীপ্রসন্ন গান শেখেন গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর কাছে ও

মিহিরকিরণ ভট্টাচার্যের কাছে বেহালা শেখেন। তিনি যখন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র তখন তাঁর লেখা, 'বঁধূ গো এই মধুমাস' গানটিতে শচীনদেব বর্মণ নিজে সুর করে রেকর্ড করেন। তারপর থেকে তাঁকে আর পেছনে ফিরে দেখতে হয়নি। শচীনদেব ছিলেন তাঁর অত্যন্ত প্রিয় মানুষ। বস্তুত শচীনদেব বর্মণই তাঁর রক্তে সঙ্গীতের নেশা পোক্ত করে দিয়েছিলেন। গ্রামোফোন রেকর্ডে শচীনদেবের গান চালিয়ে গৌরীপ্রসন্ন ঘণ্টার পর ঘণ্টা সম্মোহিত হয়ে শুনতেন।

একদিন শচীনদেব একটি সুর শুনিয়ে তাঁকে বললেন, সুরের মধ্যে কথা বসাতে হবে। তরুণ গৌরীপ্রসন্ন সেদিন লিখেছিলেন, 'জেনো আলেয়ারে বন্ধু ভাবিয়া হায়, সহেলি গো যে কাছে গেলে দূরে সরে যায়'। এই গানটিও খুব পছন্দ হয়েছিল শচীন দেববর্মণের। শচীন দেব ছাড়াও সেকালের বহু গায়ক গায়িকা তাঁর লেখা গান গেয়েছিলেন নিজেদের কণ্ঠের সমস্ত ঐশ্বর্য উজাড় করে দিয়ে। লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, মান্না দে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, কিশোরকুমার, রাহুল দেববর্মণ, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, ভূপেন হাজারিকা— কে নেয় সেই তালিকায়!

একবার গৌরীপ্রসন্নকে নিয়ে বম্বের একটি নামী রেস্তরাঁয় গিয়েছেন শচীন দেববর্মণ। সুরকার জয়কিষণ দেখতে পেয়ে উঠে এসে শচীন দেববর্মণের সঙ্গে কথা বললেন। কিন্তু গৌরীপ্রসন্নকে সেভাবে পাত্তা না দেওয়ায় শচীন দেব কিছুক্ষণ পরে গৌরীপ্রসন্নকে দেখিয়ে জয়কিষাণকে বলছিলেন, 'জানতা হ্যায়, কৌন হ্যায়? ইয়ে হ্যায় কলকাত্তা কা মজরুহ্ সুলতানপুরী'! কথাটা শুনে গৌরীপ্রসন্ন চমকে গিয়েছিলেন। তখন তিনি প্রফেশনালি গান লেখা শুরু করলেও জয়কিষাণ নক্ষত্র। রেস্তরাঁ থেকে বেরিয়ে জানতে চেয়েছিলেন এই উক্তির কারণ। শচীন দেব বলেছিলেন, 'এরা আমাকে মূল্য দেবে আর আমার সঙ্গে তুই রয়েছিস, তোকে মূল্য দেবে না? মনে মনে জেদ করবি নাই বা কেন, তুইও একদিন মজরুহ্ সুলতানপুরী হবি, কী তার চেয়েও বড়ো হবি'। আজীবন শচীন দেববর্মণের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিল গৌরীপ্রসন্নের। 'মেঘ কালো আঁধার কালো', 'প্রেম একবার এসেছিল নীরবে', 'বাঁশি শুনে আর কাজ নাই'...গৌরীপ্রসন্নের কথায় ও শচীন দেববর্মণের সুরে সৃষ্টি হয়েছিল এমন অসংখ্য কিংবদন্তী গান।

গৌরীপ্রসন্ন বাংলায় গান করার জন্য মান্না দে-কে উৎসাহ দিয়েছিলেন। হেমন্তের পরে যে দু'জন শিল্পী তাঁর সবচেয়ে বেশি মন কেড়ে ছিল, তাঁরা হলেন মান্না দে ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। ভি. শান্তারামের 'অমর ভূপালি' ছবিতে প্লেব্যাক করবেন জগন্ময় মিত্র। সে জন্য বম্বেতে এসেছেন তিনি। কিন্তু রেকর্ডিংয়ের আগে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। কে গাইবেন গান? সমস্যায় পড়েন শান্তারাম। তখন মান্না দে'র নাম প্রস্তাব করেন গৌরীপ্রসন্ন। সেই থেকে বন্ধুত্ব। সেই সময় হিন্দি ছবিতে প্লেব্যাক করছেন। গৌরীপ্রসন্ন তাঁকে উৎসাহ দিতেন বাংলা গান গাওয়ার জন্য। তাঁর জন্য প্রথম বাংলা গান লিখেছিলেন, 'তীর ভাঙা ঢেউ আর নীড় ভাঙা ঝড়'। এরপরে 'হাজার টাকা ঝাড়বাতিটা', 'যদি কাগজে লেখো নাম', 'এমন বন্ধু আর কে আছে', 'আমি যামিনী তুমি শশী হে', 'কফি হাউসের সেই আড্ডাটা'...একটার পর একটা গান। হিসেব করলে দেখা যায়, মান্না দে'রও অধিকাংশ সুপারহিট গানের গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার।

'গানে মোর কোন ইন্দ্রধনু', 'ঘুমঘুম চাঁদ', 'জানি না ফুরাবে কবে এই পথও চাওয়া', 'আকাশের অন্তরাগে',... গৌরীপ্রসন্ন'র এমন অসংখ্য সুপারহিট গানে খ্যাতির মুকুট পরিয়েছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়কে। বয়সে ছোটো হলেও সন্ধ্যাকে তিনি 'দিদিভাই' বলে ডাকতেন। প্রকাশ্যে বলতেন, সুচিত্রা সেন-সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের যে জুটি, তাঁদের কেউ টপকাতে পারবে না। গৌরীপ্রসন্নের মৃত্যুর পরে এক সাক্ষাৎকারে সন্ধ্যা বলেছিলেন, 'রাখি পূর্ণিমার দিন তাঁকে দেখতে বড়ো ইচ্ছে হত। কারণ গৌরীদা আমার জন্য প্রথম লিখেছিলেন, 'রাখি পূর্ণিমার রাতে'। আমার স্বামী শ্যামল গুপ্তও সুরকার ছিলেন। কিন্তু এক পেশায় থাকলেও কখনো সম্পর্কে চিড় ধরেনি'।

গৌরীপ্রসন্নের অনেক সেরা গানই তৈরি হয়েছে সুরের ওপর কথা বসিয়ে। যে কাজটা তাঁর কাছে ছিল কঠিন। গৌরীপ্রসন্ন গান লিখে দিতেন সুরকারদের, কখনো আবার এর উল্টোটাও হয়েছে। তিনি বলেছেন, 'আমার সবচেয়ে সুপারহিট গানগুলোই তৈরি হয়েছে সুরের ওপর কথা বসিয়ে। গানে মোর কোন ইন্দ্রধনু, আমার টার্নিং পয়েন্ট। সেটাও সুরের ওপর কথা বসানো। এই গানে অনুপমদা (ঘটক) সুর দিয়েছিলেন'।

একবার অমল মুখোপাধ্যায় সঙ্গীত পরিচালনার সুযোগ পেয়ে ছুটে এলেন গৌরীপ্রসন্নের কাছে। বললেন, 'গৌরীদা, এমন একটা গান লিখে দিন, যাতে আমি চিরদিন থেকে যেতে পারি বাংলা গানে'। উনি লিখে দিয়েছিলেন — 'এই সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায় এ কী বন্ধনে জড়ালে গো বন্ধু'। কিন্তু এত কিছুর পরেও শেষ জীবনের সাক্ষাৎকারে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের প্রতি গৌরীপ্রসন্নের একটা চাপা অভিমান প্রকাশ পায়। তিনি বলেছিলেন, এইচএমভি আয়োজিত হেমন্তের অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে অন্যান্যদের সম্পর্কের কথা বলা হলেও গৌরীপ্রসন্নের কথা কখনও বলা হয়নি। হেমন্তও নিজে কোনও অনুষ্ঠানে তাঁর কথা উল্লেখ করেননি।

নচিকেতা ঘোষের মৃত্যুর পর একটি স্মরণসভায় তাঁর সঙ্গে প্রিয় বন্ধুর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে গৌরীপ্রসন্ন বলেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সম্পর্ক ইংরেজির 'ইউ' আর 'কিউ'-এর মতো। হরিহর আত্মা হলেও এই বন্ধুর সঙ্গে গান তৈরি নিয়ে বেজায় তর্ক-ঝগড়া হত। বর্ষণ হত গালিগালাজ। কিন্তু সেই সব বিবাদ থেকে জন্ম নিয়েছিল এক-একটি অনবদ্য গান। গৌরীপ্রসন্ন ছাড়াও সেই সময়ে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল গুপ্তর সঙ্গেও কাজ করেছেন নচিকেতা। শোনা যায়, অন্য গীতিকারদের সঙ্গে সমস্যা না থাকলেও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে গৌরীপ্রসন্নের সম্পর্ক মোটেও মধুর ছিল না। আর সুযোগটা নিতেন নচিকেতা। তিনি দু'জনকেই একসঙ্গে ডাকতেন। কোনও গানের মুখরা লিখে ধরিয়ে দিতেন দু'জনকে। বলে দিতেন, যে ভালো লিখবে তারটাই নেবেন। প্রতিযোগিতা শুরু হত গৌরী-পুলকের। এই লড়াই থেকে সোনার ফসলই পেতেন নচিকেতা।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও গৌরীপ্রসন্ন উভয়ই উভয়কে খুব ভালোবাসতেন। গৌরীপ্রসন্ন বলতেন, 'হেমন্তবাবু হচ্ছেন চমৎকার মানুষ। যেমন চেহারা তেমনই ব্যবহার। ওঁর পাশে দাঁড়ালে মনে হয়, আমার পাশে হিমালয়ের মতো একটা মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন'। গৌরীপ্রসন্নের এই উক্তি বুঝিয়ে দেয়, তাঁর কতটা কাছের মানুষ ছিলেন হেমন্ত। 'সলিল চৌধুরী না থাকলে হেমন্ত কিংবদন্তি শিল্পী হতেন না'-প্রকাশ্যে এই কথার প্রতিবাদ করেছিলেন গৌরীপ্রসন্ন। মনুমেন্টের তলায় দাঁড়িয়ে যদি ঘোষণা করেও বলতে হয়, তা হলেও বলব, আমার লেখা আর নচিকেতা ঘোষের সুরে হেমন্তবাবুর গাওয়া, 'আমার গানের স্বরলিপি লেখা রবে', ওঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ গান'। তিনি জোর দিয়ে বলতেন, 'উইদাউট গৌরীপ্রসন্ন হেমন্তবাবুর সুরকার ও গায়ক জীবন অসম্পূর্ণ'। হেমন্তের কাছ থেকে ভালোবাসাও পেয়েছেন তিনি। বিপদের সময়েও পাশে পেয়েছিলেন।

এইচএমভি'র অধিকর্তা পি কে সেনের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় ওই সংস্থা গৌরীপ্রসন্নকে বয়কট করে। তখন কিছুটা ঝুঁকি নিয়েই হেমন্ত তাঁকে দিয়ে গান লিখিয়েছেন।

একে একে তৈরি হয়েছিল, 'ও নদীরে একটি কথা শুধাই শুধু তোমারে', 'নীল আকাশের নীচে এই পৃথিবী', 'তারে বলে দিও', 'আজ দু'জনার দুটি পথ', 'ওগো তুমি যে আমার', 'মুছে যাওয়া দিনগুলি', 'এই রাত তোমার

আমার', 'পথের ক্লান্তি ভুলে', 'এই পথ যদি না শেষ হয়',-এর মতো অসংখ্য হিট গান। যা বাংলা ছবির ইতিহাসে নতুন অধ্যায় লিখল। ফ্লপ ছবিকেও শুধুমাত্র গানের জোরে সুপারহিট করে দিতে পারত গৌরী-হেমন্ত জুটি। একবার 'শেষ পর্যন্ত' ছবির প্রযোজক এসে ধরলেন গৌরীপ্রসন্নকে। বললেন, 'আমার সব ছবি ফ্লপ করছে। এবার আপনাকে আর হেমন্তদাকে নিয়েছি। এ ছবি হিট না করলে আমি পথে বসে যাব'। গৌরীপ্রসন্ন লিখেছিলেন, 'এই মেঘলা দিনে একলা ঘরে থাকে না তো মন', 'কেন দূরে থাকো শুধু আড়াল রাখো', 'এই বালুকাবেলায় আমি লুখেছিনু'...তাতেই ছবি সুপারহিট।

চায়ের আড্ডার আসরে লিখে ফেলেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের গান। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সবে শুরু হয়েছে। রামগড়ের একটি চায়ের দোকানে দীনেন চৌধুরী, অংশুমান রায়ের সঙ্গে আড্ডায় বসে গৌরীপ্রসন্ন। সেই সময়ে আকাশবাণীর অবসরপ্রাপ্ত অধিকর্তা মিঃ তরফদার তার রেকর্ড প্লেয়ারে শোনাচ্ছিলেন ৭ মার্চের মুজিবরের বক্তৃতা। শুনতে শুনতে সিগারেটের প্যাকেটের সাদা কাগজে গৌরীপ্রসন্ন লিখে ফেললেন, 'শোনো, একটি মুজিবরের থেকে/লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি/আকাশে-বাতাসে ওঠে রণি'। সুর করলেন অংশুমান, গাইলেনও তিনি। গানটা ইংরেজিতে অনুবাদও হয়, 'আ মিলিয়ন মুজিবর সিঙ্গিং'। ১৯৭১-এ মুজিবনগরে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রী পরিষদের শপথ অনুষ্ঠানে বাজানো হয় সেই গান। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ১৯৭২ এর ডিসেম্বরে বঙ্গবন্ধুর আমন্ত্রণে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসাবে বাংলাদেশ গিয়েছিলেন গৌরীপ্রসন্ন। বাংলাদেশ রেডিওর জন্য লিখেছিলেন, 'মাগো ভাবনা কেন/আমরা তোমার শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলে'। হেমন্তের কণ্ঠে এ গানখানি যেন বিপ্লব এনে দিয়েছিল।

মজরুহ্ সুলতানপুরী তখন হিন্দি চলচ্চিত্রের ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রে' গীতিকার। কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন মানুষ মজরুহ্ সুলতানপুরী ছিলেন 'পিপল রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর সদস্য। বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের সম্মেলনে গান গাইতেন। মুম্বাইয়ে নৌ-বিদ্রোহের সময় নিয়মিত গান শুনিয়ে বিপ্লবীদের প্রাণে আগুন জ্বালিয়ে দিতেন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর বিরুদ্ধে গান লেখার অপরাধে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী মোরারজী দেশাই মজরুহ্কে গ্রেফতার করে জেলে পাঠান। দীর্ঘ এক বছরের কারাবাস হয় তাঁর। পরবর্তীকালে তিনি দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারে ভূষিত হন।

গৌরীপ্রসন্ন কি সত্যিই মজরুহ্ সুলতানপুরী হতে পেরেছিলেন? প্রশ্ন শুনে পাল্টা প্রশ্ন করলেন সুরকার নচিকেতা ঘোষের পুত্র সুবর্ণকান্তি ঘোষ, 'সেই সময়ে ভারতের এমন একজন বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পীর নাম বলতে পারবেন, যিনি গৌরীপ্রসন্নের গান গাননি'? উত্তরের অপেক্ষা না করেই বললেন, 'শচীন দেববর্মণ, লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, মান্না দে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, কিশোর কুমার, রাহুল দেববর্মণ, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়,... নাম বলে শেষ করতে পারব না। এঁদের পাঁচটা সেরা গানের মধ্যে একটা গান গৌরীকাকার হবেই। আর বাবারও প্রায় ৭০ শতাংশ গানই গৌরীকাকার লেখা।

গৌরীপ্রসন্নের অসংখ্য কালজয়ী গানের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করছি-

'ও নদীরে একটি কথা শুধাই শুধু তোমারে',
'এই সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায় এ কী বন্ধনে জড়ালে গো বন্ধু',
'এই পথ যদি না শেষ হয়',
'আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা থাকে',
'কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই',
'আমি যামিনী তুমি শশী হে',
কী আশায় বাঁধি খেলাঘর',

বাংলা গানের স্বর্ণযুগের এই মহান কবি ও গীতিকার ১৯৮৬ সালের ২০ আগস্ট মাত্র ৬২ বছর বয়সে দুরারোগ্য ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'গৌরীদা ক্যানসারে মারা যান। ওঁর মতো এত বড়ো একজন গীতিকার বম্বের অতি সাধারণ এক হাসপাতালে প্রায় মাটিতে শুয়েই শেষের দিনগুলো এক দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে কাটান। এ কথা ভাবতে পারা যায়'?

এই গুণী শিল্পীরাই দেশের সম্পদ। এঁরাই ভারতরত্ন। তাঁর যা মেধা ছিল এবং তিনি যে শিক্ষিত পরিবারে মানুষ হয়েছিলেন, তিনি ইচ্ছে করলেই বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে এসে সুন্দর এক স্বচ্ছল জীবন অতিবাহিত করতে পারতেন। কিন্তু তিনি সে পথে গেলেন না। বাংলা সাহিত্যের সেবা করে গীতিকার হয়ে লাখো লাখো মানুষের মনোরঞ্জন করে আর্থিক দিক দিয়ে অস্বচ্ছল ও অতি সাধারণ জীবনযাপন করে গেলেন।

অথচ আমাদের দেশের সরকার এই গুণী শিল্পীকে তাঁর শেষ সময়ে একটু উন্নতমানের ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিতে পারেনি। যিনি তাঁর লেখনি দিয়ে সহস্র-লক্ষ মানুষের মন জয় করলেন, শেষ সময়ে তাঁর মন কেউ জয় করতে পারল না। এই কালজয়ী শিল্পীর শেষ সময়ের কষ্ট আমাদের মতো সঙ্গীত-প্রেমীদের চোখে জল আনে, মন ব্যথায় ভরে যায়।

প্রচারের অভাবেই পঞ্চকবির মধ্যে তিন কবির গান আজ ব্রাত্য

শ্রদ্ধা নায়েক

রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও রজনীকান্ত। এই পাঁচ কবিই গান যেমন লিখেছেন, তেমনই সুরও দিয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও রজনীকান্ত এই ৩ কবির লেখা আর সুর দেওয়া গান, রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নজরুলগীতির মতো ব্যাপকভাবে প্রচারিত নয়। ঠিক কী কারণ রয়েছে এর পেছনে তা নিয়ে শিল্পীদের সঙ্গে আলোচনায় অচিন্ত্য সেন।

'তুমি নির্মল কর মঙ্গল কর, মলিন মর্ম মুছায়ে' বা 'বঙ্গ আমার জননী আমার! ধাত্রী আমার, আমার দেশ' কিংবা 'মহাসিন্ধুর ওপার হতে কী সঙ্গীত ভেসে আসে ওই' —এই ৩টে গানের সঙ্গে আমরা সবাই কমবেশি পরিচিত। কিন্তু নতুন প্রজন্ম কি জানে ওই সব গানের স্রষ্টাদের কথা? শুধু নতুন প্রজন্ম কেন, অনেক মধ্যবয়সিরাও হয়তো বলতে পারবেন না গানের লেখক কে? অথচ ওই তিন গানের লেখক ও সুরকার রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। যাঁরা রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক বা কিছু আগের প্রতিভাবান কবি, গীতিকার ও সুরকার।

গানের জগতে রবীন্দ্রনাথ, কাজী নজরুল ইসলাম, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গান পঞ্চকবির গান নামে পরিচিত। অথচ রবীন্দ্রনাথ ও কাজী নজরুল ইসলামের গানে আমজনতার কাছে যেভাবে জনপ্রিয়, সেভাবে বাকি তিন কবির গান আমদরবারে পৌঁছোতে পারেনি। নতুন প্রজন্মের কাছে এখনো অজানা থেকে গেছে। আমরাও তাঁদের খুব বেশি মনে রাখিনি। হয়তো রবীন্দ্রনাথ বা নজরুলের আকাশছোঁয়া সঙ্গীতের অবয়বের কারণে এঁরা দৃশ্যমান হননি। কিন্তু এঁদের সঙ্গীত প্রতিভায় অবাক হতে হয়। রজনীকান্তের 'তুমি নির্মল কর'। এক মর্মস্পর্শী গান। যার মূল বৈশিষ্ট্য হল, নন সেক্টেরিয়াল লিরিক। গীতাঞ্জলি, লালন আর বাউল সঙ্গীত ছাড়া এরকম প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় ভাবের বাইরে আধ্যাত্মিকতা (নন রিলিজিয়াস স্পিরিচুয়ালিটি) আর কারোর গানে পাওয়া যায় না। এছাড়াও তাঁর 'আমি আকৃত অদম বলেও কি মোরে কম করে কিছু দাও নি' বা 'আমায় সকল রকমে কাঙাল করেছে, গর্ব করিতে চুর তাই যশ, অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য, সকলি করেছে দূর'। এই গান তিনি লেখেন হাসপাতালের রোগশয্যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দেখতে যান। তিনি চলে গেলে এই গানটা লেখেন, ক্যানসারে আক্রান্ত রজনীকান্ত। বঙ্গভঙ্গর সময়ে স্বদেশি আন্দোলনের (১৯০৫-১৯১১) প্রভাবে 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই' সৃষ্টি করেন। যা গণআন্দোলনকারীদের অনুপ্রেরণা জোগায়।

অতুলপ্রসাদ বাংলা গানে ঠুংরি ধারার প্রবর্তক। তিনিই প্রথম বাংলায় গজল রচনা করেন। তাঁর বাংলা গজলের সংখ্যা ৬-৭টা। অতুলপ্রসাদ সেনের কিছু বিখ্যাত গান— ও মিছে তুই ভাবিস মন, সবারে বাস রে ভালো, বঁধুয়া নিঁদ নাহি আঁখিপাতে, একা মোর গানের তরী, কে আবার বাজায় বাঁশি প্রভৃতি। প্রতিটা গান কথা আর সুরের প্রাণরসে ভরপুর। তাঁর লেখা 'মোদের গরব, মোদের আশা, আমরি বাংলা ভাষা' গানটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ প্রেরণা জোগায়।

অতুল প্রসাদ সেন

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের গুণগ্রাহী ছিলেন। 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা', 'বঙ্গ আমার জননী আমার,' 'মহাসিন্ধুর ওপার হতে কী সঙ্গীত ভেসে আসে ওই' প্রভৃতি কালজয়ী গানের লেখক ও সুরকার ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বা ডিএল রায়। তাঁর ছেলে দিলীপকুমার রায় পরে বাবার লেখা অনেক গানে সুরারোপ করেন।

অসাধারণ লেখনী আর সুর সৃষ্টিতে বাংলা গানে এই তিন কবির গান অমর হয়ে রয়েছে। অথচ রবীন্দ্রনাথ ও কাজী নজরুল ইসলামের তুলনায় তাঁদের গান সেভাবে সাধারণ শ্রোতাদের কাছে জনপ্রিয়তা পায়নি বা পৌঁছোতে পারেনি। আর এখন অনেকেই তাঁদের গানের কথা জানেন না। কিন্তু তিন কবির গান কি ব্রাত্য? শিল্পীদের ভাবনা কী? প্রায় তিন দশকের বেশি সময় ধরে পুরাতনী, বাংলা আধুনিক গানের পাশাপাশি পাঁচ কবির গান গেয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে চলেছেন চন্দ্রাবলী রুদ্র দত্ত। তাঁর মতে, 'তিন কবির গান আমজনতার কাছে সেভাবে জনপ্রিয়তা না পাওয়ার পেছনে তিনটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, ওই তিন কবির গান গাওয়ার এক নির্দিষ্ট শৈলী ছিল যা অন্য দুই কবির গানে ছিল না। দ্বিতীয়ত, বাংলা সিনেমায় রবীন্দ্রনাথের বা

নজরুলের গান যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে আর জনপ্রিয় গায়ক-গায়িকারা গেয়েছেন, সেভাবে বাকি তিন কবির গান ব্যবহার হয়নি। সিনেমায় গান ব্যবহার হলে তা আমজনতার মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি জনপ্রিয় হয়। তৃতীয়ত, ওই তিন কবির গান নিয়ে সেভাবে প্রচার বা মাতামাতি হয়নি। রবীন্দ্র বা নজরুল জন্মজয়ন্তী সাড়ম্বরে পালিত হয়, সেখানে ওই তিন কবির জন্মবার্ষিকী পালন সচরাচর চোখেই পড়ে না।'

ড. অনিন্দ্যনারায়ণ বিশ্বাস একটু অন্যভাবে ভাবতে চান। তাঁর মতে, 'রবীন্দ্রনাথের নানা ধরনের গান রয়েছে। তার বিরাট বৈচিত্র্য। সব ধরনের মানুষের জন্যই গান রয়েছে। জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের পরম আশ্রয় রবীন্দ্রনাথের গান। সে তুলনায় ওই তিনকবির গানে অত বৈচিত্র্য নেই। এছাড়াও পঙ্কজ মল্লিক ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মতো কিংবদন্তি শিল্পীরা রবীন্দ্রসঙ্গীতকে সাধারণ শ্রোতাদের মধ্যে পৌঁছে দিয়েছেন, কিন্তু ওই তিন কবির গান সেভাবে তুলে ধরা হয়নি।' অনিন্দ্যনারায়ণের কথায়, 'ওই তিন কবির গান যাঁরা গাইতেন তাঁদের মধ্যে একটা ম্যানারিজম কাজ করত। যা রক্ষণশীল শ্রোতাদের ভালো লাগলেও সবার ভালো লাগে না। দেবব্রত বিশ্বাস রবীন্দ্রসঙ্গীত গান গাওয়ার ক্ষেত্রে নিজস্ব এক ধারা আনেন কিন্তু তা শ্রোতাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। তাছাড়া এখন রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। কিন্তু রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ বা ডিএল রায়ের গান নিয়ে তেমন পরীক্ষা-নিরীক্ষা দেখা যায় না। ফলে, নতুন ছেলেমেয়েদের কাছে তেমনভাবে পৌঁছোতে পারছে না। অন্যদিকে, রবীন্দ্রনাথের গান বাণীপ্রধান হওয়ায় বাঙালির কাছে সবসময়ে গ্রহণযোগ্য।

পঞ্চকবির গানের জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত গায়িকা ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায়। গানের ক্ষেত্রে এক নতুন ধারা এনেছেন। ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমেই বললেন, 'পাঁচ কবির মধ্যে তিন কবির গান ব্রাত্য এটা সংবাদমাধ্যমের তৈরি ভিত্তিহীন ধারণা। এমনটা হলে কি দেশে-বিদেশে আমি পাঁচ কবির গান গাইতাম?' তাঁর মতে, 'প্রচারের অভাবে তিন কবির গান আমজনতার দরবারে পৌঁছোতে পারেনি। আগে আমরা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় বা প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো গায়ক-গায়িকাদের গলায় ওই সব গান শুনেছি। এখন ওই সব গান গাওয়ার শিল্পী কোথায়? শুধু শ্রোতাদের ওপর দোষ দিয়ে লাভ নেই। আমার পক্ষে একা কতটা করা সম্ভব? আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমি পাঁচ কবির গান পৌঁছে দিচ্ছি।' ঋদ্ধি জানান, 'জলসায় এখনও নতুন ছেলেমেয়েরা পাঁচ কবির গান শুনতে চান। অনেক নতুন শিল্পী ভালো গাইছেন, এমনকী আমার ছাত্র-ছাত্রীরাও যথেষ্ট দক্ষ কিন্তু তাদের তুলে ধরার লোক কোথায়? নামি রেকর্ড কোম্পানি কি তাদের গান বের করার উদ্যোগ নেবে?'

তিন প্রতিষ্ঠিত শিল্পী মনে করেন, নতুন প্রজন্মের কাছে রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের গানের পাশাপাশি রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ আর ডিএল রায়ের গান পৌঁছে দিতে হবে। গায়িকা চন্দ্রাবলী রুদ্র দত্ত বলেন, উদ্যোক্তা, রেকর্ড কোম্পানি ও শ্রোতাদের এগিয়ে আসতে হবে। পাশাপাশি তাঁর মতে, বাংলা চলচ্চিত্রে আগের মতো রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ আর ডিএল রায়ের গানের ব্যবহার করতে হবে। ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবশ্য মত, শিল্পীদেরও দায়িত্ব নিতে হবে। জলসায় ওই তিন কবির গান গাইতে হবে। শ্রোতাদের রুচি ফেরাতে হবে। পারস্পরিক দলাদলি ছেড়ে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। শিল্পী অনিন্দ্যনারায়ণ বিশ্বাসের মত, এই সময়ের জনপ্রিয় গায়ক-গায়িকারা ওই তিন কবির গান বেশি করে গাইলে তা সাধারণ দর্শকদের কাছে সহজে পৌঁছে যাবে। পাঁচ কবির গানেই রয়েছে বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য আর পরম্পরা।

রজনীকান্ত সেন

ডি এল রায়

সুচিত্রাদির উদ্যোগে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীতের আলাদা বিভাগ চালু হয়

এই বছর রবীন্দ্রসংগীতের কিংবদন্তি শিল্পী সুচিত্রা মিত্রের ৯৮তম জন্মবার্ষিকী। তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখার ও জানার স্মৃতি রোমন্থন করেছেন অধ্যাপক ও গায়ক ***অগ্নিভ বন্দ্যোপাধ্যায়।***

সুচিত্রা মিত্রের সঙ্গে আমার ত্রিশ বছরেরও বেশি সময়ের সম্পর্ক ছিল। ওঁকে যখন আমি সিংহী পার্কের বাড়িতে প্রথম দেখি, তখন আমি ক্লাস ফোর-এ পড়ি। সেদিন ওঁর গাওয়া গানের বাণী আজও আমার মরমে গেঁথে রয়েছে। এর অনেক পরে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রসংগীতে মাস্টার ডিগ্রি পড়ার সময় ওঁকে আরো কাছ থেকে দেখি, জানি ও বোঝার চেষ্টা করি। ততদিনে সুচিত্রা মিত্র আমার প্রাণের মানুষ 'সুচিত্রাদি' হয়ে উঠেছেন। তখন আমাদের ক্লাস হত জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে। সুচিত্রাদির আগ্রহে ও উদ্যোগে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীতের আলাদা বিভাগ চালু হয় আর মর্যাদা পায়। ওঁর প্রতিটি কাজ ওই সময়ের উপাচার্য সাদরে মেনে নেন। আজ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীত বিভাগ যে মর্যাদা এবং জনপ্রিয়তা পেয়েছে সারা বিশ্ব জুড়ে, তার পেছনে রয়েছে সুচিত্রা মিত্রের অবদান।

ওঁর পরিচালনায় ১৯৮৬ সালে এইচএমভি থেকে আমার প্রথম গানের রেকর্ড বেরোয়। এরপর আমার পরিচালনায় তিন প্রজন্মের গানে অংশ নেন তিনি। তিন প্রজন্ম মানে সেদিন ছিলেন সুচিত্রা মিত্র, আমি আর আমার ছাত্রছাত্রীরা। আমার নিজের প্রতিষ্ঠানেও সুচিত্রাদি অসুস্থ শরীর নিয়ে এসেছিলেন। সুচিত্রাদি আমাকে ও পূরবী দেবনাথকে (এখন মুখার্জি) অনেক অনুষ্ঠানে নিয়ে যান গান গাওয়ানোর জন্য। একবার দিল্লিতে বঙ্গ সংস্কৃতির অনুষ্ঠানে আমাদের নিয়ে যান। ওই অনুষ্ঠানে আমাদের সঙ্গে গান গেয়েছিলেন আরেক কিংবদন্তি শিল্পী মান্না দে।

সুচিত্রাদি আজীবন বামপন্থী আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। সবসময়ে মানুষের সুখে দুঃখে পাশে থাকতেন। ছিলেন মানবতার পূজারি। কিন্তু সরাসরি কখনো রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকেননি।

সুচিত্রাদি অসংখ্য ছাত্রছাত্রী তৈরি করেছেন। তাঁদের মধ্যে বেশিরভাগ এখন নিজের ক্ষেত্রে কৃতি ও জনপ্রিয় শিল্পী। সুচিত্রাদির গান নিয়ে কিছু বলার ক্ষমতা আমার নেই। আমি ওঁর গুণমুগ্ধ ছাত্র। কান পাতলে আজও তাঁর গান শুনতে পাই। সুচিত্রাদির সঙ্গে সরাসরি দেখা হয়নি রবীন্দ্রনাথের। কিন্তু উনি কবিকে আরাধ্য মানতেন। কিছু কিছু রবীন্দ্রসংগীত মনে হয় সুচিত্রাদির জন্যই লেখা হয়েছিল। যেমন, কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি। এই গান ওঁর গলায় অন্যমাত্রা পায়। দিদি যখন এই গান গাইতেন তখন একটা ছবি চোখের সামনে ফুটে উঠত। এই গানের অনুকরণে সলিল চৌধুরীকে দিদি বলেছিলেন, একটা গান লিখে দিতে। আর সলিল চৌধুরী লিখেছিলেন, 'আমি সেই মেয়েটি'। অনুষ্ঠানের জন্য সুচিত্রাদি যখন গান নির্বাচন করতেন, প্রতিটি গানের মধ্যে থাকত এক দর্শন। উনি ছিলেন রবীন্দ্রসংগীতের প্রকৃত সাধিকা। সুচিত্রাদি বলতেন, রবীন্দ্রসংগীত কিন্তু খুব পপুলার গান নয়। যাঁরা গান ভালোবাসেন শুধুমাত্র তাঁদের জন্য। ওঁর গায়কীতে এমন এক মাদকতা ছিল যা কোনোভাবে অনুকরণ করা যায় না। শুধুমাত্র অনুসরণ করা যায়।

সুচিত্রাদি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও শেষ জীবনে খুব একাকিত্বে ভুগতেন। বাড়িতে গেলে বলতেন, 'আর একটু বস, একটু পরে যাবি'।

কথাগুলো এখনো আমার বুকে বাজে।

এই প্রজন্মের কাছে গীতিকার মোহিনী চৌধুরী উপেক্ষিত

সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়

'মুক্তির মন্দির সোপানতলে, কত প্রাণ হলো বলিদান, লেখা আছে অশ্রুজলে'- এই বহুশ্রুত গানটা আজও সমানভাবে জনপ্রিয়। স্বাধীনতা দিবসের পাশাপাশি প্রভাতফেরীর গান হিসাবে, যে কোনও জাতীয়তাবাদী অনুষ্ঠানেও এই গান সকলের মন কাড়ে।

অথচ হলপ করে বলা যায়, এই প্রজন্মের অনেকেই জানেন না এই গানের স্রষ্টা কে? গানের ক্ষেত্রে শিল্পী ও সুরকারকে তুলে ধরা হয় কিন্তু উপেক্ষিত থাকেন গীতিকার। যাঁর নাম অনেকে জানতে পারেন না। চিরস্মরণীয় এই গানটির রচয়িতা ছিলেন মোহিনী চৌধুরী। বাংলা গানের স্বর্ণযুগের ইতিহাসে এক স্মরণীয় নাম। তাঁর হাত দিয়ে তৈরি হয় অসংখ্য কালজয়ী গান।

মোহিনী চৌধুরীর জন্ম ১৯২০ সালের ৫ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়ায়। বাবা মতিলাল ও মা গোলাপকামিনী। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রামের পাঠশালায়। স্বাধীনতার প্রায় দুই দশকেরও আগে কলকাতায় আসেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১৯তম আসন দখল করে মাসিক বৃত্তিলাভ করেন। এরপর রিপন কলেজ (সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) থেকে আইএসসি পাশ করেন। রিপন কলেজে তাঁর সহপাঠী ছিলেন সলিল চৌধুরী। আর্থিক সংকটের জন্য ১৯৪০ সালে জিপিও-র চাকরিতে যোগ দেন।

স্কুলে পড়তে পড়তেই তাঁর কবিতা লেখা শুরু। এরপর একে একে দৈনিক আজাদ, বসুমতী, বঙ্গশ্রী, যুগান্তর প্রভৃতি নানা পত্রপত্রিকায় তাঁর লেখা গল্প, নাটক ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

গীতিকার হিসাবে আত্মপ্রকাশ ছিল নাটকীয়

গীতিকার হিসাবে আত্মপ্রকাশ ছিল বেশ নাটকীয়। মোহিনী চৌধুরী একবার গান লিখে খাতা জমা দিয়ে এলেন এইচএমভি অফিসে। মাঝেমধ্যেই খবর নিতেন এইচএমভি অফিসে। কিন্তু কোনও উত্তর না পেয়ে জিপিও'র চাকরিতে যোগ দেন। এইচএমভি-র কর্তা হেমচন্দ্র সোম একদিন অফিসের আলমারি পরিষ্কার করতে গিয়ে অনেক কাগজপত্রের মধ্যে একটা খাতা আবিষ্কার করেন। খাতার ওপর লেখা 'গুঞ্জন'। লেখকের নাম মোহিনী চৌধুরী। খাতাটা খুলে হেমচন্দ্র সোম পড়তে পড়তে চমকে উঠলেন। 'রাজকুমারী ওলো নয়নপাতা খোল, সোনার টিয়া ডাকছে গাছে ওই বুঝি ভোর হল'। দেখার পরই এই গানটা সুর করার জন্য প্রখ্যাত সুরকার কমল দাশগুপ্তের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর সুরে গানটা রেকর্ড করা হয়। গাইলেন কুসুম গোস্বামী। ১৯৪৩ সালে রেকর্ড হল তাঁর অজান্তেই। কিন্তু কোনও কারণে এই গানের রেকর্ড বেরোতে দেরি হয়। সেই ফাঁকে 'পারিজাতের বনে চলো ইন্দ্রধনুর দেশে' মোহিনী চৌধুরীর লেখা এই গানটার রেকর্ড বেরোয়-সুরকার পাঁচু বসু ও শিল্পী কুমারী অনিমা ঘোষের কণ্ঠে কলম্বিয়া থেকে। গীতিকার মোহিনী চৌধুরীর প্রথম রেকর্ড হিসাবে চিহ্নিত এই গান বেরোয় ১৯৪৩ সালের আগস্ট মাসে। ১৯৪৪ সালে কমল দাশগুপ্তের সুরে মোহিনী চৌধুরীর লেখা গান গাইলেন জগন্ময় মিত্র, 'ভুলি নাই ভুলি নাই, নয়ন তোমায় হারায়েছি প্রিয়া স্বপনে তোমারে পাই'। জন্ময় মিত্র-কমল দাশগুপ্ত জুটি, সঙ্গে মোহিনীর কথা। দারুণ জনপ্রিয় হল গান। এই জুটির আরও দুটো বিখ্যাত গান- 'আমি যে দুরন্ত বৈশাখী ঝড়', 'ভালোবাসা মোরে ভিখারি করেছে'। গীতিকারকে আর ফিরে তাকাতে হয়নি। একে একে তাঁর হাতে তৈরি হয় অসংখ্য কালজয়ী গান।

স্বাধীনতার ঠিক আগে মোহিনী লিখলেন, মুক্তির মন্দির...

প্রতিটা গানের পিছনে রয়েছে অজানা অনেক গল্প। শৈলজানন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় তখন বিখ্যাত চিত্রপরিচালক। একদিন গানের খাতা নিয়ে মোহিনী সোজা চলে গেলেন তাঁর অফিসে। খাতা উল্টেপাল্টে দেখে শৈলজানন্দন বললেন, 'গানগুলো চমৎকার ভাই। কিন্তু আমি নিতে পারব না এখন'। তিনি তখন তাঁর সিনেমার জন্য প্রধানত নজরুলের গানই নিচ্ছেন। মোহিনী তা শুনে চলে আসছেন, শৈলজানন্দন ডেকে বললেন, 'একটা গান লেখার সুযোগ দিতে পারি। ছবির সিকোয়েন্স অনুযায়ী একটা গান লিখে দিতে হবে'। দৃশ্যটা বুঝিয়েও দিলেন। সেই রাতেই কথা লিখলেন মোহিনী- 'দিনদুনিয়ার মালিক তোমার দিনকে দয়া হয় না'। গানের কথা শুনে মুগ্ধ শৈলজানন্দ আরও একটা গানের কথা লিখে দেওয়ার ফরমায়েশ করলেন। পরের গানটা ছিল, 'অভিনয় নয় গো, অভিনয় নয়'। ১৯৪৫-সালে রূপবাণীতে রিলিজ করল 'অভিনয়'। মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে রূপবাণী হাউসফুল। সুপারহিট সিনেমা। সুপারহিট গানও। ওই বছর অক্টোবরে এইচএমভি থেকে পুজোর গান রিলিজ হল- কমল দাশগুপ্তের সুরে আর সত্য চৌধুরীর কণ্ঠে 'পৃথিবী আমারে চায়'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সেনাদের মনোবল অটুট রাখার জন্য নানা ফ্রন্টে তখন নাচগান, নাটক- থিয়েটার চলছে। অপরেশ লাহিড়ী এই সময় বেরিয়ে পড়লেন গানের ঝুলি নিয়ে। 'পৃথিবী আমারে চায়' অনুবাদ করে বিলোতে লাগলেন। সেনাদের মধ্যে দারুণ জনপ্রিয় হল গান। আর ভারতের স্বাধীনতা লাভের ঠিক আগে মোহিনী লিখলেন তাঁর সম্ভবত সব থেকে জনপ্রিয় গান-'মুক্তির মন্দির সোপানতলে কত প্রাণ হলো বলিদান, লেখা আছে অশ্রুজলে'। গানটা রেকর্ড হয়েছিল কৃষ্ণচন্দ্র দে-র সুরে, তাঁরই কণ্ঠে। গানটা মুক্তি পায় স্বাধীনতার ঠিক পরেই। এখনও সমান জনপ্রিয় এই গানটা ওই সময়ে জনমানসে এক অনন্য প্রভাব বিস্তার করেছিল। এর কিছুদিন পরই শৈলজানন্দের 'মানে না মানা' ছবির জন্য মোহিনী লিখলেন, 'মানবের তরে মাটির পৃথিবী, দানবের তরে নয়'। এই গানও ওই সময়ে খুব সাড়া ফেলছিল।

একবার এইচএমভি-তে গানের রেকর্ডিং হচ্ছে। এমন সময় এইমএমভি কর্তা হেমচন্দ্র সোম এসে বললেন, শচীন দেববর্মণ ডেকে পাঠিয়েছেন মোহিনীকে। শচীনকর্তার সুর আর অজয় ভট্টাচার্যের কথা, এই নিয়ে তখন বাংলা গানের মধুমাস। অজয় ভট্টাচার্য তখন সদ্য মারা গিয়েছেন। হিন্দুস্থান পার্কের বাড়িতে দেখা করতে এলেন

মোহিনী। নীতিন বসু তখন 'বোম্বে টকিজ'-এর ব্যানারে বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' নিয়ে 'সমর' নামে একটা ছবি তৈরি করছেন। তার জন্য চাই একটা ঝুমুর গান। গানের সুর এসে গিয়েছে শচীনকর্তার মাথায়। কিন্তু ঠিক কী চাই, মোহিনীকে তা বোঝাতে ইচ্ছামতো কিছু কথা বসিয়ে নিলেন- 'টঙ্গালি গো টঙ্গালি, নাকে মুখে চুনকালি'। কিন্তু এই গান তবলার ঠেকা ছাড়া জমে না। ৫ বছরের রাহুল খেলছিল বাইরে। হাঁক পাড়লেন শচীনকর্তা। ছেলে এসে অদ্ভুত ঠেকা দিল, মুখে আওয়াজ করে। মোহিনী লিখলেন, 'সুন্দরী লো সুন্দরী, দল বেঁধে আয় গান করি'। গানটা গাইলেন কিশোরকুমারের ভাই অরুণকুমার আর গীতা দত্ত। কোরাসে ছিলেন কিশোরকুমার ও রুমা গুহঠাকুরতা।

এরপর মোহিনী একের পর এক শচীনকর্তার সঙ্গে কাজ করেছেন। তাঁদের জুটিতে তৈরি হয় 'পিয়া সনে মিলন পিয়াস', 'ঝিলমিল ঝিলমিল', 'চৈতি সন্ধ্যা যায় বৃথা', 'হায় কী যে করি এ মন নিয়া'। তখন দেশ সদ্য স্বাধীন হয়েছে। দেশভাগের ক্ষত বাঙালির বুকে। শচীনকর্তা বললেন, গান লিখে দিতে হবে এই অনুভূতি নিয়ে। মোহিনীর জন্ম বাংলাদেশে, সেই দেশই আর নিজের রইল না। এ ব্যাথা তাঁর থেকে ভালো আর কে বুঝবে? সারা রাত জেগে ভোরে মোহিনী লিখলেন, 'শুনি তাকদুম তাকদুম বাজে বাজে ভাঙা ঢোল/ ও মন, যা ভুলে যা কী হারালি, ভোল রে ব্যথা ভোল'। বাংলা গানের ইতিহাসে এই গান একটা মাইলস্টোন।

মোহিনী চৌধুরীর ভাগ্য বিপর্যয়

পরিচালক শৈলজানন্দনের সঙ্গে একের পর এক কাজ করার সময় ছবি তৈরির ভাবনা মাথায় আসে মোহিনী চৌধুরীর। 'রায়চৌধুরী' ছবিতে সহ-পরিচালনার কাজ করেন। এরপর মোহিনী চৌধুরী শুরু করেন 'সাধনা' ছবির কাজ। কিন্তু ছবি শেষ করতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে যান। ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স, স্ত্রীর গয়না, সব চলে গেল। পাওনাদের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে তাঁর বাবা বাড়ি থেকে তাঁকে তাড়িয়ে দিলেন। স্ত্রী-ছেলে নিয়ে দেউলিয়া মোহিনী চেতলায় এক ভাড়াবাড়িতে এক কামরার ঘরে কোনওরকমে মাথা গুঁজলেন। দুধের শিশু নিয়ে অসম্ভব দারিদ্রের সঙ্গে নিয়ত লড়াই করছেন, তখন বাংলা সিনেমা জগৎ মুখ ফিরিয়ে নিল তাঁর থেকে। ১৯৫৪ সালে কলকাতা ছেড়ে মোহিনী চৌধুরী চলে গেলেন দিল্লি। বিজ্ঞানী তথা সাংসদ মেঘনাদ সাহার সংসদীয় সচিবের পদে চাকরি নিয়ে। ভেবেছিলেন কলকাতা ও তার সংস্কৃতি জগতের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দেবেন। কিন্তু তাঁর মন দিল্লিতে টিকল না। ততদিনে 'সাধনা' মুক্তির সময় হয়েছে। সিনেমা ফ্লপ হল। মেঘনাদ সাহাকে কিছু না বলে আচমকা একদিন কলকাতায় ফিরে এলেন মোহিনী। ভাগ্য বিপর্যয় পিছু ছাড়ল না। প্রখ্যাত শিল্পপতি দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের কাছে চাকরি পেলেন। সামান্য কিছু টাকা আসতে লাগল মাসে মাসে। কিন্তু গান আর ফিরে এল না সেভাবে। অন্যরা জায়গা নিয়ে নিল। এরইমধ্যে তাঁর ২ বছরের শিশুপুত্র আগুনে পুড়ে যায়। শোকে দুঃখে পাগলের মতো হয়ে গেলেন মোহিনী। তখন দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বেশ কিছু ছবির প্রযোজক। পরিচয় করিয়ে দিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। হেমন্ত 'নায়িকা সংবাদ' ছবির জন্য দুটো গান লিখতে বললেন মোহিনীকে। ভেবেছিলেন তাঁর গান শ্রোতাদের মন ভরাবে না। কিন্তু সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গলায় 'কী মিষ্টি দেখো মিষ্টি, কি মিষ্টি এ সকাল' আর 'কেন এ হৃদয় চঞ্চল হল' গান দুটো সুপারহিট হয়। এরপর 'শুকসারি' ছবিতে উত্তমকুমারের লিপে মোহিনীর লেখা গান গাইলেন মান্না দে-'একী চন্দ্রবদনী, সুন্দরী ধনি'। এই গান অন্য মাত্রা পায়। নানা কারণে শিল্পপতি দেবেন্দ্রনাথের ভাগ্য বিপর্যয় হয়। ফলে ১৯৭১ সালে মোহিনীকেও চাকরি হারাতে হয়।

কিশোরকুমার থেকে তালাত মামুদ...

প্রথম পর্যায়ে প্রেম-ভালোবাসা-বিরহ-বিষাদের গানই বেশি লেখেন মোহিনী চৌধুরী। তাঁর কথায় গান গেয়েছিলেন শচীন দেববর্মণ, সত্য চৌধুরী, জগন্ময় মিত্র, যুথিকা রায়, কৃষ্ণচন্দ্র দে, সন্তোষ সেনগুপ্ত, রামকুমার চট্টোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, কিশোরকুমার, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তালাত মামুদ, শ্যামল মিত্র, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা দত্ত, গায়ত্রী বসু, ফিরোজা বেগম, জপমালা ঘোষ, নির্মলা মিশ্র। গীতা দত্ত, উৎপলা সেন, রামকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র ও তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম রেকর্ড বেরোয় মোহিনী চৌধুরীর গানে।

মোহিনীর লেখা গানে সুরসৃষ্টি করেছেন সেকালের প্রায় সব প্রতিভাবান সুরকাররা। তাঁদের মধ্যে ছিলেন কমল দাশগুপ্ত, কৃষ্ণচন্দ্র দে, শচীন দেববর্মণ, শৈলেশ দত্তগুপ্ত, সুবল দাশগুপ্ত, কালীপদ সেন, গিরীশ চক্রবর্তী, দুর্গা সেন, সুধীরলাল চক্রবর্তী, নিতাই ঘটক, নরেশ ভট্টাচার্য, সুধীন দাশগুপ্ত, গোপেন মল্লিক, সন্তোষ মুখোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। তবে মোহিনীর গানে সবচেয়ে বেশি সুর সংযোজন করেন কমল দাশগুপ্ত।

শেষ গান

আজীবন সংগ্রামী মানুষটা ১৯৮৭ সালে 'মানুষ মানুষের জন্য' সিনেমার শেষ গান লেখেন। ওই ছবির জন্য নিজের দুটো গান রেকর্ডিংয়ের সময় সারাদিন স্টুডিয়োয় ছিলেন। বাড়ি ফিরে গানের গল্প শোনান স্ত্রীকে। ১৯৮৭ সালের ২১ মে রাতে আচমকা তিনি চিরদিনের জন্য চলে সুরলোকে।

বাবার নামে সংগ্রহশালা হোক

দিগ্বিজয় চৌধুরী, চিত্রপরিচালক ও মোহিনী চৌধুরীর ছেলে

বেঁচে থাকতে বাবা অনেক উপেক্ষা সহ্য করেছেন। ১৯৮৭ সালে বাবার প্রয়াণের আগে অনেকে জানতেনই না, তিনি বেঁচে আছেন। বাবা টাকা চাইতেন না, চাইতেন কাজের স্বীকৃতি। তিনিই গণচেতনামুখী গানের পথিকৃত। আগে শুধুমাত্র চাঁদ-ফুল-পাখি নিয়ে গান লেখা হত, সেখান থেকে বেরিয়ে এসে তিনি প্রথম 'মুক্তির মন্দির সোপানতলে, পৃথিবী আমারে চায়-এর মতো জনচেতনা জাগাতে গান লেখেন। স্বাধীনতার পটভূমিকায় তাঁর লেখা অনেক গান রয়েছে। অনেক গান বাবার লেখা কিন্তু 'প্রচলিত' হিসাবে চালানো হয়। এটা খুবই কষ্টদায়ক। সত্যি বলতে কী, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম বাবাকে প্রাপ্য সম্মানটুকু দিয়েছেন। ১৯৮৭ সালে বাবার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সাংসদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের বেহালার বাড়িতে ছুটে আসেন। একদিন নয়, একাধিক বার। তখনও তিনি শুধুই এক সাংসদ। প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার সময় মাকে রাজভবনে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানাই, বাবার নামে একটা সংগ্রহশালা করা হোক। যেখানে বাবার লেখা গান ও চিঠিপত্র সংরক্ষিত থাকবে। নতুন প্রজন্ম কবি ও গীতিকার মোহিনী চৌধুরী সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে পারবে।

জলধর সেনের হিমালয়ভ্রমণ সাহিত্য

কাজল সেন

"পৃথিবীর সকল সভ্য দেশের সাহিত্যেই ভ্রমণ বিষয়ক গ্রন্থের প্রাচুর্য্য লক্ষিত হয়। দেশভ্রমণ শিক্ষার একটি অঙ্গ, দেশভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না, এমন লোক বোধকরি আমাদের দেশেও এখন একান্ত বিরল। হয়তো বা ইহা মনুষ্য জীবনের একটি স্বাভাবিক বৃত্তি। যাঁহারা বিএ, এমএ পাশ করিয়া উপার্জনের পন্থায় দশটা হইতে পাঁচটা পর্যন্ত অফিস করেন, এবং অর্থোপার্জন ব্যতীত অন্য চিন্তার অবসর পান না, তাঁহাদের তৃষিত হৃদয় ও অনতিদীর্ঘ অবকাশকালে রথচক্র মুখরিত ইষ্টকবদ্ধ রাজপথ অট্টালিকাসঙ্কুল শহরের দূষিত বায়ুপ্রবাহ পরিত্যাগপূর্বক মুক্ত প্রকৃতির চিরবৈচিত্র্যময় শ্যামল বক্ষে ঝাঁপাইয়া বিশ্ববিধাতার প্রেমধারা পান করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠে। কেহ দার্জিলিং যান, কেহ শিমলা-শৈলে আশ্রয় গ্রহণ করেন, কেহ বা শস্যশ্যামলা কুঞ্জকুটীরে বসিয়া সুখ অনুভব করেন"।

জলধর সেন রচিত 'হিমালয়' ভ্রমণ গ্রন্থের ভূমিকায় দীনেন্দ্রকুমার রায় দেশভ্রমণের উপলক্ষ্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন। কিন্তু স্বয়ং জলধর সেন এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, "কেহ পর্যটনের উদ্দেশ্যে দেশভ্রমণে বাহির হয়, কেহ বা জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করে, কিন্তু পৃথিবীর সকলে সমান নয়, এমনও দেখা গিয়েছে, কেহ কেহ তহবিল তছরুপপাত করিয়া, কেহ বা নরশোণিতে হস্ত কলঙ্কিত করিয়া দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছে, কিন্তু এ সকল ভিন্ন এমনও দুই একজন হতভাগ্য লোকের অভাব নাই, যাহারা শ্মশানক্ষেত্রে জীবনের যথাসর্বস্ব বিসর্জন দিয়া উদাস হৃদয়ে, ব্যাকুল অন্তরে, লক্ষ্যহারা ধূমকেতুর ন্যায় এক অনির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইয়াছে। সেই রমণীয় নেপথ্যে তরুচ্ছায়া সমাচ্ছন্ন কুসুমসুরভি পরিব্যাপ্ত সুমধুর সমীরণ হিল্লোলিত এবং বিহঙ্গকাকলি মুখরিত বহিঃপ্রকৃতির স্নিগ্ধ-সৌন্দর্যে সজ্জিত থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার হৃদয় সে সৌন্দর্য গ্রহণের অধিকারী নহে, সমগ্র পৃথিবীর বিচিত্র শোভা সন্দর্শন করিয়া আসিলেও তাহার সুখ হইতে তৎসম্বন্ধে কোন বিশেষ কথা হইবার সম্ভাবনা নাই। উত্তর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া যাহা দেখিয়াছি, অনেকেই তাহা দেখিবার সুযোগ পান নাই, কিন্তু সেই সমস্ত মহান, সুন্দর দৃশ্য, প্রকৃতির সেই বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যক্ত সৌন্দর্য প্রাণ দিয়া উপভোগ করিতে পারি নাই বটে, তথাপি দেশ ঘুরিয়াছি"।

আর এখানেই অন্যান্য পর্যটকদের সঙ্গে জলধর সেনের পর্যটনের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। জলধর সেন নিছকই পর্যটনের উদ্দেশ্যে দেশভ্রমণে বের হননি। জ্ঞানার্জনও তাঁর দেশভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল না। এমনকী তীর্থদর্শন বা পুণ্য অর্জনের তাঁর আদেও কোনো আকাঙ্ক্ষা ছিল না। বস্তুতপক্ষে দেশভ্রমণে বের হওয়ার আগে ভ্রমণের কোনো পরিকল্পনাও ছিল না। তিনি তখন বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত গোয়ালন্দ স্কুলে শিক্ষকতা করছেন। বিবাহ করেছেন। সেখানে স্ত্রী ছাড়া মা, জ্যেঠতুতো দাদা ও বৌদিকে নিয়ে কষ্টের সংসার হলেও শান্তির অভাব ছিল না। ইতিমধ্যে তাঁর একটি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে। আর তারপরই তিনি সম্মুখীন হন বিপর্যয়ের। কন্যাসন্তানটি জন্মের বারো দিন পরই মারা যায়। তার বারো দিন পরে তাঁর স্ত্রী মারা যান। আর তার তিন মাস পরে মারা যান জলধর সেনের মা। মাত্র চার মাসের মধ্যে একান্ত প্রিয়জনদের এভাবে বিদায় তাঁকে শোকে-দুঃখে অত্যন্ত বিচলিত করে তোলে। সংসারের প্রতি চরম বিতৃষ্ণা জন্মায় তাঁর মনে। ছোটো ভাই শশধর সেনের হাতে সংসারের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে শান্তিলাভের আশায় তিনি যাত্রা করেন হিমালয়ের উদ্দেশ্যে। তিনি লিখেছেন, "জীবনে কখনও কবিতার সেবা করি নাই, প্রভাত-বায়ুর মৃদুমন্দ সঞ্চালন, প্রস্ফুটিত কুসুমের স্নিগ্ধ শোভা কখনও আমাকে ব্যাকুল করে নাই। বজ্রকঠোর হৃদয় লইয়া সংসারের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে জীবনপথে অগ্রসর হইয়াছিলাম। হঠাৎ একদিন কেন্দ্রভ্রষ্ট হইয়া পড়ায় যে দিকে চক্ষু গেল, সেইদিকে চলিলাম। ইহাই আমার ভ্রমণের ইতিহাস"।

হিমালয়ের পথে যাত্রা করে তিনি ঘুরতে ঘুরতে প্রথমে এসে উপস্থিত হন দেরাদুনে। সেটা ছিল ১৮৬৬ সাল। সেখানে কালীকান্ত সেন নামে বরিশাল জেলাবাসী এক ভদ্রলোক একটি ইংরেজি স্কুল চালাতেন। জলধর সেন তাঁরই আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, "মাস্টারজী আমাকে পেয়ে বসলেন, তিনি বললেন, 'হিমালয়ে বেড়াতে হয় বেড়াবেন, যখন যেখানে ইচ্ছা যাবেন একটা আড্ডার তো দরকার! যখন আমার এখানে এসেছেন, হিমালয় ভ্রমণে ক্লান্ত হয়ে এইখানে

এসেই বিশ্রাম করবেন এবং সেই বিশ্রাম সময়ে আমার স্কুলে ছেলেদের পড়াবেন'। ওরে বাবা ফের সেই মাস্টারি! এই যে দেশ ত্যাগ করে এলাম তুমি কিনা বিনা টিকিটে আমার সঙ্গে সঙ্গে এসে এই হিমালয়ের সানুদেশে ডেরাদুনেও উপস্থিত! কী করি ভদ্রলোক খেতে দেবেন, কাপড় ছিঁড়ে গেলে কাপড় কিনে দেবেন, শীতবস্ত্র দেবেন তার পরিবর্তে যখন ডেরাডুনে থাকব তখন তাঁর স্কুলের ছেলেদের অঙ্কশাস্ত্রে গাধা বানাব"।

কালীকান্ত সেনের আশ্রয়েই থেকে গেলেন জলধর সেন এবং ইংরেজি স্কুলে শিক্ষকতাও শুরু করলেন। কিন্তু প্রায় প্রতি শনিবার অপরাহ্নে দুটোর সময় স্কুল থেকে ফিরে এসে জুতো, পায়জামা, লম্বা কোট ও প্রকাণ্ড পাগড়ি তাঁর বিশ্বস্ত ভৃত্য দেবানন্দের জিম্মায় রেখে দিয়ে একখানি কম্বল ও লাঠি নিয়ে বেড়িয়ে পড়তেন। দু'তিনদিন হিমালয়ের বনে জঙ্গলে ঘুরে আবার ফিরে আসতেন দেরাদুনের আশ্রয়ে। এইভাবেই তিনি দেরাদুনের পার্শ্ববর্তী ও কিছুটা দূরবর্তী স্থানগুলি ভ্রমণ করেন। অধিকাংশ দিন তিনি একাই বেড়িয়ে পড়তেন, কখনও কোনো সঙ্গীকে বেছে নিতেন। এইভাবে দেখতে দেখতে কেটে যায় কয়েকটি বছর। তখনও পর্যন্ত কেদারনাথ ও বদরিকাশ্রম তিনি যাননি। অথচ কেদারনাথ ও বদরিকাশ্রম যাওয়ার একটা সুপ্ত অভিলাষ ছিল ছোটোবেলা থেকেই। তাঁদের দেশের বাড়ি কুমারখালি গ্রামের এক ব্রাহ্মণঠাকুর একবার বদরিকাশ্রম গেছিলেন। অবশ্য আদেও তিনি হরিদ্বার পর্যন্ত গেছিলেন কিনা সে ব্যাপারে কারোর কারোর সন্দেহ ছিল। তবু সেই বামুনঠাকুরের কাছে বদরিকাশ্রমের গল্প শুনে জলধর সেনের খুব ইচ্ছে হতো বদরিকাশ্রম যাওয়ার। কিন্তু তা যে কোনোদিন সম্ভব হবে ভাবতেও পারেননি। তাই দেরাদুন বাসকালে যখন সেই সুযোগ ঘটল তখন তাঁর মন আনন্দে নেচে উঠল। বস্তুতপক্ষে হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে পূর্বপরিচিত এক বৃদ্ধ বাঙালি সন্ন্যাসীর দেখা হয়। সেই সন্ন্যাসীর নাম ও বিশদ পরিচয় জলধর সেন উল্লেখ করেননি। শুধু এইটুকু লিখেছেন যে, বাল্যকালে তিনি সেই সন্ন্যাসীর বিশেষ স্নেহলাভ করেছিলেন। ওই সন্ন্যাসীর সঙ্গেই জলধর সেন কেদারনাথ ও বদরিকাশ্রমের উদ্দেশ্যে পদব্রজে রওয়ানা হন ১৮৯০ সালের ৬ মে ভোরবেলায়। পথে এক বাঙালি বৈদান্তিক যুবক সাধু অচ্যুতানন্দ স্বামীর সঙ্গে পরিচয় হয় এবং তিনিও তাঁদের সহযাত্রী হন। তারপর দীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রম করে ১৮৯০ সালের ২৯ মে বদরিকাশ্রমে প্রবেশ করেন। ২৯, ৩০ ও ৩১ মে তাঁরা বদরিকাশ্রমেই ছিলেন। ১ জুন আবার যাত্রা শুরু করেন ফিরতি পথে।

বেশ কয়েক বছর হিমালয়ে কাটিয়ে জলধর সেন ফিরে আসেন বাংলায়। ১২৯৯ সালের মাঘ মাসে (ইংরেজি ১৮৯৩ সালের জানুয়ারি) তাঁর লেখা প্রথম দুটি ভ্রমণবৃত্তান্ত 'টপকেশ্বর' ও 'গুচ্ছপাণি' প্রকাশিত হয় 'ভারতী' ও 'বালক' পত্রিকায়। ওই সময় থেকে প্রায় প্রতি মাসে ১৩০১ সালের ফাল্গুন পর্যন্ত 'ভারতী'তে, 'সাহিত্য' পত্রিকায় বৈশাখ ১৩০১ থেকে আশ্বিন ১৩০৫ পর্যন্ত, 'দাসী' পত্রিকায় ১৩০২-০৩ সালের কয়েকটি সংখ্যায় এবং 'প্রদীপ' পত্রিকায় ১৩০৪, ০৫, ০৭ ও ০৮ সালের কয়েকটি সংখ্যায় তাঁর ভ্রমণকাহিনীগুলি প্রকাশিত হয়। এছাড়া 'ধ্রুব', 'বাঁশরি, 'জাহ্নবী', 'জন্মভূমি' ও 'ভারতবর্ষ' পত্রিকাতেও হিমালয় এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণের কাহিনীগুলি প্রকাশিত হয়।

যখন জলধর সেনের ভ্রমণ বৃত্তান্তগুলি 'ভারতী', 'বালক' ও 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হতে শুরু করে, তখন থেকেই তিনি বাংলা সাহিত্য জগতে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে শুরু করেন। বিশেষত ভ্রমণ সাহিত্যের সুলেখক রূপে চারিদিকে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। এই সময়ে 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও তাঁর ভাই যতীশচন্দ্র সমাজপতি পাঠকদের আগ্রহে উৎসাহী হয়ে নিজেদের খরচে সেই ভ্রমণ বৃত্তান্তগুলি 'প্রবাসচিত্র' নামে পুস্তকাকারে ছাপতে এবং গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়কে প্রকাশক হতে রাজি করান। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স প্রকাশনা থেকে 'প্রবাসচিত্র' প্রকাশিত হওয়ার পরে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় নিজেই উদ্যোগী হয়ে জলধর সেনের কেদারনাথ ও বদরিকাশ্রম ভ্রমণের কাহিনী প্রকাশ করেন 'হিমালয়' গ্রন্থে। বলাবাহুল্য, এই দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পরে জলধর সেন বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে পাঠকমহলে ভ্রমণসাহিত্য রচয়িতা রূপে পরিচিতি লাভ করেন। বিশেষত হিমালয়ভ্রমণ সাহিত্য রচয়িতা রূপে। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও সমালোচক নারায়ণ চৌধুরী এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "আজ বাংলা ভাষায় হিমালয় নিয়ে অনেক বই রচিত হয়েছে। কেদার-বদরী ভ্রমণের ওপরই প্রায় পনেরো-বিশখানা বই আছে। দু'-একটি বই জনপ্রিয়তার দরুণ সিনেমায়ও রূপায়িত হয়েছে। হিমালয় সম্পর্কিত রচনার আধিক্যের কারণে 'হিমালয়সাহিত্য' নামে স্বতন্ত্র শাখার সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু অনেকেরই হয়তো জানার কথা নয়, এই স্বতন্ত্র ধারার সূত্রপাত করে যান জলধর সেন। তাঁর 'হিমালয়' বইখানা এইক্ষেত্রে অগ্রপথিকের মর্যাদা দাবি করতে পারে। বিশ শতকের গোড়ায় সেই যে তিনি হিমালয় কাহিনির ঐতিহ্যের প্রবর্তন করে যান তারপর থেকে সেই ঐতিহ্যের রেখাচিহ্নের

ওপর একটানা দাগ বুলোনো চলছে। অদ্যাবধি সেই প্রক্রিয়ার বিরাম হয়নি''।

জলধর সেনের হিমালয়ভ্রমণ সাহিত্য বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থের মধ্যে 'প্রবাসচিত্র', 'হিমালয়', 'পথিক', 'হিমাদ্রী', 'হিমালয় বক্ষে' ও 'পুরাতন পঞ্জিকা'র নাম উল্লেখযোগ্য। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স থেকে প্রকাশিত 'প্রবাসচিত্র' গ্রন্থের যে সংস্করণটি আমার কাছে আছে, তা পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণের দশম মুদ্রণ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৪১-৪৩ সালের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীদের দ্রুত পঠনের জন্য নির্ধারিত। গ্রন্থের নিবেদন কলমে অর্থাৎ নতুন সংস্করণের প্রথম মুদ্রণে ১ অগ্রহায়ণ ১৩৪৪ সালে তিনি লিখেছেন, ''এতকাল পরে 'প্রবাসচিত্র'র একটি পরিবর্তিত, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজন অনুভূত হইল। এই পুস্তকের প্রবন্ধগুলি যখন প্রকাশিত হয় তাহার পর বহু বৎসর চলিয়া গিয়াছে। সাধারণ পাঠক-পাঠিকাগণের জন্যই এই প্রবন্ধগুলি লিখিত হইয়াছিল। এখন স্কুলের উচ্চশ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদিগের সম্পূর্ণ পাঠোপযোগী করিবার জন্য অনেকস্থলে পরিবর্ধন, পরিবর্জন করা হইল। বলাবাহুল্য, এই নূতন সংস্করণ বিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদিগের জন্যই গ্রথিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ্য ভাইস চ্যান্সেলার মহোদয় বাংলা ভাষার বানান সম্বন্ধে যে নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন, এই পুস্তকে সে নির্দেশ যথাযথ অনুসৃত হইয়াছে''।

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে 'প্রবাসচিত্র'র পুরোনো সংস্করণের সঙ্গে নতুন সংস্করণের একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে। পুরোনো সংস্করণ ছিল সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের জন্য আর নতুন সংস্করণ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। তবে উভয় সংস্করণে অধ্যায়গুলি একই রাখা হয়েছে এবং ভ্রমণের বর্ণনারীতিও একই। গ্রন্থে মোট বারোটি অধ্যায় আছে প্রবাস-যাত্রা, গুরুদ্বার, লালাপানি, কলুংগার যুদ্ধ, টপকেশ্বর, গুচ্ছপাণি, চন্দ্রভাগা-তীরে, সহস্রধারা, মুশৌরি, তিহরি, অতিপ্রাকৃত কথা ও উত্তরকাশী। জলধর সেন ভ্রমণস্থানগুলিতে অনেক ক্ষেত্রেই কোনো না কোনো সঙ্গীসহ গিয়েছিলেন। অধিকাংশ সঙ্গীরাই ছিলেন তাঁর দেরাদুনের বন্ধু। তবে কোনো ভ্রমণসঙ্গীর নাম তিনি উল্লেখ করেননি। দেরাদুনে থাকাকালীন তিনি দেরাদুন পার্শ্ববর্তী হিমালয়ের যেসব স্থানে ভ্রমণ করেছিলেন, 'প্রবাসচিত্র' গ্রন্থে সেইসব স্থানের ভ্রমণ বৃত্তান্তই সংকলিত হয়েছে। সেইসঙ্গে তিনি সেইসব স্থানের ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক বিবরণও দিয়েছেন। যেমন রামরায়ের জীবনকথা, কলুংগার যুদ্ধ, তিহরি রাজ্যের তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও দ্বন্দ্বের কথা। স্বাভাবিক কারণেই এই ভ্রমণকাহিনির একটি ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্য আছে। 'মুশৌরি' অধ্যায় পড়ে জানা যায় সেই সময়ের মুসৌরিবাসী সাহেবদের আচার আচরণ, কেননা তখন মুসৌরি ছিল উচ্চশ্রেণির ইংরেজদের গ্রীষ্মাবাস। আবার 'কলুংগার যুদ্ধ' অধ্যায় পড়ে আমরা জানতে পারি, ১৮১৪ সালে ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে নেপালের বীর বলভদ্র সিংহের যুদ্ধের কাহিনি। অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে পাহাড়ের দুর্গ রক্ষার জন্য বলভদ্র সিংহ যে অসম সাহসিকতায় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে তা বর্ণনা করেছেন লেখক। 'গুরুদ্বার' অধ্যায়ে জানা যায়, দেরাদুন শহরের নামকরণের ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক কাহিনি। রামরায় শিখগুরু পদলাভে বারবার ব্যর্থ হয়ে, বিশেষত গোবিন্দ সিংহ শিখগুরু হওয়ায় তাঁর সব আশা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পর তিনি স্বদেশ থেকে বিদায়গ্রহণ করে গুরু নানকের নামে ধর্মসম্প্রদায়ের অধিনায়কত্ব করার ব্রত গ্রহণ করেন। তিনি নির্জনাবাসের জন্য দিল্লীশ্বরের কাছ থেকে গাড়োয়াল রাজ্যের রাজার নামে একটি অনুরোধপত্র নিয়ে ১৬৯৯ সালে সেই পার্বত্য প্রদেশে উপস্থিত হন। গাড়োয়াল রাজার অনুমতিতে তিনি কিছুদিন সশিষ্য কাণ্ডলী নামক স্থানে বাস করেন। তারপর ধামুওয়ালা'তে স্থায়ী আস্তানা গড়েন। এখানেই গুরুদ্বার মন্দির স্থাপিত হয়। মন্দিরের নামে স্থানের নাম প্রথমে গুরুদ্বার বা গুরুদেরা হয়। পরবর্তীকালে গুরু শব্দটি লোপ পায় এবং জায়গাটি দুন প্রদেশের অন্তর্গত হওয়ায় দেরাদুন নামে পরিচিত হয়। এই ঐতিহাসিক বিবরণের পাশাপাশি লেখক উল্লেখ করেছেন একটি পৌরাণিক কাহিনিও। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস যে, এই স্থানটি ছিল কুরু ও পাণ্ডবদের অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের বাসস্থান। এই দ্রোণ শব্দ থেকেই নাকি প্রদেশের নাম দুন হয়েছে। আর তাই দ্রোণের দেরা থেকে দেরাদুন নামকরণ। ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক মূল্য ছাড়াও এই ভ্রমণবৃত্তান্তের সামাজিক মূল্যও কম নয়। কেননা তৎকালীন পাহাড়ি মানুষদের জীবনের যে চিত্রগুলি এখানে অঙ্কিত হয়েছে, তাতে তাদের সামাজিক জীবন সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়। বিশেষত 'চন্দ্রভাগা-তীরে' অধ্যায়ে একটি কৃষক পরিবারে একটি রাত কাটানোর অবসরে লেখক তাদের যে সান্নিধ্য ও আন্তরিকতা পেয়েছিলেন, লেখকের বর্ণনা গুণে তা পাঠক-পাঠিকাদের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, এই চন্দ্রভাগা নদী কিন্তু পাঞ্জাবের সেই বিখ্যাত নদী নয়, বরং হিমালয়েরই একটি ছোট্ট নদী। আবার গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় অর্থাৎ 'প্রবাস-যাত্রা' রচনাটিকে একটি ছোটগল্পও বলা যেতে পারে। লেখকের নিপুণ বর্ণনায় ও দক্ষতায় লেখাটি ছোটগল্পের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। অনুরূপে 'অতিপ্রাকৃত কথা' অধ্যায়ে লেখক যে তথাকথিত অলৌকিক ঘটনার কথা বর্ণনা করেছেন, তার মধ্যেও ছোটগল্পের আস্বাদ পাওয়া যায়।

জলধর সেনের বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রের ওপর যে দখল ছিল, তারও পরিচয় পাওয়া যায় বিভিন্ন অধ্যায়ে। যেমন 'নালাপানি' অধ্যায়ে জানা যায়, তিনি যে সন্ন্যাসীর সঙ্গে আশ্রমে দেখা করতে গিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে তিনি আলোচনা করেছিলেন মায়াবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, অবতারবাদ, জন্মান্তরবাদ ইত্যাদি বিষয়ে। আবার 'তিহরি' অধ্যায়ে তিহরির গঙ্গার পাশের একটি দেবালয়ের পুরোহিতের সঙ্গেও তাঁর যৎসামান্য শাস্ত্র আলোচনার কথা বর্ণিত হয়েছে।

জলধর সেনের হিমালয়ভ্রমণ সাহিত্য'র সব থেকে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'হিমালয়'। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত এই গ্রন্থের ষোড়শ সংস্করণের একটি কপি আমার কাছে আছে। গ্রন্থটি কলকাতা, ঢাকা ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় একটি বিজ্ঞাপনে লিখেছিলেন, ''জলধরবাবুর পুস্তকের নাম করিতে হইলে সর্বপ্রথম 'হিমালয়'য়ের কথা বলিতে হয়। এই পুস্তকখানি লিখিয়া জলধরবাবু যদি তাঁহার লেখনীকে একেবারে বিশ্রাম দিতেন, তাহা হইলেও তাঁহাকে সর্বপ্রধান ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখক বলিয়া সাহিত্যজগৎ অভ্যর্থনা করিত''।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেদারনাথ ও বদরিকাশ্রম ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা জলধর সেনের ছোটোবেলা থেকেই ছিল। দুর্গম হিমালয়ের

দুর্নিবার আকর্ষণ তাঁর মনকে উতলা করে তুলত। দেরাদুনে থাকার সময় তাঁর প্রায়ই মনে হত, "মধ্যেমধ্যে ভারী একটা দুর্দমনীয় বাসনা হত একেবারে পাহাড়ের মধ্যে ডুবে যাই, খুব একটা লম্বা পথ যাত্রা করি, নিতান্ত সন্ধান না হয়, নিরুদ্দেশ যাত্রাই করা যাক। তাতে কার কী ক্ষতি?"

অতঃপর সুযোগ ঘটল। হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় পূর্বপরিচিত এক বৃদ্ধ বাঙালি সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর সেই সন্ন্যাসীর সঙ্গেই তিনি কেদারনাথ ও বদরিকাশ্রমের উদ্দেশ্যে পদব্রজে যাত্রা করেন। এবং বলাবাহুল্য, এই ভ্রমণের বৃত্তান্তই সংকলিত হয়েছে 'হিমালয়' গ্রন্থে। মোট অধ্যায় আছে আঠারোটি। পদব্রজে, দেবপ্রয়াগের পথে, দেবপ্রয়াগ, শ্রীনগর, রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগের পথে, কর্ণপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ, যোশীমঠের পথে, যোশীমঠ, বিষ্ণুপ্রয়াগ, পাণ্ডুকেশ্বর, বদরিকাশ্রমে, বদরিনাথ, বদরিকাশ্রমে নারায়ণ দর্শন, ব্যাসগুহা, বিশ্রাম, প্রত্যাবর্তন। এই অধ্যায়গুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার আগে প্রকাশিত হয়েছিল 'ভারতী' পত্রিকায়। কেদারনাথ ও বদরিকাশ্রমের পথে জলধর সেন যাত্রা করেন ৬ মে ভোরবেলায়। তার আগের দিন থেকেই তিনি শুরু করেছিলেন ডায়েরি লেখা। বস্তুতপক্ষে ৫ মে থেকে শুরু করে ৮জুন পর্যন্ত তিনি নিয়মিতভাবে তাঁর যাত্রাপথের সমস্ত খুঁটিনাটি ঘটনা ও তথ্য লিপিবদ্ধ করে রাখেন। ৮জুনের পর আর ডায়েরি লেখেননি। তাঁর এই ডায়েরি লেখার আদেও কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। ভবিষ্যতে ভ্রমণবৃন্তান্ত লেখারও কোনো পরিকল্পনা ছিল না। তিনি নিজেই এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, "কোনোদিন আমার ভ্রমণকাহিনি মানুষের নিকট বলতে হবে সে কথা তো তখন আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। আর যে দেশে ফিরে আসব, সে চিন্তাও একদিনের জন্যেও আমার মনে হয়নি। ডায়েরি লিখবার অভিপ্রায়ও আমার ছিল না। আমার সঙ্গে একখানি গানের বই ছিল, সেই বই যখন ভালো করে বাঁধান হয়, সেই সময়ে তাতে কতকগুলি সাদা কাগজ জুড়ে রাখি, উদ্দেশ্য নূতন নূতন গান পেলে সেখানে লিখব। যখন নারায়ণের পথে যাই, সে সময়ে সেই খাতায় সাদা কাগজ দেখে স্বামীজী আমাকে কিছু লিখে রাখতে বলেন এবং তাঁরই আদেশে আমি যে দিন যেখানে যা দেখেছিলাম, তা লিখে রাখি। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের পথে শ্রীনগর অবধি এসে আর আমার লেখার তেমন ইচ্ছা হল না"।

জলধর সেন হিমালয় থেকে ফিরে আসার পর এই ডায়েরি ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করার কোনো তাগিদ অনুভব করেননি। আসলে আত্মপ্রচারবিমুখ নিরহংকার এই মানুষটির লেখক রূপে খ্যাতিলাভ করার কোনো বাসনা ছিল না। কিন্তু তাঁর সুহৃদ ও শুভানুধ্যায়ী সাহিত্যিক দীনেন্দ্রকুমার রায় এই ডায়েরির সন্ধান পান এবং তা প্রকাশ করার জন্য আগ্রহী হন। বলাবাহুল্য, দীনেন্দ্রকুমার রায়ের একান্ত আগ্রহেই জলধর সেনের 'হিমালয়' গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ায়বাংলা ভ্রমণসাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছিল। দীনেন্দ্রকুমার রায় এই গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, "জলধরবাবুর ন্যায় স্বভাবভীরু লোক সহজে আত্মপ্রকাশ করিতে চাহেন না। বর্তমান ভূমিকা লেখকের সহিত এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত সাধারণের সম্মুখে প্রকাশ বিষয়ে কিছু সম্বন্ধ আছে। আমি তাঁহার ডায়েরিখানি তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া যদি হিমালয়-কাহিনি যথানিয়মে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশ না করিতাম, তাহা হইলে তিনি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া বঙ্গভাষায় এ রত্ন প্রকাশ করিতেন কিনা এ সম্বন্ধে আমার এবং যাঁহারা জলধরবাবুকে জানেন, তাঁহাদের অনেকেরই সন্দেহ আছে"।

'হিমালয়' গ্রন্থে হিমালয়ের প্রকৃতি ও মানুষের অনবদ্য বর্ণনা করেছেন জলধর সেন। উল্লেখ করেছেন বিভিন্ন আকর্ষণীয় তথ্য। যেমন, লছমন ঝোলার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন তিনি। বর্তমানে যে ঝোলাটি আছে, তা বহু অর্থ ব্যয়ে নির্মাণ করিয়েছেন কলকাতার প্রসিদ্ধ ধনী রায় সুরজমল ঝুনঝুনওয়ালা বাহাদুর ১৮৮০ সালে। প্রসঙ্গত, লেখক পূর্বের লছমন ঝোলার বর্ণনা করেছেন, "প্রথমে একটা দড়ির সিঁড়ি প্রস্তুত করতে হয়, খুব মোটা দু'গাছা দড়ি সমান্তরালভাবে বসিয়ে, তার মাঝে মাঝে সিঁড়িতে যেমন পা দেওয়ার জন্য কাঠ থাকে, তেমনি ছোটো ছোটো শক্ত কাঠ বেশ ভালো করে বেঁধে সেই দড়ির সিঁড়িগাছাটা নদীর দুই পাড়ে বেশ করে আটকিয়ে দেয়। তার ওপরে পা দিয়ে পার হতে হয় এবং হাতে ধরবার জন্য নীচে যেমন ওপরেও সেইরকম দুটো শক্ত রশি এপার ওপার বেঁধে দেয়। সেই রশি দুই কুক্ষির মধ্য দিয়ে দু-হাতে ধরে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে হয়। একবার মনে করুন, ব্যাপারটা কী ভয়ানক! দুই কুক্ষির মধ্যে দুই রশি আর পা সেই রশি নির্মিত সিঁড়ির ওপর। পায়ের তলায় চার পাঁচশো হাত নীচে ভয়ানক বেগবতী গঙ্গা। একবার কোনো রকমে পা পিছলে গেলে আর রক্ষা নেই"।

এমনই আর একটি অজানা তথ্য জানা যায় 'দেবপ্রয়াগ' অধ্যায়ে। লেখক উল্লেখ করেছেন, দেবপ্রয়াগ অবস্থিত গঙ্গা ও অলকনন্দার সঙ্গমস্থলে। যেহেতু গঙ্গার মাহাত্ম্য বেশি তাই সাধারণ মানুষের ধারণা, গঙ্গায় এসে মিশেছে অলকনন্দা। কিন্তু লেখক দেখে নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, অলকনন্দায় এসে মিশেছে গঙ্গা।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, যাত্রাপথে তাঁদের সঙ্গে এক বাঙালি যুবক সন্ন্যাসীর পরিচয় ঘটে এবং তিনিও তাঁদের সঙ্গী হন। বস্তুতপক্ষে দেবপ্রয়াগের পথে কান্তি চটিতে তাঁদের পরিচয় হয়েছিল। তাঁর বাড়ি ঢাকা অঞ্চলে, বৈদিক ব্রাহ্মণের ছেলে, ইংরেজি জানেন না, সংস্কৃত জানেন। বাবা, মা, স্ত্রী সবাইকে ছেড়ে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেছেন। কেন করেছেন, তা লেখকের অজানা। শান্তি কতটা পেয়েছেন, তাও জানা নেই। যুবকটি ঘোর বৈদান্তিক। জলধর সেন এই যুবকটি সম্পর্কে কৌতুক করে লিখেছেন, "বাবাজীর এখনকার নাম অচ্যুতানন্দ সরস্বতী। বঙ্কিমবাবুর 'আনন্দমঠ'এর সবই আনন্দ, আর মঠের সন্ন্যাসীদের নামেও অধিকাংশই আনন্দ। নামে আনন্দ আছে বটে, কিন্তু তা কার কতদূর ভোগে লাগে, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ। শুধুই চিনির বলদের মতো 'আনন্দের' বোঝা ঘাড়ে বয়ে বেড়ানো মাত্র"।

আবার তাঁর সহযাত্রী বাঙালি বৃদ্ধ স্বামীজী সন্ন্যাসীর কোনো সামাজিক পরিচয় না দিলেও তাঁর মনের অন্তরঙ্গ পরিচয় দিয়েছেন। রুদ্রপ্রয়াগে জলধর সেন খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর অসুস্থতায় কাতর হয়ে পড়েন স্বামীজী। লেখক এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, "তাঁর কাতরতা দেখে একবার বলতে ইচ্ছে হল, হে বৈরাগ্যাবলম্বী পুরুষ-প্রবর, বৃথা তোমার বৈরাগ্য। এখনো তোমার মনে দুঃখ শোক স্থান পায়, এখনো তুমি বন্ধনের দাস। কিন্তু তখনই মনে হল, এ কাতরতা তাঁর নিজের জন্য নয়, পরের জন্য। এ অশ্রু নিজের দুঃখে নয়, পরের কষ্টে। পৃথিবীর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেও যিনি সকলের প্রতি স্নেহপরায়ণ, তাঁরই যথার্থ বৈরাগ্য, নতুবা জনমানবের সাড়াশব্দশূন্য জঙ্গলে বসে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অলীক বলে নাসাগ্রে দৃষ্টিবদ্ধ করে কাল কাটানোতে

বিশেষ কিছু যে মহত্ত্ব আছে, তাহা আমার বোধ হয় না"।

অন্যদিকে, লেখক উপস্থিত করেছেন কমলেশ্বর মন্দিরের মোহান্তকে। তিনি লিখেছেন, "বর্তমান মোহান্তের বয়স পঁয়ত্রিশ ও চল্লিশের মধ্যে বোধ হল, দেখতে বেশ হৃষ্টপুষ্ট। কোনো মঠের মোহান্তকেই তো এ পর্যন্ত কাহিল দেখলাম না। মহাদেবের সেবাইত ও ষণ্ড উভয়েই চিরকাল দিব্য সুগোল দেহ"।

'প্রবাসচিত্র' ও 'হিমালয়' গ্রন্থ ছাড়া হিমালয় ভ্রমণের আরও বৃত্তান্ত জলধর সেন লিপিবদ্ধ করেছেন 'পথিক', 'হিমাদ্রি', 'হিমালয় বক্ষে', 'পুরাতন পঞ্জিকা' ইত্যাদি গ্রন্থে। 'পথিক' গ্রন্থে তিহরি থেকে মুসৌরি ভ্রমণের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এই পথে লেখক গঙ্গোত্রীতে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, যদিও তাঁর সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। 'প্রবাসচিত্র' ও 'হিমালয়' গ্রন্থে যে মূল সুর ধ্বনিত হতে দেখা যায়, 'পথিক'এর মধ্যেও সেই একই সুর খুঁজে পাওয়া যায়। গ্রন্থে সূচনায় তিনি লিখেছেন, "আমি পথিক, ভিখারী পথিক, সমস্ত সংসারটাই যে পথিক, যে চলে সেই পথিক। কোথাও তো কেহ বসিয়া নাই। ... আমার পথের কথা শীঘ্র শীঘ্র শেষ হইবার নহে। হিমালয় পর্বতের পথের সঙ্গে আমার একটা সম্বন্ধ হইয়া গিয়াছিল ; আমি পথ দেখিয়া ভয় পাইতাম না, এতটা পথ চলিতে হইবে ভাবিয়া আমি কোনদিন মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়ি নাই। পথ যত দূর বিস্তৃত, যত বন্ধুর, যত চড়াই উতরাই পূর্ণ, আমার স্ফূর্তি তত বেশী হইত। জীবনের অন্যান্য সংগ্রামে আমি পরাজিত, কিন্তু পথের সহিত সংগ্রামের? সে সংগ্রামে আমি একসময়ে অপরাজিত ছিলাম"। সেইসঙ্গে লেখক জানিয়েছেন, "সহৃদয় পাঠকগণ 'পথিক'কে 'প্রবাসচিত্র' ও 'হিমালয়'এর পরিশিষ্ট স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারেন"।

আবার 'হিমাদ্রি' গ্রন্থটি 'হিমালয়'এর একটি কিশোর পাঠ্য সংস্করণ। গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক উল্লেখ করেছেন, "হিমাদ্রি নূতন পুস্তক নহে, ইহা আমার প্রণীত 'হিমালয়'এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। আমার 'হিমালয়' যে ভাষায় লিখিত এবং তাহার মধ্যে হিমালয়ের যে সমস্ত কথা আছে তাহা বিদ্যালয়ের বালক-বালিকাদিগের পাঠোপযোগী নহে বলিয়া অনেকে মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদেরই বিশেষ অনুরোধে 'হিমালয়'এর ভাষার পরিবর্তন ও অনেক স্থান পরিবর্জন করিয়া 'হিমাদ্রি' লিখিয়াছি"।

'পুরাতন পঞ্জিকা'য় যদিও বিভিন্ন ধরনের লেখা সংকলিত হয়েছে, তবুও হিমালয় ভ্রমণ বিষয়ক তিনটি লেখা আছে, 'হিমালয়ের স্মৃতি', 'শ্রীনগর' ও 'তিহরির পথে'। 'হিমালয়' গ্রন্থের রচনাগুলি পত্রিকায় প্রকাশের অনেকদিন পর 'পুরাতন পঞ্জিকা'র এই তিনটি লেখা প্রকাশ করেছিলেন। 'হিমালয়' গ্রন্থে জানা যায় যে, লেখক ৮ জুনের পর থেকে আর ডায়েরি লেখেননি, অর্থাৎ হিমালয় থেকে ফেরার পথে শ্রীনগরে প্রবেশের আগেই নিয়মিত ডায়েরি লেখা বন্ধ করেছিলেন। তবুও অনিয়মিতভাবে এরপর যৎসামান্য যে বিবরণ লিখেছিলেন, তারই ভিত্তিতে পরবর্তীকালে এই তিনটি লেখা লিখেছিলেন। 'হিমালয়ের স্মৃতি' অবশ্য নিছকই একটি ভূমিকা। নতুন করে হিমালয়ের ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখার আগে যে ধরনের ভূমিকা লেখা প্রয়োজন হয়, এটা তাই। তিনি লিখেছেন, "আমার সেই বহু পুরাতন পর্বতবাসের চিরসঙ্গী শ্রীভ্রষ্ট ডায়েরিখানির পৃষ্ঠা কতদিনের পর আজ নূতন করিয়া খুলিলাম। অনেকদিন ইহা খুলি নাই, কৃপণের ধনের মতো অতি যত্নে ইহা তুলিয়া রাখিয়াছিলাম। আজ অতি সন্তর্পণে তাহা খুলিয়া দেখিতেছি ঐ পেন্সিলে লেখা পথের বিবরণ অপরিচ্ছন্ন ও নিতান্ত অশোভন হইলেও আমি ইহার ভেতর দিয়া বিশালাকায় হিমালয়ের সুবিরাট সুপ্রশস্ত সুগম্ভীর শোভা নিরীক্ষণ করিতেছি। ইহার প্রতিপত্রে প্রতিচ্ছত্রের ভেতর কত সুদীর্ঘ দিবসের অলিখিত কাহিনি, কত নিদ্রাহীন নিঃসঙ্গ যামিনীর দুঃসহ কন্টকশয্যার সকরুণ বার্তা আমার অতীত স্মৃতি উজ্জ্বলরূপে বিকশিত করিবার জন্য মূকভাবে প্রতীক্ষা করিতেছে তাহা মনে করিলে নানাভাবে হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠে"।

পরিশেষে, একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন, জলধর সেনের হিমালয়ভ্রমণ সাহিত্য পাঠে এখনও পর্যন্ত পাঠক-পাঠিকাদের মন অভিভূত হয়, হিমালয়ের পবিত্র মহিমার কথা স্মরণ করে হৃদয় শ্রদ্ধাবনত হয়; কিন্তু স্বয়ং লেখক তা রচনা করে আদেও তৃপ্তিলাভ করতে পারেননি। নিজের অক্ষমতায় ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি লিখেছেন, "হিমালয়ের পরম পবিত্র মহিমা আমি কীর্তন করিতে পারি নাই। যেটি যেমন করে বললে ভালো হত, যেটি যেভাবে বর্ণনা করলে ঠিক কথাটি বলা হত, আমার দুর্বল লেখনী তা বলতে পারেনি। যে দৃশ্যের সম্মুখে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর সর্বপ্রধান শিল্পী নিজের দুর্বল হস্তের অযোগ্যতায় কাতর হয়ে তুলিকা দূরে নিক্ষেপ করে সেই মহান দৃশ্যের সম্মুখে করজোড়ে দাঁড়িয়ে থেকেই কৃতার্থ হন, আমি সেই হিমালয়ের মহিমা বলতে গিয়েছিলুম, আমার স্পর্দ্ধা কম নয়!"

জলধর সেনের হিমালয়ভ্রমণ সাহিত্য বিষয়ে এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করলাম। তবে তাঁর ভ্রমণসাহিত্য শুধুমাত্র হিমালয়েই সীমাবদ্ধ নয়। পরবর্তীকালে তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করেন এবং সেইসব ভ্রমণ বৃত্তান্তগুলি প্রথমে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এবং পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থগুলি হল, 'দশদিন','দক্ষিণাপথ', 'মধ্যভারত' এবং 'মুসাফির মঞ্জিল'। এছাড়া তিনি ইংরেজিতে একটি লেখা ভ্রমণগ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেন। বর্ধমানাধিপতি বিজয়চাঁদ মহতাব বাহাদুরের 'ঋজ্রঙ্গব্দব্দনক্সব্দ' শীর্ষক গ্রন্থটি জলধর সেন 'আমার ইউরোপ ভ্রমণ' নামে অনুবাদ করেন। প্রথমে সেই অনুবাদ তাঁরই সম্পাদিত 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরে গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত হয়।

কলকাতার কথকতা

উপগুপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

১৬৯০ সালের ২৪ আগস্ট ছিল রবিবার। বাংলায় ২৩ ভাদ্র ১০৯৭। তিথি ছিল সকালে আষাঢ় অমাবস্যা। পরে শ্রাবণ শুক্লা প্রতিপদ। সুতানুটির ঘাটে রবিবারের ভরদুপুরে সাহেবের নানা মাপের পাঁচখানি জাহাজ এসে লাগে। ঠিক সেই সময়েই লেখা হয়ে যায় এক বাঁধনছেঁড়া শহরের পত্তনের কথা। সেই সাহেব জব চার্নক, ফিরিঙ্গি বণিক -- সুতানুটি, গোবিন্দপুর আর কলকাতা, এই তিনটি গ্রামকে একসঙ্গে করে পত্তন করেন কলকাতা শহরের। কবির লেখনি ধরে পায়ে পায়ে হেঁটে আসে সে শহরের ইতিবৃত্ত। আমরা কলকাতাকে পাই ইতিহাসের পটভূমিকায় ঃ-

"আমি তো শতাব্দীপারে চলে গেছি কতদূর সুতানুটি গ্রামে
কিছু চালাঘর নীল জলাভূমি দু'পাশে গভীর
গোলপাতা, হোগলা বনের বুকে নোনা হাওয়া---
চার্নক সাহেব
দেখতো এখানে কোনো শহরের পত্তন হবে কি কোনোদিন..."

১৬৯০ সালের আগস্ট মাসের ২ তারিখ। শায়েস্তা খাঁ-র লোকজনের সঙ্গে ইংরেজদের মারামারি চলছিল হুগলিতে। যুদ্ধে নবাবের সৈন্যসামন্ত পরাজিত হলেও জব চার্নক ঠিক করলেন হুগলিতে থাকবেন না। রওনা দিলেন সেসময়ের উড়িষ্যার বালেশ্বরের দিকে। ওই ২৪ তারিখ জলপথে জাহাজে করে যেতে যেতে তাঁর চোখে পড়ল মাটি আর খড়ের বাড়ি। খোঁজ করে জানলেন এ গ্রামের নাম সুতানুটি। দলবলসহ নেমে পড়লেন সেখানেই। ইংরেজদের হাতে পত্তন হল কলকাতার। শহরের জনক হিসেবে রয়ে গেল জব চার্নকের নাম। নবাব ইব্রাহিম খাঁ ইংরেজদের এখানে দুর্গ বানাবার অনুমতি দিলেন। তিন বছর পর জব চার্নক মারা গেলেন, তাঁর জামাই কলকাতার ইংরেজ কুঠির সর্দার। নবাবের কথা শুনেই ইংরেজরা নেমে পড়ল দুর্গ বানাতে। ইংরেজদের প্রথম দুর্গ তৈরি হল লালদিঘির পাশে, ফোর্ট উইলিয়াম। এই দিঘির পাড়েই ছিল বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছারি। আকবরের আমলে বেহালা থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এদের জমিদারি। দোল উৎসবের দিন লাল রঙের আবিরে রাঙা হত এই দিঘি। তাই এটা লালদিঘি। আবার কেউ কেউ বলে এই জলাশয়ের পাড়ে ইংরেজরা বানাল লালকেল্লা, তাই এই দিঘি লালদিঘি। আর তার পাশের রাস্তার নাম লালবাজার। চৌরঙ্গীতে তখন দিনেরাতে বাঘ, ভালুক আর বুনো শুয়োরের ছড়াছড়ি। ঘন জঙ্গল। খোজা সবহদ নামে এক আরমেনিয়ান সম্রাট ঔরঙ্গজেবের পৌত্র বাংলার নবাব আজিম ওসমানের কাছ থেকে বাগালেন এক অনুমতিপত্র। সেই অনুমতিপত্র দেখিয়ে ইংরেজরা মাত্র তেরোশো টাকার বিনিময়ে সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছ থেকে ক্রয় করে নিলেন সুতানুটি, গোবিন্দপুর আর কলকাতা নামের তিনটি গ্রাম। বাগবাজারের খালের শুরু থেকে বড়বাজারের টাঁকশাল যা এখন আর নেই, সেই পর্যন্ত ছিল সুতানুটি গ্রাম। তারপর থেকে দক্ষিণের জঙ্গল পর্যন্ত কলকাতা। আর কলকাতার দক্ষিণ থেকে এখনকার ভবানীপুর পর্যন্ত গ্রামের নাম ছিল গোবিন্দপুর। এই তিনটি গ্রাম নিয়েই কলকাতা শহরের পত্তন হল। গবেষকদের অনেকের মতে, যেখানকার নাম কলকাতা, আগে সেখানে নদীর পাড়ে বাস করত জেলেরা। তাদের তৈরি চুনের ভাটির চুনকে বলা হত কলি। ভাটির ডাক নাম কাতা। এই দুই শব্দের মিলনেই হল কলকাতা।

এখানেই ১৭০৯-এ স্থাপিত হল ইংরেজদের প্রথম গির্জা সেন্ট অ্যান। এর অন্য নামও ছিল। ফোর্ট উইলিয়াম গির্জা। এর উত্তরদিকে স্থাপিত হল 'সাহেব পাড়া' বা হোয়াইট টাউন আর দক্ষিণদিকে জন্ম নিল 'নেটিভ টাউন' বা দিশি লোকেদের পাড়া। উত্তরদিকে খানিক এগোলে চিত্রেশ্বরী মন্দির থেকে জন্ম নিল চিৎপুর রোড আর দক্ষিণে কালীঘাট। ইংরেজরা চিৎপুরের রাস্তাকে বলত 'রোড টু কালীঘাট'। এদিকে ১৭০৭-এ মারা গেছেন ঔরঙ্গজেব। বাংলার মসনদে আলিবর্দি খাঁ। গড়ে উঠছে কলকাতা। চার-চারটে কোর্ট বসে গেল ১৭২৭-এ। তার মধ্যে নামজাদা মেয়রস কোর্ট। এই থেকেই আজকের 'ওল্ড কোর্ট হাউজ স্ট্রিট'এর জন্ম।

বড়বাজারে দেশি-বিদেশি ব্যবসাদাররা ভিড় বাড়াচ্ছে। দ্রুত কলকাতা জনবহুল হয়ে উঠছে। এমন সময় ১৭৩৭-এ একপ্রবল ঝড়ে ঘরবাড়ি ভাঙল কলকাতার, নদীতে ডুবল নৌকা, জাহাজ। গোবিন্দরামের তৈরি 'ব্ল্যাক' প্যাগোডা বা নবরত্ন মন্দিরের ন'টি চূড়ার তিনটি-চারটি চূড়া ভেঙে গেল। সেই বিপর্যয় কাটিয়ে উঠে আবার কলকাতাকে নতুন করে গড়ে তোলা হল। এদিকে, সেই সময়েই শুরু হল বর্গিদের হানা। ইংরেজরা প্রমাদ গুনল ! শহরের চারপাশে তারা কামানের ঘাঁটি গড়ল। বাগবাজার থেকে হেস্টিংস পর্যন্ত খাল কাটা শুরু হল। অনেক পরে ওই খাল ভরাট করে জন্ম নিল আজকের আপার আর লোয়ার সার্কুলার রোড। বর্গির হানাদাররা কিন্তু কলকাতা পর্যন্ত ঢুকতে পারল না। তারা এল হুগলি পর্যন্ত। কিন্তু বর্গির ভয়েই নানাদিক থেকে মানুষজন ছুটে এল কলকাতা শহরে বসবাস করবে বলে। দ্রুত কলকাতার বন জঙ্গল সাফ হতে থাকল। জলাজমি, ডোবা, পুকুর বুজিয়ে জোড়াসাঁকো, জোড়াবাগান, কুমোরটুলি, হাটখোলা, বেলেঘাটাপ্রভৃতি অঞ্চলে প্রতিদিন নতুন নতুন বসত অঞ্চল গড়ে উঠতে লাগল। উত্তরে বাগবাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা বাজার, দক্ষিণে বেগমবাজার। মাঝখানে বড়বাজার, ধোবাবাজার। পূর্বে জানবাজার। তখনও কিন্তু পাকা বাড়ি কম কারণ পাকাবাড়ি তুলতে গেলে সাদা চামড়ার সাহেব সুবোদের কাছে দরবার করতে হত। এই সময়েই শুরু হল কলকাতার বাবুগিরি বা বাবু কালচার। কারণ ইংরেজদের খোষামোদ আর দালালি করে, তাদের কেনাবেচায় অংশ নিয়ে দিশি অঞ্চলের 'নেটিভ' লোকেদের হাতেও টাকা আসতে শুরু করেছে। ডালহৌসি এলাকায় ইংরেজদের একচ্ছত্র রাজত্ব। বাদবাকি অঞ্চলে বাবু আর শ্রমিকদের কলকাতা।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে এরপরেই কলকাতা তথা বাংলাকে ঘিরে ইতিহাসের মোড় ফেরা। ১৭৫৬-সালে বৃদ্ধ আলিবর্দি খাঁর মৃত্যু হল। বাংলার নবাবের মুকুট মাথায় পরলেন সিরাজ-উদ-দৌল্লা। আলিবর্দির স্নেহধন্য নাতি সদ্য তরুণ সিরাজ-উদ-দৌল্লা বাংলার মসনদে বসতে না বসতেই গুপ্তদূতরা খবর আনল কলকাতায় নতুন করে দুর্গ গড়ছে ইংরেজরা। শুনেই মীরমদন, মীরজাফর, রায়দুর্লভ, মানিকচাঁদদের মতো সেনাপতিদের নিয়ে তিরিশ হাজার সৈন্য সমেত সিরাজ-উদ-দৌল্লা হানা দিলেন কলকাতায়। ইংরেজদের তখন কিছু নেই। সৈন্যসামন্ত, কামান বারুদ না থাকায় তারা সাহায্য চাইল ফরাসি আর ডাচদের কাছে। কেউ এগিয়ে এল না। তাদের কাশিমবাজার কুঠি লুঠ হল। ১৭৫৬-এর ১৯ জুন নবাবের আক্রমণে স্বয়ং গভর্নর পর্যন্ত জাহাজে চেপে পলায়ন করলেন। কলকাতা জয় করে সিরাজ-উদ-দৌল্লা ফিরে গেলেন মুর্শিদাবাদে। সিরাজ কলকাতার নতুন নামকরণ করলেন আলিনগর। আলিবর্দি খাঁর স্মরণে। এরমধ্যে মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় এলেন রবার্ট ক্লাইভ। ছলে বলে কৌশলে কলকাতায় আবার ইংরেজদের দখলদারি কায়েম হল।

অবশেষে ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন। পলাশীর লক্ষবাগে--- 'ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর...' সেনাপতি, সামন্ত, অমাত্যদের বিশ্বাসঘাতকতায়, চোখের জলে ভেসে গেল বাংলার স্বাধীনতা, 'কী হল রে জান, পলাশীর ময়দানে ওড়ে কোম্পানীর নিশান'। লুঠ হল নবাবের রাজকোষ। দিল্লির সম্রাট শাহ আলম বিকিয়ে গেলেন ব্রিটিশদের কাছে। ইংরেজরা লাভ করল বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানি সনদ। এরপর ক্লাইভ ফিরে গেলেন ইংল্যান্ডে। পার্শি ভাষায় বুৎপত্তি আছে ওয়ারেন হেস্টিংসের। মীরজাফরের রাজদরবারে তিনি ছিলেন রেসিডেন্ট। গভর্নর হলেন হেস্টিংস। ১৭৭২ থেকে ১৭৮৫ টানা তেরো বছরের মধ্যে, তাঁর আমলে কলকাতা দেখল ৭৬-এর মন্বন্তর, মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি, বাবু কালচারের রমরমা। কলকাতার উন্নতিকল্পে ১৭৭৩-এ হেস্টিংস মুর্শিদাবাদকে সরিয়ে কলকাতাকে গড়ে তুললেন বাংলার রাজধানীরূপে। এ শহরের উন্নতিকল্পে আনলেন 'লটারি খেলা'।

এই লটারিতে সংগৃহীত অর্থ থেকেই বড়ো বড়ো রাস্তা, ঘরবাড়ি তৈরি হল এ শহরের। স্ট্র্যান্ড রোড, আমহার্স্ট স্ট্রিট, কলেজ স্ট্রিট, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, টাউন হল, হ্যারিসন রোড তৈরি হল এই অর্থে। হেস্টিংসের সময়ই চালর্স উইলকিন্স ও পঞ্চানন কর্মকারের নিষ্ঠা, ধৈর্য, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমে হুগলিতে তৈরি হল ছাপাখানা, বাংলাদেশ প্রথম দেখল বাংলা ভাষা ছাপার হরফ। হেস্টিংসের আমলেই স্যার উইলিয়াম জোন্স, যিনি ছিলেন একসময় সুপ্রিম কোর্টের জজ,প্রতিষ্ঠা করলেন এশিয়াটিক সোসাইটি। এই সময় থেকেই হিন্দু ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম, ইংরেজ, বাঙালিরা মিলেমিশে গেল। সাদা চামড়ার সাহেব বাঙালি হল, বাঙালি বা হিন্দুরা হতে লাগল সাহেব। কলকাতার উপরতলার সমাজে টাকা উড়তে লাগল। দোল, ঝুলন, দুর্গা, কালীপুজোয় এমনকী বিড়াল-মেনি বিড়ালের বিয়েতে টাকার শ্রাদ্ধ হত। আর নীচেরতলার মানুষ অনাহারে দুঃখে দারিদ্র্যে, মারি, মড়ক, মন্বন্তরে মরতেই থাকল। কলকাতার পুরোনো বাসিন্দা শেঠ আর বসাকরা অর্থবান হয়ে উঠল। শোভারাম বসাকের পুত্রবধূর নামে বৈঠকখানা বাজারের কাছের বাজারের নাম হল বৌবাজার। রথ, রাস আর দোলের উৎসবে উড়ত টাকা। এক-একটি ইংরেজ পরিবারে অসংখ্য ভৃত্য বা খিদমদগার থাকত। শোনা যায়, চারজন সদস্যের একটি ইংরেজ পরিবারের জন্য ১১০জন ভৃত্য নিযুক্ত ছিল। এই প্রসঙ্গে ভৃত্যদের কাজ অনুযায়ী নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। পাখা টানার লোককে বলা হত পাঙ্খাকুলি, রান্নার লোক বাবুর্চি, তামাক সাজত হুঁকো বরদার, জলের সরবরাহ করত আবদার, রান্না খাবার পরিবেশন করতো কম্পরদার, হাটবাজারে হিসাবরক্ষক কার্বাদার আর ঘোড়ার দেখভালের কাজ সহিসের। মদের জোগানদার ছিল সরাবদার। কুকুরদের দেখত ডুরিয়া, হাতির জন্য ছিল মাহুত আর আলোর দেখভাল করত ফরাস। এছাড়া ছিল খানসামা, মালি, সরকার, হরকরা, কোচম্যান, চোবাদার, ঘেসেড়া বা ঘাসুড়ে, জমাদার, বেয়ারা, আয়া, পর্তুগীজ হেড আয়া, মশালচী, খরচ পরদার এমন হরেক কিসিমের নামধারী ভৃত্য।

চৌরঙ্গীতে কলকাতার প্রথম ফুটপাত তৈরি হল ১৮৫৮ সালে। অবশ্য তার অনেক আগেই বাঙলা গেজেট যাকে বলা হত হিকির গেজেট তা প্রকাশিত ১৭৮০ তে। আর ১৮১৮-য় প্রথম বাংলা সংবাদপত্র সমাচার দর্পণ বেরোয়। ১৮৪৯-এ প্রথম এ শহরে সরকারি কাজে টেলিগ্রাফের লাইন পাতা হল। সাধারণের জন্য তা চালু হল ১৮৫১-তে। এই সময় চালু হল দোভাষীর কাজ। কলকাতার রতন সরকার লেন, ইংরেজদেরপ্রথম দোভাষীর নামে। এই সময়েই ১৭৮০ সালে খিদিরপুর ডক চালু হল, ১৮৫৫-য়প্রথম কলকাতা থেকে রানিগঞ্জ রেলগাড়ি চলল। যে গাড়ির ইঞ্জিনের নাম ছিল 'ফেয়ারীকুইন'। লর্ড ওয়েলেসলির আমলে কলকাতার রাজভবনের পত্তন হল ১৭৯৯-এ।

আর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ১৮০০ সালে। বাংলা ভাষায় প্রথম গদ্যের বই ছেপে বেরোল পরের বছরে।

রামরাম বসুর বই 'রাজাপ্রতাপাদিত্য'। সাহেবদের বাংলা শেখাবার জন্য এই বই ছাপিয়েছিল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। একজন রাশিয়ান গেরাসিম লেবেদফ কলকাতায় প্রথম থিয়েটার করেন ১৭৯৫-এ। ১৮২০ সালে শহরের কাঁচা রাস্তা পাকা করার কাজ শুরু হয় আর আলো জ্বলার ব্যবস্থা হল সিপাহী বিদ্রোহের বছরে, ১৮৫৭। পাঁচ লাখের কিছু বেশি টাকায় ১৮৭১ থেকে শুরু হয়ে ১৮৭৪-এ গড়ে উঠল হগ মার্কেট, স্যার স্টুয়ার্ট হগের নামে। যা আজ পরিচিত নিউ মার্কেট নামে। এই সময়েই ভাসমান হাওড়ার পুল নির্মিত হয়। খরচ পড়ে ছিল ১৮ লাখ টাকা, শুরু হয়েছিল ১৮৭৩-এ। একবছর পর ১৮৭৪-এ সম্পূর্ণ হয় কাজ। তখন চৌরঙ্গী অঞ্চলের সীমানা ছিল পূর্বে সার্কুলার রোড, দক্ষিণে পার্কস্ট্রিট, উত্তরে কলিঙ্গা আর পশ্চিমে এখনকার চৌরঙ্গী রোড। ১৮৭৫ সালে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল আজকের ভারতীয় যাদুঘরের, যার এখন অবস্থান জওহরলাল নেহরু রোডের ওপরেই। আর তার কিছু বছর আগে ১৮৫৪-তে সরকারি আর্ট কলেজের (ক্যালকাটা স্কুল, ফাইন আর্টস) প্রতিষ্ঠা হয়।

এবারে বলি অক্টোরলনী মনুমেন্ট বা এখনকার শহিদ মিনারের কথা। মধ্য কলকাতায় সব থেকে আগে যা চোখে পড়ে। এই মিনার একজন যুদ্ধবাজের স্মৃতিতে গড়ে উঠেছে। স্যার ডেভিড অক্টোরলনী। নেপাল আর রাজপুতানা জয়ে তাঁর ছিল বড়সড় ভূমিকা। এই মিনার বা মনুমেন্টের উচ্চতা ১৫২ ফুট। তিন দেশের স্থাপত্য মিলেমিশে আছে এতে। ইজিপ্টের স্থাপত্য নীচের দিকে, মাঝের শৈলী সিরিয়ার আর উপরভাগে তুর্কি। ভেতরের সিঁড়ি গড়া হয়েছিল চুনার পাথরে। এই শহিদ মিনার থেকে সোজা পশ্চিমমুখো হাঁটলে আমরা পৌঁছে যাব স্ট্র্যান্ড রোডে। যেখানে অপূর্ব গথিক শিল্প শৈলীর কাঠামোকে ভেঙে স্টেটব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া এখন তাদের প্রধান কার্যালয় 'সমৃদ্ধি ভবন' বানিয়েছে। ১৮২৩-এ তৈরি হয়েছিল এই স্ট্র্যান্ড রোড। এর গায়েই আছে চাঁদপাল ঘাট। এক সময় সুমাত্রা নামে একটি জাহাজ ডুবে গিয়েছিল বলে কিছুদিন একে সুমাত্রা স্ট্র্যান্ডও বলা হত। চাঁদপাল ঘাটেই বেশিরভাগ জাহাজ এসে ভিড়ত আর ইংরেজ ব্যবসায়ী, কর্মপ্রার্থী, ভবঘুরে, ধর্মযাজক, শিক্ষাকর্মীরা এসে পা রাখত কলকাতা শহরের পথে। চন্দ্রনাথ পাল নামে একজনের মুদির দোকান এই ঘাটের উপর ছিল বলে ঘাটের এই নাম। পথিক ও মাঝি মাল্লারা এই দোকানে খাবার কিনতো। এই রাস্তার গা ঘেঁষেই ছিল ট্যাঁকশাল। তা আজ আর নেই কিন্তু টিকে আছে ইডেন গার্ডেনস। লর্ড অকল্যান্ডের বোন এমিলি ইডেন বানিয়েছিলেন এই গার্ডেন। তাঁর নামেই এই নাম।

চাঁদপাল ঘাট ছাড়াও কয়েকটি ঘাট তখন প্রসিদ্ধি লাভ করে। যেমন-প্রিন্সেপ ঘাট হয়েছিল জেমস্ প্রিন্সেপের স্মরণে। জেমস প্রিন্সেপ ছিলেন 'জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' - পত্রিকার জনক। আউটট্রাম ঘাট হল স্যার জেমস আউট্রামের স্মৃতিতে বানানো। আর রানি রাসমণির স্বামী বাবু রাজচন্দ্র দাসের দানে গড়ে উঠেছিল বাবুঘাট। উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক সতীদাহপ্রথা বন্ধ করেছিলেন। তার নামেই বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের নামকরণ। আস্তে আস্তে এ শহরের রূপরেখা তৈরি হল। বলা বাহুল্য, তাতে ইংরেজ রাজপুরুষ ও শিক্ষিত সমাজের একটা বড়ো ভূমিকা ছিল।

একথা বলাই যায়, যে সমস্ত বড়ো শহর গড়ে ওঠার প্রাক্কালে উঁচুতলা ও নীচুতলার সমাজ পাশাপাশি থাকতে থাকতে মেলামেশা করতে শুরু করে। তবে কলকাতার ক্ষেত্রে আরো অনেক শ্রেণির মানুষ ছিল। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে দু'ধরনের ইংরেজ ভারত তথা এ শহরে এসেছিল। একদল এসেছিল ছলে বলে কৌশলে লুঠপাট করতে, শাসন ও শোষণ করতে। শহর তথা দেশটাকে দখল করতে। সেজন্যই বলা হয় 'বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে'। আর একদল ইংরেজ এসেছিল রাজপুরুষ হয়ে রাজ্যশাসনে। কিন্তু তারা এ দেশের প্রকৃতি আর মানুষকে ভালোবেসে ফেলে। বহু যুগের পুরোনো এ দেশের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতিকে তারা আপন করে নেয়। ইংরেজ ব্যবসাদারদের সঙ্গে জুড়ে গিয়ে বেশ কিছু বাঙালি ধনবান হয়ে যায়, কেউ কেউ তাঁবেদারি, দালালি করে প্রচুর রোজগার করে। যথেচ্ছ টাকা উড়িয়ে আর ইংরেজদের খেতাব মাথা নীচু করে নিয়ে ধন্য হয়। কিছু সংখ্যক বাঙালি শিক্ষিত মানুষ আবার ইংরেজদের শিক্ষার আলোটুকু নিয়ে এ দেশে সভ্যতার নব নব দীপ জ্বেলে দেন। কেরী সাহেব, হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিও, ডেভিড হেয়ার, উইলিয়াম জোনস্, বেথুন সাহেবরা আর রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাম গোপাল ঘোষরা হাতে হাত দিয়ে সমাজের উন্নয়নে শামিল হয়েছিলেন। নারী শিক্ষা ও শিশু শিক্ষার (চিকিৎসা শাস্ত্র, চিকিৎসালয়) বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় গড়ে উঠল এ শহরের প্রত্যেকপ্রান্তে। এ শহর দেশের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট মহানগরী হয়ে ওঠে।

কলকাতার নানা এলাকায় বিখ্যাত কতগুলি স্থানের নামের উৎস খুঁজতে গেলে নানারকম তথ্যের সন্ধান আমরা পাই। শুরু করা যাক যদুবাবুর বাজার বা জগুবাবুর বাজার ভবানীপুর থেকে। আসলে অবশ্য যদুবাবুর বাজারই হবে। এই বাজারের জায়গায় আগে এক প্রকাণ্ড বাগানবাড়ি ছিল। তার মালিক ছিলেন কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের জজ স্যার রবার্ট চেম্বার্স। ১৭৭৪-এ কলকাতায় সুপ্রিম কোর্ট চালু হলে বিলেত থেকে আসা ৪ জন জজের অন্যতম ছিলেন রবার্ট চেম্বার্স। পরে তাঁর এই বাগানবাড়ি কিনে নেন রানি রাসমণি এবং সেখানে বাজার বসিয়ে রানির দৌহিত্র যদুনাথ চৌধুরীকে দান করেন। সেই থেকে এটি যদুবাবুর বাজার নামে পরিচিতি লাভ করে। পামার বাজারের প্রতিষ্ঠাতা ক্যাপ্টেন ফ্রাঙ্ক পামার। তিনি খুব পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। শীল্‌স ফ্রি কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। যদিও প্রথম জীবনে সৈন্যবিভাগে চাকরি করতেন, থাকতেন বেলেঘাটা রোডে বিশ্বনাথ মতিলালের বিরাট বাগানবাড়ি ভাড়া নিয়ে। তাঁর নামেই বাজারটির নামকরণ পামার বাজার। এই বেলেঘাটাতেই ভিজিয়ানা গ্রামের মহারাজার প্রাসাদ যা বর্তমানে কমার্শিয়াল ট্যাক্স অফিস তা ছিল কালীপ্রসাদ দত্তের বাগানবাড়ি। তিনি ছিলেন চূড়ামণি দত্তের পুত্র। চূড়ামণি দত্ত কলকাতায় এসেছিলেন ২৪-পরগনা জেলার সাঁইবনা গ্রাম থেকে, নবাব সিরাজ-উদ-দৌল্লার কলকাতা দখলের পরেই।

সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ কলকাতায় দু'বারপ্রতিষ্ঠা হয়। প্রথমবারের কলেজটি কিছুদিন পর উঠে যায়। দ্বিতীয়টি এখনকার জেভিয়ার্স কলেজে। প্রথমে একদল ইংরেজ জেসুইট ১৮৩৪ সালে অক্টোবর মাসে কলকাতায় এসেছিলেন। ১৮৩৫ সালে প্রথম তারা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৩৮ সালে পার্ক স্ট্রিটের এক

ভাড়া বাড়িতে কলেজটি স্থানান্তরিত হয়। ১৮৪৬-এ এই জেসুইটরা ভারতবর্ষ ত্যাগ করে চলে যায়। এরপর ১৮৫৯ সালে একদল বেলজিয়ান জেসুইট কলকাতায় এসে ১৮৬০ সালের ১৬ জানুয়ারি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজপ্রতিষ্ঠা করেন। তবে কেউ কেউ বলে পুরোনো সেন্ট জন কলেজই নাকি নাম বদলে বর্তমানে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ হয়েছে।

কলকাতার নানা গঙ্গার ঘাটের মধ্যে আগে কয়েকটি বলেছি। এবারে অন্যান্য কয়েকটি ঘাটের উল্লেখ করি। বাগবাজার খালের দক্ষিণে রুস্তমজীর ঘাট। এই রুস্তমজী ছিলেন পার্সি। ১৭৯০-এ বোম্বাই (মুম্বাই) এ জন্ম, ১৮৫২ সনে কলকাতায় মৃত্যু। চিন দেশের সঙ্গে ইনি আফিমের ব্যবসা করতেন। নিজের জাহাজ পর্যন্ত তৈরি করেছিলেন! দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। কাশীপুর শ্মশানঘাটের দক্ষিণে, রতনবাবুর ঘাট। যশোর জেলার নড়াইল জমিদার বংশের পুত্র ইনি। ১৭৮৫-১৮৬০ পর্যন্ত এনার জীবনকাল। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য কাশী মিত্রের (কাশীশ্বর মিত্র) ঘাট, বনমালি সরকার ঘাট, আহিরীটোলা ঘাট, সুতালুটি বা সুতানুটিঘাট, মানিকবাবুর ঘাট, মদনদত্তের ঘাট ও নিমতলা ঘাট সংলগ্ন শ্মশানে কালীমূর্তি ছিল, তাই এটি শ্মশানকালী। এই শ্মশান তৈরি হয় ১৮২৮ সালের মার্চ মাসে। তখন স্ট্র্যান্ড রোড হয়নি। এই রাস্তার ওপর দিয়েই তখন গঙ্গা বইত। রানি রাসমণির স্বামী বাবু রাজচন্দ্র দাস এই শ্মশানের ধার ঘেষে একটি পাকা ঘর তৈরি করে দেন। এই রাজচন্দ্রের নামেই বাবুঘাট। এই ঘর ছিল অন্তর্জলী যাত্রার ঘর। আরো কয়েকটি ঘাট হল জোড়াবাগান ঘাট, গোকুলবাবুর ঘাট, পাথুরিয়া ঘাট, নবাবের ঘাট, কদমতলা ঘাট, ছেরিমলের ঘাট ইত্যাদি।

এখনকার থিয়েটার রোড ও চৌরঙ্গী রোডের মিলনস্থল থেকে দক্ষিণে একটি কাঠের তৈরি থিয়েটর হল ছিল। তার নাম চৌরঙ্গী থিয়েটার। ১৮২৬ সনে মাত্র ১৭ বছর বয়সে কলকাতার সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী মিসেস এস্থার লিচ সর্বপ্রথম এই রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেন। এই থিয়েটারের জন্যই সংলগ্ন রাস্তার নাম হয়েছে থিয়েটার রোড। আবার বৌবাজারের ফিরিঙ্গি কালীমন্দিরের একটি গল্প আছে। শ্রীমন্ত ডোম নামে এক ব্যক্তি এই মন্দিরপ্রতিষ্ঠান করেন। ইনি নিজে পূজারির কাজ করতেন আবার এই অঞ্চলের বসন্ত রোগীদের চিকিৎসাও করতেন। ফিরিঙ্গী অধিবাসীদের মধ্যে অনেকেই এঁর চিকিৎসায় বসন্ত রোগ থেকে সেরে ওঠেন। তারা এই কালীর কাছে পুজো নিবেদন করতেন। এজন্যই এই কালীর নাম ফিরিঙ্গী কালী। কবিয়াল অ্যান্টনি ফিরিঙ্গী বা তাঁর ঠাকুরদা এ মন্দিরপ্রতিষ্ঠা করেননি। ঠনঠনিয়ার সাবেক কালীমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে।

১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে এক টর্নেডো বা ঝড় আর ভূমিকম্পে কলকাতা শহর প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। এই মহাঝড়ে গোবিন্দরাম মিত্রের নবরত্ন মন্দির ও সেন্ট অ্যান গির্জার চূড়া ভেঙে পড়েছিল। সেদিনের ঝড়ে গঙ্গার বুক থেকে কোনো বড়ো জাহাজ উড়ে এসে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের খালের (গঙ্গার খাল এখানে) মধ্যে আছড়ে পড়ে ভেঙে গিয়েছিল। তাই এই অঞ্চলের নাম ডিঙিভাঙা। আসলে অবশ্য ডিঙাভাঙা। কারণ ছোটো নৌকার নাম ছিল ডিঙি আর বড়ো নৌকা ছিল ডিঙা (সপ্তডিঙা, মধুকর ডিঙা ইত্যাদি)। এই সূত্রেই বলা যায় উল্টোডাঙাও হয়তো সে অর্থে উল্টো ডিঙা।

এখন মিডলটন রো-তে যেটি লোরেটো হাউস, আগে তা ছিল গভর্নর ভ্যানসিটার্টের (১৭৬০-৬৪) বাসস্থান। এই বাড়ির চারধারে বিরাট বড়ো পার্ক ছিল, তাতে হরিণ থাকত বলে স্থানীয় লোকেরা বলতো ডিয়ার পার্ক। এই বাড়িতে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার ইলাইজা ইম্পে ১৭৭৪ থেকে ১৭৮২ সাল পর্যন্ত বসবাস করেন। ক্যামাক স্ট্রিট, রাসেল স্ট্রিট, বেরিইং গ্রাউন্ড রোড সংলগ্ন এই বাড়িটাতে যাওয়ার জন্য একটি ফটক পেরিয়ে দু'ধারে সারি দেওয়া ঘন গাছের মধ্যে দিয়ে যেতে হত। দু'সারি গাছের বীথি দেওয়া রাস্তা তাই মিডলটন রো আর ইম্পে সাহেবের পার্কের জন্যই আজকের নাম হয়েছে পার্কস্ট্রিট। ভবানীপুর রোডের সৈনিকদের কবরস্থানে আছে চার্লস ডিকেন্সের চতুর্থ সন্তান ও দ্বিতীয় পুত্র লেফটেন্যান্ট ওয়েল্টার ল্যান্ডর ডিকেন্সের সমাধি।

১৮৬৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর ২৩ বছর বয়সে কলকাতার সৈনিক হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়।

পর্তুগিজ বণিকরা সপ্তগ্রাম বন্দরে আসে ১৫৩০---১৫৩৭-এর মধ্যে। এর প্রায় ৪০ বছর পর তারা হুগলিতে যায়। ইংরেজরা তাদের প্রথম বাণিজ্যকুঠি হুগলিতেই প্রতিষ্ঠা করে, সেটি ছিল ১৬৫১ সন। ডাচ বা নেদারল্যান্ডসের অধিবাসীরাও চুঁচুড়ায় তাদের বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে ওই সময়েই। হুগলি শহরে ব্রিটিশদের কুঠি থাকায় আর সেটি ভাগীরথী বা গঙ্গা নদীর তীরে হওয়ায়, ইংরেজরাই গঙ্গানদীর নাম রাখে হুগলি নদী। ১৬৯০ থেকে ইংরেজরা স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসবাস শুরু করতেই ইংরেজদের কাঠের তৈরি পালের জাহাজ অনেক বেশি করে কলকাতায় আসতে শুরু করে। এই সময় থেকেই ধীরে ধীরে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও মালপত্র বহন করার জন্য এই শহরের ভেতরে নানা স্থানে যাওয়ার জন্য অনেক খাল কাটা হয়। সার্কুলার খাল, কেষ্টপুর খাল, টালির নালা, কাওড়া পুকুর খাল আর কলকাতা থেকে বসন্তপুর (সুন্দরবন) যাওয়ার জন্য জলপথের ব্যবস্থা হয়। এত গেল জলপথ। আর স্থলপথের উন্নতির জন্য আগেই বলেছি লটারির ব্যবস্থা হয়েছিল। ১৮০৫ থেকে ১৮৩৬ সনের মধ্যে উড স্ট্রিট, ওয়েলিংটন স্ট্রিট, আমহার্স্ট স্ট্রিট, হেয়ার স্ট্রিট, কলুটোলা, মির্জাপুর, রডন ও হাঙ্গার ফোর্ড স্ট্রিট তৈরি হয়। ১৮৮৮ সনে শহরতলির অঞ্চলগুলিকে আইনানুসারে কলকাতার মধ্যে আনা হয়। যথা এন্টালি, বেনেপুকুর, ট্যাংরা, তপসিয়া, বালিগঞ্জ, ভবানীপুর, কালীঘাট, চেতলা, আলিপুর। তৈরি হয় ল্যান্সডাউন রোড, হরিশ মুখার্জী রোড, হাজরা রোড, গোপালনগর রোড, জাজেস কোর্ট রোড ইত্যাদি।

কলকাতার আদিকাল থেকে নানারকম যানবাহনের চল ছিল। বাংলাদেশে ও ভারতে প্রাচীনকাল থেকে পালকির ব্যবহার ছিলই। এছাড়া ছিল ডুলি। ডুলি ও পালকি প্রধানত পল্লি অঞ্চলের যান ছিল। ডুলি তেমন ব্যবহার না হলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই পালকি চলত কলকাতায়। এই শতাব্দীর শেষ দশকে ঘোড়ার গাড়ির প্রচলন হয়। ডেভিড হেয়ার পালকি চড়তেন। বিদ্যাসাগর মশাই ঘোড়ার গাড়িতে চড়তে চাইতেন না। কলকাতার ধনী শ্রেণির লোকেরা তিনহাজার টাকা পর্যন্ত খরচ করে পালকি বানাতেন। তবে বহুমানুষই পালকি ভাড়া নিতেন। ১৮৯১ সালে তিলোত্তমায় পালকির সংখ্যা ছিল ৬০৬ আর বেহারাদের সংখ্যা ১৬১৪। আবার ঘোড়ারগাড়িও ছিল নানারকমের--- চেরোট পালকি, ব্রাউনবেরি, বগি, কেরাঞ্চি ও

ছ্যাকরা গাড়ি। এক বা দুই ঘোড়ায় টানা গাড়ি ছিল সব। ছিল ভিক্টোরিয়া আর ফিটন গাড়ি। এছাড়াও ছিল ব্রুয়াম, ল্যান্ডো, টমটম, ব্যারুশ, গিগ, এককা, টাঙ্গা। এসব গাড়ির চাকা থাকত লোহায় বাঁধানো। রবার টায়ার ব্যবহার করা শুরু হয় ১৯০০ সাল থেকে। এরপর বলি ট্রাম গাড়ির কথা। ১৮৭৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রথম শিয়ালদা স্টেশন থেকে আর্মেনিয়ান ঘাট পর্যন্ত ট্রাম চলে। দুটি ট্রাম-ট্রেন ছাড়ে সেদিন। যেহেতু প্রথম শ্রেণি আর দ্বিতীয় শ্রেণি ছিল তাই ট্রেন শব্দটাও জুড়ে দেওয়া হয়।প্রথম ট্রামটি ৬টি ঘোড়া আর দ্বিতীয় ট্রামটিকে ৮টি ঘোড়া টেনেছিল। ৯ মাস পর এই ট্রাম উঠে যায়। পরে ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোম্পানি প্রতিষ্ঠা হয় এবং কলকাতা কর্পোরেশনের সঙ্গে চুক্তি করে শিয়ালদা-বৌবাজার লাইনে প্রথম ট্রাম চলে ১৮৮০ সালের অক্টোবর মাসে। পরে মোট ৮টি রুটে ট্রাম চালু হয়। ট্রামের ড্রাইভার ও কন্ডাক্টররা মাথায় সিপাইদের মতো লাল পাগড়ি পরতো। একজোড়া ওয়েলার ঘোড়া একটা ট্রামগাড়ি টানতো। মোট ৪টি ও কোনো গাড়িতে দু'দিকে মোট ১০টি দরজা থাকতো। ১৯০২-এর মার্চ মাসে খিদিরপুর রুটে প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রাম চলে।

এরপর আসি এই শহরে বাইসাইকেল আসার কথায়। প্রথম কলকাতায় বাইসাইকেল চলল ১৮৮৯-সালে। হ্যারিসন রোডে হেমেন্দ্রমোহন বোস (কুন্ডলীন ও দেলখোস-এর আবিষ্কারক) সর্বপ্রথম সাইকেলের দোকান করেছিলেন। তাঁর তিনজন শিক্ষককে তিনি বাইসাইকেল চালানো শিখিয়েছিলেন। শিক্ষক তিনজন--- স্যারপ্রফুল্লচন্দ্র রায়, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়। 'রেঞ্জার্স ক্লাব' হল প্রথম সাইকেল চালকদের ক্লাব।

কলকাতার রাস্তায় প্রথম মোটরগাড়ি চলে ১৮৯৬ সালে। মাত্র ১০ বছরের মধ্যেই এই শহরে ট্যাক্সি চলে। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে মিটারওয়ালা ট্যাক্সি ছাড়ত চৌরঙ্গী রোডের ফ্রেঞ্চ মোটরকার কোম্পানির অফিস থেকে। রুট ছিল দমদম, ব্যারাকপুর ও বজবজ। এক মাইলে ভাড়া পড়ত আট আনা। প্রথম 'এ' কোম্পানির ট্যাক্সি সব থেকে বেশি চলত রাস্তায়। চালকদের একশো ভাগই ছিল বাঙালি। পরে চালকদের মধ্যে মদ্যপান, কাজে গাফিলতি, অমনোযোগী ও অনিয়মানুবর্তিতার দরুণ তাদের জায়গায় শিখ ড্রাইভার আনা হয়।

কলকাতায়প্রথম বাসও ছিল ঘোড়ায় টানা। ১৮৩০ সালে কলকাতা থেকে ব্যারাকপুর পর্যন্ত তিন ঘোড়ায় টানা বাস যাত্রী নিয়ে প্রথম চলাচল করে। এই শহরে যাত্রীবাহী মোটর বাসের প্রথম দেখা মেলে ১৯২২ সালে। কলকাতার রাস্তায় পরবর্তীকালে বিচিত্র নামধারী সব বাস চলত-কিন্নরী, উর্বশী, আমি যাচ্ছি, পথের বন্ধু, মেনকা, চলে এসো প্রভৃতি ছিল তাদের নাম। ওয়ালফোর্ড কোম্পানির দোতলা প্রাইভেট বাস চালু হয়েছিল ১৯২৬-এ। ওয়ালফোর্ড কলকাতা ও শহরতলীর মধ্যে বাস সার্ভিস চালুর প্রবর্তক হলেন আবদুস সোভান নামে এক মুসলিম ব্যবসাদার। স্টেট বাসের প্রবর্তন হয় ১৯৪৮-এ, আর মিনিবাস চলে ১৯৭২ সালে। ডিল্যাক্স বাস চলে ১৯৭৫ সালে। ১৯৭২ সালেই কলকাতায় হাতে টানা রিকশা ছিল ৩০ হাজারের মতো। এ গাড়ির জন্ম অবশ্য জাপানে। সে দেশে এ গাড়িকে বলা হত জিন-রি-কি-শ। জাপান থেকে এই যান গিয়েছিল সাংহাইতে। ১৮৮০ সালে রিকশো পৌঁছে যায় সিমলাতে। জেনি রিকশ বা জিন রিকশ থেকে বর্তমান রিক্সোর নাম এসেছে। ১৯০০ সালে কলকাতায় কয়েকজন চিনা বাসিন্দা রিকশর ব্যবহার শুরু করে। ১৯২০ সালের মধ্যে রিকশোর ব্যবসা পুরোপুরি ভারতীয়রা দখল করে। রিকশো চালু হওয়ার পর আস্তে আস্তে পালকির ব্যবহার উঠে যায়।

কলকাতার সঙ্গে হাওড়ার যোগাযোগকারী হাওড়া পুল বর্তমানে যা রবীন্দ্র সেতু তৈরি শুরু হয় ১৯৩৭-এ আর খোলা হয় ১৯৪৩-এ। এটি একটি ক্যান্টিলিভার ধরনের ঝোলা পুল। আর দ্বিতীয় হুগলি সেতু বা বিদ্যাসাগর সেতুর জন্ম হয়েছে সবে ১৯৯২ সালে। ২৭০০ ফুট লম্বা এই সেতু ভারতের সব থেকে দীর্ঘ কেবল বা তার দিয়ে ধরে রাখা সেতু।

চট করে মনে পড়ে না এমন একটাও বড়ো শহর পৃথিবীতে আছে যা নদী বা সমুদ্রের নৈকট্য ছাড়া গড়ে উঠেছে। লন্ডনের আছে টেমস, মস্কোর মস্কোভা, প্যারিসের সেইন, আর নিউইয়র্কের হাডসন। কলকাতাও গঙ্গা নদীকে সঙ্গে করেই গড়ে তুলেছে নিজস্ব ঐতিহ্য। প্রথম শ্রেণির শহরের অধিকাংশ বৈশিষ্ট্য না থাকা স্বত্বেও এই শহরের নাম বিশ্বের কয়েকটি প্রথম সারির শহরের নামের সাথেই উচ্চারিত হয়। ১৯৪৬-এর দাঙ্গার ইতিহাস পেছনে ফেলে জাঁক করে বলা যায় কলকাতাই ভারতের সবথেকে বড়ো শহরের মধ্যে সবথেকে অসাম্প্রদায়িক। অথচ ঔপনিবেশিক শাসনের সব থেকে নির্মম চাপ ভোগ করতে হয়েছে এই শহরকে কতকাল ! সবচেয়ে নিরাপদ, উজ্জ্বল, বৈপরীত্য আর বৈচিত্র্যে ভরা এই শহরের ব্যবচ্ছেদে তাই কবি কলমে উঠে আসে---

"এক অভিভূত শহরের ফুটপাত ধরে এগোই আমি
এবং পেছিয়ে যাই, শৌচাগারের পাশে লাইন দিয়ে
দাঁড়িয়ে আছে মানুষ, আর কিছু আছে শহরের
প্রকৃত সন্তান---
উলঙ্গ শিশু, বিকলাঙ্গ ভিখারী, গাড়িবারান্দার নীচে
উনুনের ধারে গোল হয়ে বসে আছে মানুষ-মানুষী
আমি জানি না এখানে বসন্ত কবে আসে কবে যায়।"

সমস্ত পুরোনো ঐতিহ্য আর ইতিহাসকে সঙ্গী করেই মেট্রোপলিটন কলকাতা আজ অন্য রূপে, অন্য সাজে সেজে উঠছে। আমরা এই অপূর্ব নগরীর ইতিহাসের প্রতি যত্নবান নই। ইতিহাসকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার। আপামর কলকাতাবাসীকে এ কথা বুঝতে হবে, অনুধাবন করতে হবে। আমরা যারা এ শহরকে ভালবাসি, যাদের রক্তে, অস্থিতে মজ্জায়, ফল্গু স্রোতে বইছে এ শহরের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, তাদেরকেই এই তিলোত্তমারও ইতিহাস।

মানসকুমার ঠাকুরের কবিতায় 'মানসী'র খোঁজ

মানসকুমার ঠাকুর পেশায় কস্ট একাউন্ট্যান্ট। তিন দশকের বেশি সময় ধরে তিনি শিক্ষা জগৎ ও নিরীক্ষা সংক্রান্ত পেশার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন। তাঁর পেশাদারি দক্ষতা বহুজন সমাদৃত। তিনি ছিলেন (২০১৬-১৭) দি ইনস্টিটিউট অফ্ কস্ট একাউন্টেন্টস অফ্ ইন্ডিয়ার সর্বভারতীয় সভাপতি। এছাড়াও তিনি সর্বভারতীয় স্তরে বিভিন্ন নামি প্রতিষ্ঠান ও চেম্বার অফ্ কর্মাসের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এখনো যুক্ত রয়েছেন বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে। তাঁর নেশা কবিতা লেখা। তাঁর লেখা 'মানসী'র বিভন্ন কবিতা নিয়ে আলোচনা করেছেন দেবোপ্রসাদ রায়চৌধুরী।

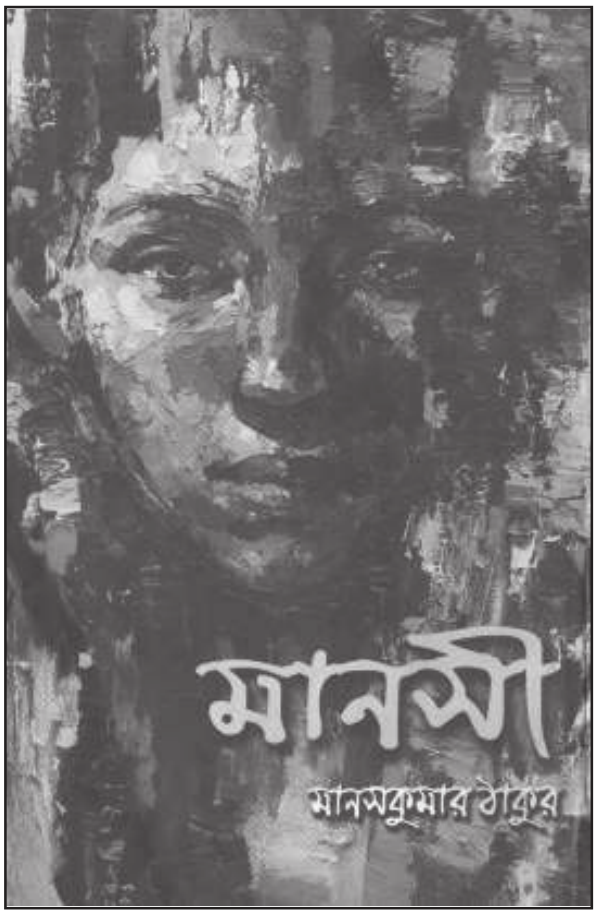

উন্মাদ : কবির সুচিন্তিত শব্দ চরণ তাঁর মনের ভাব প্রকাশকে অপরূপ সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করেছে। কবির অন্তর্দৃষ্টি ভূমি থেকে ভূমা পর্যন্ত প্রসারিত। বিশ্ববিধাতার কাছে আত্মনিবেদন কবিতাটিতে অন্য মাত্রা যোগ করেছে।

আপেক্ষিক : কবির কল্পনা পৃথিবীর সীমা ছাড়িয়ে অনন্তের দিকে ধাবমান। সৃষ্টির ফুল সূর্যের রক্তিম আভায় স্নান করে প্রস্ফুটিত। সেই সৃষ্টিকে চিরস্থায়ী করার জন্য অমৃতের অনুসন্ধান। কবির ভাষা নৈপুণ্য প্রশংসাই। 'শান্ত সুর'— ভোরের অরুণ আলো সঙ্গীতের সুর বিস্তারের মত ছড়িয়ে পড়ে কিন্তু শব্দবিহীন। 'জোয়ারের নিস্তব্ধতা'— নদী ও সমুদ্রে জোয়ার শব্দবহুল। কিন্তু এ জোয়ার সে জোয়ার নয়— এ কালের জোয়ার-পরিবর্তনের হাতিয়ার। পুরাতন সভ্যতাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় নতুন সভ্যতার প্রতিষ্ঠার জন্য— কিন্তু নিঃশব্দে। 'নিষ্ঠুর নীরবতার'— অতিরিক্ত নীরবতা অস্বস্তিকর, অসহ্য। তাই সে নিষ্ঠুর।

অবসাদ : ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু, পথে যদি পিছিয়ে পড়ি কভু।। এই-যে হিয়া থরোথরো কাঁপে আজি এমনতরো/ এই বেদনা ক্ষমা করো, ক্ষমা করো, প্রভু।। (গীতালি-৫৯)

'অস্ফুট অহঙ্কার'- সুন্দর ভাষা, অর্থবহ ভাষা। প্রকৃতিগতভাবে নারীসত্ত্বা স্নেহ দিয়ে সেবা দিয়ে পুরুষের ক্লান্তি দূর করার ক্ষমতা রাখে। সেখানেই তার গর্ব সেটাই তার অহঙ্কার। কিন্তু ক্লান্তিময় জীবনের অক্ষমতা জনিত যন্ত্রণা ও তার থেকে যে অবসাদ যেন কবি পরিশীলিত ভাষায় একটা সুন্দর ছবি এঁকে নিজেকে উচ্চপর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। গ্লানিময় অস্তিত্বকে অবসন্ন বাইরের আন্তরণে তার কোন প্রতিফলন নেই। করেছে তাঁকে উজ্জ্বল অতীতের স্মৃতির স্রোতে বিলীন করতে চান। ৩য় স্তবকে নিদারুণ ব্যথা কেন?— সারাদিনের ক্লান্তি অপনোদনের প্রচেষ্টায় সাড়া না দিতে পারার ব্যর্থতা মানসিক যন্ত্রণার উৎসর্গ। এই যন্ত্রণাই নিদারুণ ব্যথা। এই ব্যথা বর্তমান।

তরঙ্গ : এ কবিতা পরম আত্মনিবেদনের কবিতা। ভক্ত যেন অন্তরসাগরের মধ্যে ডুব দিয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলে ভগবানের অনুসন্ধান প্রয়াসী। ভক্তর কলুষ কালিমা ভগবানকে ব্যথিত করে, অশ্রু ঝরায়। ভগবান ভক্তকে যেন আঘাতে আঘাতে তার অহঙ্কার চূর্ণ বিচূর্ণ করে। নদী সাগরের দিকে ছুটে যায়। সাগরের বুকে বিলীন হওয়ার মধ্যে তার আনন্দ, তার জীবনের সার্থকতা, পরিপূর্ণতা। এই কবিতাতেও একজনের আর একজনের মধ্যে বিলীন হওয়ার আর্তি প্রকাশিত। একজনের সুরের মূর্ছনা অন্যের বীণার ঝংকারের সাথে মিলে আনন্দলোক সৃষ্টি করে। কবিতার মধ্যে তারই আভাস। কবির নিপুণ লেখনী স্পর্শে 'মন যমুনার অঙ্গে অঙ্গে ভাব তরঙ্গে কত খেলা' প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। এখানেই কবির প্রয়াস সার্থক।

ক্লান্তি : কবি গভীর রাত্রে নৈসর্গিক চিত্র এমন সুন্দরভাবে এঁকেছেন যেন মনে হয় প্রকৃতির প্রতিভূ আকাশ, রাত্রি, চাঁদ, তারা নীরব ভাষায় বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। পশ্চিম গগনে সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে রাতের অন্ধকার পৃথিবীকে গ্রাস করে ফেলে। কর্ম ব্যস্ততা কমে আসে। পাখীরা নিজেদের বাসায় ফিরে আসে। আকাশ ও বাতাসে আসে স্তব্ধতা। পূর্ণিমার চাঁদ ছড়ায় স্নিগ্ধ জোছনা। মনে হয় পৃথিবীটা তার

গতি হারিয়েছে। তারাদের চোখে বিষাদের ছায়া। কবির অনুসন্ধিৎসু অন্তর একটা প্রশ্ন তুলে দিয়েছে— এই গতিহীনতা কি অবসাদ না অবকাশ। প্রকৃতির অন্তরকে নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতা এবং পরিশীলিত ভাষায় রূপদান করে নিজেকে উচ্চ পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

স্মৃতি-বিস্মৃতি : জীবন নদীর স্রোতের মত গড়িয়ে চলে। থেমে থাকে না। কত চাওয়া, পাওয়ার আনন্দ, না পাওয়ার বেদনা, আশা, নিরাশা, প্রেম, প্রীতি ভালবাসা নিয়ে জীবন। হৃদয়ের মরুতৃষা যখন এখটু জলের অভাবে কেঁদে ওঠে— মন বলে 'I fall on the thouns of life I bleed' তখন কালের গতির সাথে আস্তে আস্তে না পাওয়ার বেদনা বিস্মৃতির আবরণে ঢাকা পড়ে যায় কিন্তু হারিয়ে যায় না। মাঝে মাঝে সেই আবরণ ভেদ করে স্মৃতির সরণি বেয়ে তারা ঝড় তুলতে আসে। জীবনের আনন্দ, বেদনা, আলো আঁধার কবি যেন চিত্রশিল্পীর মত নিখুঁত তুলির টানে চিত্রায়িত করে শ্রদ্ধার্ঘ্য হয়ে উঠেছেন।

রাত্রির হাতছানি : কবির কল্পনা এবং সেই কল্পনা যেভাবে ভাষায় রূপদান করেছেন সেটি পাঠক সমাজকে চমৎকৃত করে। 'রাত্রি ছায়া দিয়ে গড়া', ক্রন্দনরতা বারী। 'দিনের ভাটার শেষে রাত্রির জোয়ার' যখন সব কিছু স্তব্ধ করে দেয় তখন নিসঙ্গতা ছাড়া রাত্রির আর কিছুই থাকে না। তাই সে বেদনাহত, ক্রন্দনরতা। কিন্তু অন্তরের অন্তস্থলে সঙ্গীরা সব অন্তর্হিত। তাদের অস্তিত্ব স্বপ্নে। কবির লেখনী স্পর্শে ডুবে যাওয়া চাঁদ, সাঁঝের তারার মত নৈসর্গিক চরিত্রগুলি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর শব্দ চয়ন, শব্দ গঠন (স্বপ্ন শিখা) এবং বাষায় সাবলীল প্রয়োগ তাঁকে সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের পাশে আসন করে দেয়।

তরুণ যোগী : এই কবিতা পুরাতন জীর্ণ ক্লান্ত, বিষন্ন পৃথিবীকে বিদায় জানিয়ে জ্যোৎস্নাসিক্ত স্নিগ্ধ, সুন্দর পৃথিবী গড়ার যজ্ঞে তরুণবৃন্দের প্রতি আহ্বান। তারুণ্য জীবনের প্রতীক, নতুন স্বপ্ন দেখার প্রতীক। কিন্তু সেই তরুণ কাণ্ডারীর হৃদয় যেন কোমলে কঠোরে ভরা হয়। একদিকে থাকবে কঠোর শৃঙ্খলার অনুশাসন, অন্যদিকে কোমল হৃদয়ে থাকবে সঞ্জীবনী সুধাবিতরণের প্রতিজ্ঞা। কবির চোখে নূতন সুন্দর পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন এবং তাকে বাস্তবায়িত করার রূপরেখা ভাষায় প্রকাশ কবিকে মহান শিল্পীর মর্যাদা দিয়েছে।

নদী : 'নদী আপন বেগে পাগল পারা', 'তোমার কোন বাঁধন নাই/তুমি ঘর ছাড়া কি তাই' শতাব্দীর পর শতাব্দী নদী চলছে ক্লান্তিহীন ভাবে। কখনও কখনও প্রবল জলোচ্ছ্বাসে হাজার নারীকে স্বামী, সন্তানহারা করে কান্নায় ভাসিয়ে দিয়ে কলঙ্কের ভাগী হয়েছে। কিন্তু তবুও তার গতি বিরাম বিহীন।

কবি অত্যন্ত সহজভাবে নদীর বেদনার স্মৃতি মিশ্রিত গতিশীলতার ছবি ভাষায় রূপদান করতে অত্যন্ত সফল হয়েছেন।

গোধূলির রাঙা আভায় ভূষিত নদীর দৃশ্য অনেকের উপভোগ্য নয়। অনেককে আকর্ষণ করে। আবার সন্ধ্যার আঁধার নামলে তারা সবাই চলে যায়। নদী হয়ে পড়ে নিঃসঙ্গ। বড় বেদনা স্তব্ধতার মাঝে জেগে থাকে শুধু নদীর কলতান। এই নিঃসঙ্গতার বেদনা কবি এমন সুনিপুণভাবে ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন যে সেটি পাঠকের কাছে মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠে। এখানেই লেখকের কৃতিত্ব। নদী যেন জীবনের প্রতিচ্ছবি। জীবন যেন স্বপ্নমায়া। নদী তার শেষ পর্যায়ে সাগরের সাথে মিলিত হয়ে নদী থেকে সাগরে উত্তরণ তার রূপান্তর, ধর্মান্তর ও মুক্তির ইঙ্গিত বহন করে। কবির চিন্তাধারা ভাষায় ছবির মত ফুটিয়ে তোলা তাঁর শিল্পী মনের পরিচয় বহন করে ও প্রশংসার দাবী রাখে।

হার বা জিত : হার বা জিত সফলতা বা অসফলতা। কবি এই কবিতার মধ্য দিয়ে চিন্তার এক বিশাল পরিসর গড়ে দিয়েছেন। মানুষের জীবন কতরকম খেলায় পরিপূর্ণতা। হার বা জিত সম্পূর্ণ আপেক্ষিক। এটি নির্ভর করে মানুষের মনের গঠনতন্ত্র, পরিবেশ ও সময়ের ওপর। জীবনে না আছে কোন হার, না আছে কোন জিত। সবই সাময়িক। এখন যেটা দেখছি সেটা আগল চেহারা নাও হতে পারে। সেটা মুখোশ হতে পারে। সময়ের এবং পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে মানসিক পরিবর্তন ঘটে। তখন ঐ মুখোশটা খসে পড়ে আসল চেহারা— হারের চেহারা বেরিয়ে পড়তে পারে। জীবনে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে নিজের কাছে বা অন্যের কাছে নিজেকে সফল বলে মনে হতে পারে। আবার এমন সময় আসতে পারে যখন জীবনের এই দৌড় শ্লথ হয়ে আসে তখন অন্তরের অন্তস্থলে আত্মসমীক্ষা করতে গিয়ে মন আত্মগ্লানিতে ভরে ওঠে— মন বলে এই আর্থিক সৌধ অসৎ উপায়ে গড়া। তখন বিজয়োল্লাসের ছবিটা যেন নিজের কাছেই অচেনা হয়ে যায়। কালপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে অতীতটা জীবাশ্মে পরিণত হয়। আগের জিত পরে হারে পরিণত হয়। কবি এই দার্শনিক চিন্তা সুন্দর ভাষায় উপস্থাপিত করে পাঠক সমাজের হৃদয়াসনে স্থান করে নিয়েছেন।

আত্মিক : জীবনের শেষপ্রান্তে শরীর জরাজীর্ণ। মনটা ফাঁকা ফাঁকা লাগে। সুপ্ত স্মৃতিগুলো মাঝে মাঝে জেগে উঠে কাঁদাতে ফিরে আসে। জেগে ওঠে পাপবোধ। বিবেকের আগুনে নিজেই নিজেকে দগ্ধ করে। অস্থি, চর্মে ঢাকা শরীর ঈশ্বরের মন্দির। মরণের পরে পোড়া দেহে ঈশ্বর থাকে না। কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর। কবরস্থান মৃত মানুষের শেষ আশ্রয়। তাই অস্পৃশ্য। আবার কবরস্থান বহু আত্মার মিলনক্ষেত্র— তাই পবিত্র। কবি দর্শনের এই জটিল তত্ত্ব সাবলীলভাবে পরিবেশন করে পাঠকদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন।

বিশাল শূন্যতা : কবি এখানে দু'টি শব্দ ব্যবহার করেছেন— দলবদ্ধ এবং সঙ্গবদ্ধ। দলবদ্ধ সঙ্কীর্ণতার পরিচয় বহন করে। সঙ্গবদ্ধ বিস্তীর্ণ পরিসরের পরিচয় বহন করে। আমরা মানুষ দলবদ্ধভাবে সঙ্কীর্ণতার আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছি। কবি তবু আত্মানুসন্ধানী। কবির এই ছোট্ট কবিতা Lord Tengson এর Ulgsis কবিতার বিখ্যাত লাইন মনে করিতে দেয়— 'To strive, to seek, to find./ And not to yeild'.

স্বপ্ন : স্মৃতি সততই সুখের। আবার অতীত দিনের সুখস্মৃতি যদি স্বপ্নের রঙিন পাখার ওপর ভর করে ফিরে আসে সে বড় মধুর। সেই

রঙিন স্বপ্ন যদি ভেঙে যায় মনটা বিরক্তিতে ভরে ওঠে। স্বপ্নের রঙিন পর্দা ভেদ করে যখন রূঢ় বাস্তবের সম্মুখীন হই তখন মনে হয় কেউ যেন আমায় বিদ্রূপ করছে। স্বপ্নের রঙিন জগৎ আর রূঢ় বাস্তব যেন একই বৃন্তে ফোটা দু'টি ফুল। কবির চিন্তাধারা দুই বিপরীত মেরুর ধারণা— সুখস্মৃতি বিজড়িত রঙিন স্বপ্ন ও রূঢ় বাস্তব— একই ভূমিতে গ্রথিত করে চিন্তার দিগন্ত প্রসারিত করে দিয়েছেন।

গোবিন্দলাল : এই কবিতাটি ব্যঙ্গহাস্য রসোদ্দীপক। কবি পরিহাসচ্ছলে দেখিয়ে দিয়েছেন যে সমাজে গোবিন্দলালের মত অর্থলোভী বাবাও আছেন যিনি নিজের মেয়ের সাথে বিয়ে দেন এমন এক জামাই-এর যার সম্বন্ধে বলা যায় 'কোন গুণ নেই তার কপালে আগুন' এবং এই বিয়ে দিয়ে বিয়ে দেওয়ার ব্যয়টুকু বাঁচিয়ে নেন। পরিহাসচ্ছলে কবি স্কুলের মাষ্টারমশাইদেরও মেরুদণ্ডহীন বলতে ছাড়েন নি। জীবনের গতি প্রকৃতির বিশ্লেষণের মত ভাবগম্ভীর জগতে বিচরণকারী কবির হাস্যরস পরিমণ্ডলে স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল বিচরণ তাঁর গৌরবের মুকুটে আর একটি পালক বসায়।

রামু চাচার গোঁফ : কবি এই কবিতায় লঘু হাস্যরস পরিবেশন করেছেন। রামুকাকা এমন এক ব্যক্তি যিনি আহারে বসলে আবেগে গলে যান, হাতে পায়ে চঞ্চল কিন্তু ব্যস্ততা নেই, কাজের কথা শুনেই কাজ ভুলে যান। একই মানুষের মধ্যে বিচিত্র ধরণের বিপরীত ধর্মী গুণ একই সঙ্গে কাজ করায় হাসির উদ্রেক করে। তাঁর কাছে গোঁফটাই সব। সহজ সরল ভাষায় হাস্যরস উদ্রেককারী রামুচাচার ছবি নিপুণ চিত্রশিল্পীর মত পাঠকের চোখের সামনে তুলে ধরে নির্মল হাস্যরস সৃষ্টির জগতে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছেন।

বিবেক : 'কোথায় পাব তারে'। যাকে পেলে জীবনের সব পাওয়া হয়ে যায় কবি তাঁকেই আজীবন খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কবি জীবাত্মা হয়ে পরমাত্মার সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। 'আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্তং সর্বংব্রহ্মময়ং জগৎ'। অবশেষে কবি ঘাসের মুখে এক বিন্দু শিশিরের মধ্যে তাঁর আরাধ্য দেবতার সন্ধান পেলেন তাঁকে ভালবেসে কবির আত্মানুসন্ধান ঘটল। এই কবিতার মধ্য দিয়ে যে আর্তি ফুটে উঠেছে তাতে বলা যায় যে কবি আধ্যাত্মিকতার সাধক।

কিছুক্ষণ : নির্জন রাতে দিগন্তের পানে চেয়ে কিছুক্ষণ জেগে থাকা মনকে স্মৃতির সরণি বেয়ে নিয়ে যায় ফেলে আসা দিনগুলিতে। ফিরে যাই সেই আলোঝলমল দিনগুলিতে যে দিনগুলি ছিল কিছু চাওয়া, কিছু পাওয়ার আশায় উজ্জ্বল। অতীত স্মৃতির মধ্যে ডুব দিয়েও কিছুক্ষণের জন্য হলেও সুখ আছে। শুধু নিরবচ্ছিন্ন সুখ নয়, সেখানেও চোখের ভাষায় প্রত্যাখানের গ্লানি ও অভিশাপ বেদনাদায়ক কিন্তু তবুও মধুর লাগে। এ যেন অসীমের সঙ্গীত ধারার অঙ্গস্বরূপ। কবি যেন আবেগপ্রবণ ভাবুক মানুষের মনের মধ্যে ডুব দিয়ে মণিরত্ন খুঁজে আনার চেষ্টা করেছেন।

আমি ও কল্পনা : আমি কে? কে এই আমি? কবির কল্পনা সুদূরপ্রসারী অস্তিত্বের বিভিন্ন রূপ কল্পনা করেছেন। কিন্তু তিনি তার কোনটাই নন। তাহলে বলা যায় তিনি সাধারণের মধ্যে সাধারণ হয়েই থাকতে চান। তিনি উচ্চাভিলাসী নন। তাই কোন কিছু পাওয়ার জন্য ইঁদুর-দৌড় নেই। নিজেকে প্রকাশ করার একটা অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। উচ্চাভিলাসী মানুষের যা যা হওয়ার স্বপ্ন থাকে সেখান থেকে নেতি নেতি করে নিজেকে সরিয়ে এনে এক জায়গায় নিজেকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন— পাঠক সেই অবস্থানটি চিনে নেবে। এটাই অভিনব পদ্ধতি।

মৃত্যু একটা শব্দ : মৃত্যুটা কি বা মৃত্যুর পরে কি আছে— এটা চিরকালের প্রশ্ন। কবি তাঁর সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি দিয়ে সেই অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করেছেন। মোহময় উচ্ছ্বসিত প্রাণ মৃত্যুর স্পর্শে যেন মোহ থেকে মুক্তি পায়— জীবনের চাওয়া, পাওয়ার সব সমাপ্তি, থেমে যায় সব কান্না। অবস্থার রূপান্তর— এক জীবন থেকে অন্য জীবনে উত্তরণ যেখানে শুধু আছে নিঝুম নিস্তব্ধতা, নেই কোন ব্যস্ততা, আছে শুধু অবকাশ। যেখানে আছে বিষন্ন শূন্যতা ভরা সপ্তর্ষির গতিরেখা নির্দেশক ছায়াপথ। যে ছায়াপথ বেয়ে ইহজীবন মহাবিশ্ব জীবনে লীন হয়ে যায়। কবি ভাষা প্রয়োগ নৈপুণ্যের জোরে সুন্দরভাবে ইহজীবন অবসানের পরবর্তী অবস্থাটা এঁকেছেন কিন্তু মৃত্যু শব্দটি একবার মাত্র ব্যবহার করেছেন।

মৃত্যু : চলমান জীবনের পথে পূর্ণচ্ছেদ বসায় মৃত্যু। 'পথিক ক্লান্ত পায় ফিরিবার পথ চায়'। জীবন পথের পথিক চলতে চলতে, বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করতে করতে, ঘাত-প্রতিঘাতের দহন সহ্য করে ক্লান্ত হয়ে ফেরার পথ চায়। কোথায় ফিরবে? মৃত্যু নিঃশব্দ চরণে এসে বলে 'মন চল নিজ নিকেতনে।' মহাশূন্যে মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গে নাচতে নাচতে অসীমের সাথে মধুর মিলন ঘটায় মৃত্যু। জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হয়ে যায়। জীবাত্মা একদিন যে পরমাত্মা থেকে উৎসারিত হয়েছিল সেখানে ফিরে এসে তার হারানো পরিচয় খুঁজে পায়— যেখানে বিরাজ করে অখণ্ড আলোর রেশ। কবি তাঁর সুললিত ভাষায় জীবন ও মহাজীবনের চিত্র তুলে ধরেছেন। মাঝখানে যেন একটি দরজা। মৃত্যু যেন জীবন পথিকের দেহহীন সত্ত্বাটি মহাজীবনের পথে পৌঁছে দেওয়ার বাহক। কবির আধ্যাত্মিক চেতনা ও মৃত্যুকে ভয় শূন্য রূপে উপস্থাপিত করা তাঁর বহুমাত্রিক জীবন রক্ষার প্রতিফলন।

ব্যতিক্রম : জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তির নানারকম আচরণ স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী চলে না— এটাও কবির নজর এড়াতে পারেনি। এটাই তাঁকে ব্যতিক্রমী লেখক বা ব্যতিক্রমী কবি করে তুলেছে কেউ সচেতন থেকেও পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য নির্লিপ্ত থাকে। কারও মুখে যেমন হাসি থাকলেও অন্তরে ঝরে কান্নার রাশি। যে কোনও জিনিসের রূপ সৌন্দর্য্য নির্ভর করে তাকে কী চোখে দেখা হচ্ছে তার ওপর। কবির দৃষ্টিতে এইসব ব্যতিক্রমী জিনিসগুলো নতুন সৃষ্টির উৎস।

প্রতিচ্ছবি : ছবি ও প্রতিচ্ছবি। কাগজের ওপর আঁকা কোনও অবয়ব বা মূর্তির নাম ছবি। ছবির বিপরীতে ঐ ছবির আদলে যদি কোন অবয়ব দেখা যায় তার নাম প্রতিচ্ছবি। কাল চিরচঞ্চল। সে কারও

জন্য অপেক্ষা করে না। তার চলার সাথে সাথে সে কাজ করে যায়। পৃথিবী চলে পরিবর্তনের স্রোতে ভেসে আজ যাকে সামনে থেকে দেখা যাচ্ছে কালের নিয়মে সে একদিন ছবি হয়ে যাবে। তারই মুখের আদলে অন্য মানুষকে দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যাই। ছবি ও প্রতিচ্ছবি কী এই যে মিল এটি স্বাভাবিকভাবে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। কবির এই উপস্থাপনা শ্রদ্ধেয় লেখক এস ওয়াজেদ আলির 'ভারতবর্ষ' নামক প্রবন্ধের কথা মনে করিয়ে দেয়— যেখানে তিনি বলেছেন, 'সেই ট্র্যাডিশন আজও সমানে চলছে।'

শ্রদ্ধেয় আলি সাহেব একবার এক প্রত্যন্ত পল্লীতে সন্ধ্যাবেলায় দেখেন এক ছোটো দোকানের ওপর কেরোসিনের লম্প জ্বালিয়ে টাক মাথা এক বৃদ্ধ চোখে চশমা পরে রামায়ণ পড়ছে। পঁচিশ বছর পরে লেখ আলিসাহেব সেই দোকানের সামনে সন্ধ্যাবেলায় গিয়ে দেখেন সেই টাকমাথা বৃদ্ধ চোখে চশমা পরে রামায়ণ পড়ছে না। লেখকের মনে সন্দেহ হয়। তিনি আশেপাশে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন যে পঁচিশ বছর আগে যাকে দেখেছেন তিনি মারা গিয়েছেন। এখন যাকে দেখছেন তিনি পূর্বের দোকানদারের ছেলে। সেই রামায়ণ পড়ার ট্র্যাডিশন আজও চলছে পুরুষাণুক্রমে।

কবির সংবেদনশীল মনে প্রতিচ্ছবিকে দেখে অতীতের বহু স্মৃতি গুমরে কেঁদে ওঠে। কবির চিন্তার পরিসর খুবই বিস্তৃত। এই কবিতার মধ্যে কালের এক বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পুরাতনকে বিদায় জানিয়ে নতুনকে প্রতিষ্ঠা করে— যার মধ্যে পুরাতনের আদল থেকে যায়। সেখানেই 'চেনা মুখের অচেনা বিস্ময়।'

বিক্ষিপ্ত : জীবনে চলার পথ কখনও বন্ধুর, কখনও মসৃণ। চলতে চলতে বহু অনভিপ্রেত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। আঘাত ও সংঘাতের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে মনটা দুর্বল হয়ে যায়। এমনি করে চলতে চলতে জীবন পথের পথিক ক্লান্ত হয়ে পথ পরিক্রমা শেষ করে। বহু বিনিদ্র রজনীতে এই সব ঘটনা, দুর্ঘটনা, ইতঃস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বহু স্মৃতি চোখের সামনে এসে হাজির হয়। এমনি করেই জীবন প্রবাসী পথিক তার পথ চলা শেষ করে। কবি তাঁর সুললিত ভাষায় ইঙ্গিতে জীবন পথের পথিক কীভাবে তার প্রবাসী জীবন পরিক্রমা শেষ করে আপন আলয়ে ফেরত যাচ্ছে সেটাই দেখিয়েছেন। কবির কল্পনাশক্তি ও বিষয়বস্তু উপস্থাপনার দক্ষতা প্রশংসার দাবী রাখে।

কল্পনার কাননে সূর্য : পিরয়জনকে দেখার জন্য, কাছে পাওয়ার জন্য মন যখন উদ্বেল হয়ে ওঠে তখন অনেক আশঙ্কা অনেক ভয় ভীতি, দুর্ভাবনা মনের মধ্যে উঁকি মারে। আবার সেখান থেকেই অনেক আশার আলো বিচ্ছুরিত হয়, আনন্দের উৎস দেখা যায়। জীবন, ভালোবাসা যেন বিচিত্র আলো আঁধারের খেলা— মেঘ-রৌদ্রের খেলা। এই আশঙ্কা, দুর্ভাবনা বা আশার আলো শুধু কল্পনা প্রসূত। কবির সত্ত্বা দু'ভাগে বিভক্ত— একটি তাঁর নিজস্ব, আর একটি তাঁর প্রিয়জনের। এ যেন নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলা, প্রশ্নোত্তর। নিজের অন্তরের মধ্যে আর একটি পৃথিবী তৈরি করে ফেলেছেন যেখানে সূর্যও দেখা দেয়, আবার আঁধারও নেমে আসে। সবই কল্পনার মায়াজাল। এখানে আনন্দ আছে, অশ্রুও আছে। আঁধার আলোর এই তো খেলা, এই তো জীবন রে।'

কবি কল্পনার জাল বিস্তার করতে করতে দার্শনিকতার এক উচ্চ স্তরে পৌঁছে গিয়েছেন যেখানে আছে শুধু আনন্দ, অশ্রুর মাঝেও আনন্দ— তাই তিনি জীবনানন্দ।

চাওয়া-পাওয়া : 'দাও ফিরে সে অরণ্য/লও এ নগর।' কবি সভ্যতার উগ্র আলো ঝলমলে পরিবেশ ছেড়ে প্রকৃতির স্নেহে লালিত অরণ্যের নিস্তব্ধতাকে আহ্বান করছেন। অরণ্যের জীবজন্তু নগ্ন হলেও অরণ্যের একটা অলিখিত শৃঙ্খলা, অনুশাসন আছে। তারা কেউ ঐ শৃঙ্খলার সীমারেখা অতিক্রম করে না। অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে না। তাদের মধ্যেও শালীনতা বোধ আছে। খাবার নিয়ে সেখানে কামড়াকামড়ি নেই। প্রকৃতি সাড়া দেয়— চাতকের ডাকে মেঘ জমে। সেখানে ধ্বংস নিয়ে আসে নতুন সৃষ্টির বার্তা।

এ এক অন্য কবিকে দেখছি— যিনি আধুনিক সভ্যতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে অরণ্যের সভ্যতাকে বরণ করে নিতে প্রস্তুত। প্রকৃতির সাথে একাত্মতা গঠন করে শান্তির জীবন যাপনের এক বিনম্র আবেদন করে কবি নিজেকে এক মহান উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

কল্পনা-মায়াজাল : 'চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে।' কবির চোখের আলোর উৎস কবির কল্পনা। সেই আলোয় কবি কখনও উজ্জ্বল তারায় কখনও বা পাহাড়ি নদীর বাঁকে তাঁর প্রিয়জনকে দেখেছিলেন হারিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন নিয়ে। কিন্তু জীবন বড় বিচিত্র— যাহা চাই তাহা পাই না। না পাওয়ার বেদনা বুকে চেপে রেখে তাকে জীবন থেকে মুক্ত করে দিয়ে মুক্তির আনন্দই প্রাপ্য। কিন্তু এ সবই কল্পনার আলোয় উদ্ভাসিত।

কবি কল্পনার পাখায় ভর করে মানুষের মনের গতি প্রকৃতি অনুধাবন করার চেষ্টা করেছেন তার জন্য তাঁকে সহস্র প্রণাম।

অনন্ত শূন্য : 'মন নিয়ে কি মরবি নাকি শেষে?' মনের গতি বড় বিচিত্র। কোনও সাধারণ নিয়মে তাকে বেঁধে রাখা যায় না। মন যেতে চায় দূরে বহু দূরে। কিন্তু তবুও কোথায় যেন একটা শিকড়ের পিছুটান থাকে। জীবনে চলার পথে কত স্বপ্ন, কত আশা কত বাসা বাঁধার আশা কবিতা ওখানে ফুটে ওঠে। কবি এখানে লিখেছেন 'কত কথা বলে যায় না বলা কথা?' 'Silence is eloquent, more eloquent than eloquence'। সেই স্বপ্নের সব ছবি সফল হয় না। কিছু ছবি ছবিই থেকে যায়। ব্যর্থতায় শেষ হয়। 'কেউ ভালবাসা দিয়ে বা কেউ পেয়ে হারাল।' কিন্তু কিছুই হারিয়ে যায় না অনন্ত শূন্যে তারা ভাসমান থাকে। 'জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা। পূর্ণের পদ-পরশ তাদের পরে।' (রবীন্দ্রনাথ) কবি এখানে ভাবাবেগে উদ্ভ্রান্ত। এক এক নতুন জীবন দর্শন। কবি সকল মানুষের আত্মার আত্মীয় হয়ে উঠেছেন।

কে তুমি : অজানাকে জানার এবং অচেনাকে চেনার আগ্রহ মানুষের চিরকালের। শ্রদ্ধেয় কবি শ্রী মানসকুমার ঠাকুরও ব্যতিক্রমী নন। তিনি অন্তরের সীমাহীন আকাশে মুক্ত বিহঙ্গের মত পাখা মেলে দেন। কল্পনার আলোয় গড়া প্রেয়সীকে এক এক সময়ে এক এক রূপে দেখেন। কখনও

সমস্ত আশা পদদলিত করে স্থির দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়ে, কখনও দেখায় শেষ শ্রাবণের স্নিগ্ধ বৃষ্টি, কখনও সতী সাবিত্রী কখনও বা মা যশোদা আবার কখনও বীরাঙ্গণা রানী লক্ষ্মীবাঈ। এ শুধু কল্পনা, অলীক স্বপ্ন মাত্র। 'নিশায় স্বপনে সুখী সুখী যে কী সুখ তার ? জাগে সে কাঁদিতে। স্বপ্ন স্বপ্নই। স্বপ্ন ছায়া দিয়ে গড়া। ছায়া কোনওদিন কায়ার তৃপ্তি দিতে পারে না। স্বপ্নের আবেশ কেটে গেলে সেই রমনী অধরা থেকে যান। অতৃপ্তির অন্ধকার মনকে আবার আচ্ছন্ন করে দেয়। কবি ভাবাবেগে আচ্ছন্ন। স্বপ্নের জাল বুনে তৃপ্তিদায়ক ছবি আঁকতে ভালোবাসেন। কিন্তু 'ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে বাড়ায় মাত্র আঁধার পথিকে বাঁদিতে'। এ তৃপ্তি ক্ষণস্থায়ী হলেও তবুও মধুর। Robert Browring তাঁর Last Ride Together কবিতায় বলেছিলেন তাঁর প্রিয়তমাকে এসো আজ এক সঙ্গে riding উপভোগ করি। 'Who knows the world may lnd to nigt' একটা কথাই বলতে পারি 'great men think alike.'

স্বপ্ন সংকলন : মানুষ যখন স্বপ্নের সাগরে ভেলা ভাসায় তখন সে রঙিন কাঁচের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর সব কিছু দেখে, সব কিছু সুন্দর, চায় না এই স্বপ্ন ভেঙে রূঢ় বাস্তবের সম্মুখীন হতে। এ যেন এক নতুন সুন্দর পৃথিবী যেখানে আছে শৃঙ্খলিত নৈসর্গিক চুম্বন জ্যোৎস্নার প্লাবনে প্লাবিত স্নিগ্ধতা ও মাধুর্যে ভূষিত। একান্তে বসে প্রার্থনারতা রমণী। সামনে উন্মুক্ত পৃথিবী। ছায়া দিয়ে গড়া এই স্বপ্নের দেশ সব চাওয়া পাওয়ার উর্দ্ধে এখানে সবই অধরা। কবি আপ্লুত তার বিমুগ্ধ নিষ্ঠায়।

কবির কল্পনা সুদূরপ্রসারী। তাঁর পরিশীলিত ভাষায় এক বিমূর্ত স্বপ্নের দেশ চিত্রায়িত করেছেন যেখানে বৃথা আলোর আশায় ঘুরে মরাই পরিণতি। তাঁর এই সুচারু উপস্থাপনা যেন ঝর্নার জল যেখানে অবগাহন করলে মেলে শান্তি ও স্নিগ্ধতা।

শব্দের মৃত্যু : কবির লেখনী তাঁর চিন্তার দিগন্ত প্রসারিত ক'রে তার মধ্যে শব্দের ভাঙা গড়ার প্রক্রিয়াকে অন্তর্ভূক্ত করে নতুনত্বের স্বাদ উপহার দিয়েছে। শব্দেরও জীবন আছে। প্রাণীর যেমন জন্ম ও মৃত্যু থাকে শব্দেরও তেমন জন্ম ও মৃত্যু আছে। কাল শুধু পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে পুরাতন শব্দকে অচল ঘোষণা করে বিদায় জানায় এবং নতুন শব্দকে স্বাগত জানায়। পুরাতন শব্দের হয় জীবনাবসান। নতুন শব্দ জন্ম নেয়। কবি সাহিত্যিক এই প্রক্রিয়ার কর্ণধার। প্রাণী জগতে যেমন মৃত্যু সুনিশ্চিত জেনেও বাঁচতে চায়, শব্দের সংসারেও তেমন পুরাতন শব্দ নতুন শব্দের পাশে টিকে থাকতে চায়। শব্দকে প্রাণময় প্রতিপন্ন করে সাহিত্যে যেমন নতুন স্বাদ আমদানী করে সাহিত্য জগতে নিজের সুউচ্চ আসনের দাবী রাখেন।

অবয়ব : মানুষের মন বড় বিচিত্র। সেখানে নিত্য আশা, নিরাশা পাওয়া না পাওয়ার দ্বন্দ্ব চলে। মনের মধ্যে চলে আলো, আঁধারের খেলা। নানারকম চিন্তাভাবনার দোলাচলে মানুষের মনের পর্দায় হয়তো কারও ছবি ভেসে ওঠে। তখনই ভয়ে আঁতকে ওঠে। মানুষের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলে তার মধ্য থেকেই সাহস পায় যে ঐ অবয়বের কোনও ক্ষতি করার ক্ষমতা নেই। মানুষের অবচেতন মনে যে কত রকমের ভাঙা, গড়া, ওঠা, পড়া চলে তার একটা সুন্দর ছবি ভাষায় এঁকে সুললিত সাহিত্যকৃতির পরিচয় দিয়েছেন।

পড়ে থাকা চিঠি : প্রতিদিন কত চিঠি ডাকে আসে, ডাক পিওন বিলি করে। মানুষ দূরে বসবাসকারী আত্মীয়স্বজনের খবর পায়। কিন্তু কবির কাছে এসে পড়েছে— একটা সাদা কাগজে ঠিকানা লেখা— 'দাদুর বাড়ী-নদীর ধারা'। কবি মনের গভীরে ডুব দিয়ে অনুভব করছেন এ চিঠি হয়তো কোনও শিশুর অন্তর-বেদনার সাক্ষ্য। তার হারিয়ে যাওয়া দাদু ফিরে আসবে বলে প্রতীক্ষারত কবি সেই শিশুর আর্তি এমন ভাবে প্রকাশ করেছেন যা মন ছুঁয়ে যায়— চোখে জল আনে। এইখানে কবির সার্থক লেখনী কবিকে জয়ী করে দিয়েছে।

শব্দ-সারাংশ : শব্দের বিচিত্র প্রকৃতি কবির বর্ণনায় স্থান পেয়েছে। এই শব্দ আমাদের চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে এবং এর প্রভায় অন্তর আলোয় উদ্ভাসিত হয়। আবার সেই শব্দ শিশুর মত ঘুমিয়ে পড়ে। নিষ্ক্রীয় হয়ে যায়— সব কিছু নির্ভর করে আমরা কীভাবে তাকে ব্যবহার করব তার ওপর। শব্দ নিস্পাপ, তার সৃষ্টিশীলতাকে কোন সীমারেখার মধ্যে বেঁধে রাখা যায় না। কিন্তু সেই শব্দ বড় অসহায়, শিশুর মত ঘুমিয়ে থাকে। আমাদের শব্দকে নিয়ে ব্যবহার বিদ্যুতের মত কাজ করে, তার মধ্যে প্রাণসঞ্চার করে। তখন সেই শব্দ অন্তহীন সৃষ্টিশীল হয়ে ওঠে, শুনতে পাওয়া যায় ব্যাকুল আহ্বান। স্বল্প পরিসরে শব্দ ব্যবহারের কার্যকারিতার দিশা যেভাবে কবি দিয়েছেন সেটি প্রশংসার দাবী রাখে।

অভিমুন্য : মহাভারতে অভিমুন্যের কাহিনী এক কলঙ্কিত অধ্যায়। যুদ্ধের যে কলঙ্কিত প্রথা যা যুদ্ধের ঐতিহ্য বলে পরিচিত সেটি চিরকালের প্রশ্নের মুখে— নিন্দার্থ। জীবনে বহু আশার মুকুল, অন্যায় প্রতিকুলতার ঘাত প্রতিঘাতে অকালে ঝরে পড়ে, বহু স্বপ্ন সমাধি লাভ করে। মন বড় বিচিত্র। মনের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দু মনকে বহুধা বিভক্ত করে দেয়। মনের মধ্যেই মনের শত্রু জন্ম নেয়। অচিরেই প্রলয়ের রূপ নেয়। প্রচণ্ড লড়াইয়ের (অন্তর্দ্বন্দ্বের) পর স্বপ্ন চুরমার হয়ে যায়। কিন্তু এই পরাজয় এক গৌরবোজ্জ্বল স্বাতন্ত্রে সমাদৃত হয়। এ পরাজয়েও যে গৌরব আছে— কবি তাঁর সুচারু প্রকাশ ভঙ্গিমার দ্বারা পাঠক মনে তাঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

শুধু তোমাকে : এই কবিতা কবির স্বর্গীয় প্রেমের আর্তি— যাকে তিনি চোখে দেখেন নি কিন্তু তার সুরের মাধ্যমে তাকে ভালো বেসেছেন। সুরের আলোয় কল্পনায় তাকে দেখেছেন। সেই সুরের চন্দন সারা অঙ্গে মেখে প্রেমের নামাবলী গায়ে জড়িয়েছেন। এ যেন কৃষ্ণের বাঁশি শুনে শ্রীরাধার মন উতলা হওয়ার মত। 'বাঁশী শুনে কি ঘরে থাকা যায় ?' কবি জানেন যে তাঁর স্বপ্নের প্রেমিকা দূরে আছেন কিন্তু সঙ্গোপনে তিনি প্রেমিকাকে মন দিয়েছেন। স্বার্থের সংসারে তাকে একা চেয়েছেন। না পাওয়ার ব্যথা তাঁর বুকে। তিনি অন্তরে বাহিরে তাকে খুঁজে ফিরছেন। সুমধুর ভাষায় কবি স্বর্গীয় প্রেমকে মহিমান্বিত করে নিজে মহিমান্বিত হয়েছেন।

কাল্পনিক : ভাবোন্মত্ত কবি কল্পনার পাখায় ভর করে বহুদূর চলে যান— মনের গভীরে তিনি ডুব দিয়ে রাতের অন্ধকারের সন্ধানে থাকেন। কিন্তু যা চান তা পান না। বাহিরে পূর্ণিমার আলোয় জগৎ উদ্ভাসিত। আঁধারেরও একটা রূপ আছে সৌন্দর্য্যও আছে। পূর্ণিমার আলো তো আপনাতেই ভাস্বর। কবি দ্বন্দ্বে পড়ে যান— কে কত সুন্দরী। আঁধার তাঁর মনের গভীরে ঠাঁই করে নিয়েছে। আর পূর্ণিমার আলো তাঁর অঙ্গ জড়িয়ে। এই দোলাচলের মধ্যে তাঁর আঁকা তাঁকে শক্তি জোগায়। সেই শক্তির জোরে সমস্ত সংশয় জয় করে নির্ভয় হয়ে চলেন। মনের বিচিত্র পথে বিচরণ সংক্ষেপে কবি সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন।

নির্বাক যন্ত্রণা : কবি অন্তর্মুখী। মনের গভীরে ডুব দিয়ে তিনি আত্মানুসন্ধানী। অন্তরের অন্তস্থলে কিছু স্মৃতি আশ্রয় নেয়। আবার নীরব ভালোবাসা বিস্মৃতির সাগরে ভাসতে থাকে। কবি আবেগপ্রবণ। তাঁর আবেগ তাঁর মধ্যে উন্মাদনা জাগায়। ভাব যেখানে গভীর, ভাষা সেখানে মূক। ভাষার স্তব্ধতা যন্ত্রণার সৃষ্টি করে। জীবনের পথে চলতে চলতে কবি ক্লান্ত— সব বিদ্বেষ শেষ করে দিতে চান। কবি আর জীবন নীড়ে আবদ্ধ থাকতে চান না। তিনি নিজের মধ্যে নিজে হারিয়ে যেতে চান। সব কিছু বিসর্জন দিয়ে তিনি প্রশান্তি চান। সুললিত ভাষায় তাঁর আবেদনটি সুন্দরভাবে প্রকাশ করে শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করে তিনি মহান হয়ে উঠেছেন।

অজানা সংকোচ : বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় গাড়ির মধ্যে রাহুল ও অজন্তা। তৃতীয় ব্যক্তি কবি। রাহুল বাইরের দিকে তাকিয়ে মনের মধ্যে ডুব দিয়েছে। অজন্তাও আনমনা ভাবনায় ডুবে। মানুষের মনের চলন বড়ই বিচিত্র। বাজ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অজন্তা সাহায্যপ্রার্থী হয়ে হাত বাড়িয়েছিল। কিন্তু রাহুলের দিক থেকে কোনও সাড়া নেই। একটা সঙ্কোচের প্রাচীর যেন রাহুলের মস্ত বড়ো বাধা। কিন্তু কেন? আগে তো দু'জনেই বন্ধু ছিল। তখন তো এ সঙ্কোচ ছিল না। এখন দু'জনে আরও আপন হয়ে গিয়েও যেন দু'জনের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে সঙ্কোচ। রাহুল 'উন্মত্ত স্রোতের মত চলমান' কিন্তু একাকীত্বই অজন্তার সঙ্গী। জীবন সঙ্গিনী হয়েও সে রাহুলের চলার সঙ্গী নয়। ড্রাইভার বলে 'বাবু বেহালা চৌরাস্তা'— অজন্তার নামার জায়গা। রাহুল প্রস্তাব দেয় আরও একটু ঘোরাও কিন্তু অজন্তার মনে সঙ্কোচ 'লোকে দেখে নেবে।' দূরে থাকলে নির্ভয় আকর্ষণ থাকে। কিন্তু কাছে থাকলে সব সময় একটা আশঙ্কা যে লোকের কুনজরের আগুনে যদি তাদের ভালোবাসার স্বর্গ পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। মানুষের মন গঙ্গায় উথালি পাতালি ঢেউয়ে কত যে ভাঙা-গড়ার কাহিনি থাকে সেটি কবি সুন্দরভাবে চিত্রিত করে মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন।

বিশ্বাসভঙ্গ : জীবনে চলার পথ আলোছায়া ঘেরা বড়ো বন্ধুর। চলতে চলতে বন্ধু পেতে পেতে হারাতে হারাতে জীবনের পথ পরিক্রমা। বিশ্বাস করে বিশ্বাসভঙ্গ বড়ো বেদনাদায়ক প্রেমিকের স্নিগ্ধ হাসির মোহমায়া মনকে বিবস করে দেয়। আবার যখন সেই মোহজাল ছিন্ন হয়ে যায় দু'জনে দু'জনকে নতুন করে চিনতে থাকে— সমস্ত স্বপ্ন মরিচিকা বলে মনে হয়। নারীর দুর্বল কোমল মনের সুযোগ নিয়ে খেলা করতে করতে মানুষ এক সময় খেলার জালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে— পরাজয়কে মেনে নিতে হয়।

ভাঙা-গড়া চিরকালের— সময় কাউকে ক্ষমা করে না। মানুষের মন আকাশ পাতাল চিন্তা করে। সময়ের পায়ে সমর্পন শেষ পরিণতি। কবির লেখনীস্পর্শে জীবনে আলো-ছায়া ও ভাঙা-গড়ার খেলা সুন্দরভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

সে লজ্জা : প্রেমাস্পদের গানে অনাবিল প্রতিশ্রুতির অভাব কবিকে ব্যথা দেয়— মন পড়ে বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলাচলে। কবি সেটি উপলব্ধি করেন— তাই লজ্জা। তিনি মনে করেন লজ্জার আগুনে বিশুদ্ধ হয়ে শান্ত রাত্রির চঞ্চল বাতাসেই যেন প্রিয়ার গায়ের স্পর্শ অনুভব করতে পারেন— লুকানো বিশ্বাস ফিরে আসতে পারে। এখানেও সেই বিশ্বাস-অবিশ্বাসের আলো আঁধার। ভালোবাসার পথে চলতে চলতে অবিশ্বাসের ছায়া বড়ো লজ্জার। জীবনের আঁকা বাঁকা পথে চলতে চলতে মানুষের মন যমুনার অঙ্গে-অঙ্গে ভাবতরঙ্গের কত খেলা। কবি তাঁর সুললিত ভাষায় ছবি এঁকে নিজেকে উচ্চ পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

দিগন্ত : কবির প্রেয়সী কবির কাছ থেকে পায় নি পবিত্রতা, পায় নি আশ্বাস। তাই বড়ো ক্লান্ত। কবির মনের মধ্যে অনুশোচনা। নিজেকে সংশোধন করার জন্য যখন ছুটে গেলেন তখন সব শেষ— তিনি কবিকে মুক্তি দিয়ে 'আমার মুক্তি আলোয় আলোয়- এই আকাশে'। গাইতে গাইতে মহাজীবনের পথের পথিক হয়েছেন। কবি আপন সংকীর্ণতার জালে আবদ্ধ হয়ে প্রিয়জনকে হারানোর বেদনায় উদ্ভ্রান্ত। এই ব্যথার প্রকাশভঙ্গিমা এমন সুন্দরভাবে ভাষায় রূপদান করার জন্য কবি পাঠক হৃদয়ে চিরস্থায়ী আসন করে নিয়েছেন।

আত্মস্থ : এই কবিতা কবির এক আত্মানুসন্ধান। এই কবিতা হতাশার দীর্ঘশ্বাসে ভরা। মানুষের মধ্যে দু'টি সত্তা কাজ করে— সৎ প্রবৃত্তি এবং আদিম প্রবৃত্তি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় আদিম প্রবৃত্তি, ঘৃণা ও পাপের কাছে সৎ প্রবৃত্তি পরাজিত হয়। সর্বত্র হিংসা, দ্বেষ সৃষ্টিকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়। তৈরি হয় ইতিহাস। লেখা হয় জড় (ধ্বংসের পরে সবই জড় পদার্থ) পদার্থের ভালোবাসার কথা। কবির মন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। ধ্বংসজনিত লজ্জা ঢাকার জন্য আদিম প্রবৃত্তিকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে। কবির এই অন্তর্মুখী আত্মবিশ্লেষণ প্রশংসাই।

জীবনের মরীচিকা : কবি স্বপ্নালু হয়েও নৈরাশ্যবাসী। জীবন জীবনের জন্য। তবুও চলার পথ নিরাশার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সব স্বপ্ন ভেদ করে বেরিয়ে আসে নীরব অহঙ্কার যা জীবনকে সমস্যাবিহীন করে তোলে। বহু বিভ্রান্তি ও অশান্তির মাঝে জীবন খোঁজে জীবনকে— পিপাসার্ত হয়ে আলো সে তো ক্ষণিকের সে তো আলো নয়। সে তো আলেয়া। কিন্তু তবুও জীবন জীবনকে খোঁজে। এই কবিতার মধ্যে ব্যর্থতার চাপা ক্রন্দন যেন লুকিয়ে আছে। কবি তাঁর অসাধারণ ভাষা বিন্যাসে সুন্দরভাবে বেদনার সুরটি পাঠকের দরবারে উপস্থাপিত

করেছেন।

অনিয়ন্ত্রিত আবেগ : কবি যেন আবেগের তরঙ্গে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোনও কোনও লাইন যেন মনে পড়ে যায় কবিতাটি পড়তে গিয়ে 'বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মত হ'ল শেষ। যাত্রা কর যাত্রা কর যাত্রীদল উঠেছে আদেশ।'

কবি শরীরী ও অশরীরী অবস্থানের মাঝে একটা যেন বিভাজন রেখা টেনে দিয়েছেন। অশরীরী অবস্থায় কবি যেন পরিবর্তনের নতুন আলোয় নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছেন কবি বলতে চাইছেন তাঁর অস্তিত্ব তাঁর ভাবনার মধ্যে। নতুন প্রজন্ম তাঁকে কাছে পাবে তাঁর ভাবনা নিয়ে চর্চা ও চিন্তার মধ্যে। কবি নতুন জীবন পথের পথিক। 'পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি/ ওই কেটে গেল, ওরে যাত্রী'। নতুনের আলোয় সব আঁধার কেটে যাবে। 'নাই বুঝি, নাই চিনি, নাই তারে জানি/ ধরো তার পানি'। কবি তাঁর সুললিত ভাষার খেয়ায় চড়ে নতুনের জয়গান গেয়েছেন। তিনি নতুন আলো পথের পথিক। তাঁর চিন্তার গভীরতা ও প্রসারতা তাঁকে গৌরবোজ্জ্বল মহিমায় ভূষিত করেছে।

অনুধাবন : কবি নিজেকে হারিয়ে নিজেকেই খুঁজে বেড়াচ্ছেন কবি অন্ধকারের মধ্যে আলোর দিশা খুঁজে পান। এ আলো কবির নিজের চোখের আলো, কবির মনের আলো। কত স্বপ্ন অকালে সমাধি লাভ করেছে। জীবন একটা সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমা— অন্তহীন। শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে যায়। তবু এ চলার শেষ নেই। কবিতার মধ্যে কিছু আধ্যাত্মিকতা, কিছু পার্থিব, কিছু অপার্থিব আলো ছায়ার আভাস পাওয়া যায়। কবি নিজে অনুভব করেন এই মহাজগতে তিনি এক সূক্ষ্ম কণা মাত্র। তাঁর অনুধাবনে এটিও প্রতিফলিত যে সূক্ষ্ম জীবন থেকে আলোর বিচ্ছুরণ আনে প্রশান্তি। জীবন গড়িয়ে চলে আলোর প্রতীক্ষায়। কবির লেখনী রূপায়িত করতে চেয়েছে আলো আঁধারের মধ্য দিয়ে অনন্ত জীবন প্রবাহ। চলার পথে আলোর মধ্যে আঁধার, আবার আঁধারের মধ্যে আলো দেখতে পান কবি। এই আলো আঁধার অন্তরের আলো আঁধার। কবি অনন্ত জীবন পথের বিচিত্ররূপ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে নিজের আসন উচ্চমার্গে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

জীবন আড্ডা : এই কবিতাটি বেশ হালকা মেজাজের পরিবেশ সৃষ্টি করে। চায়ের আড্ডা বন্ধু বান্ধবের মধ্যে খুবই উপভোগ্য। গরম চা বা কফিতে চুমুক দিলে বন্ধু বান্ধবের মধ্যে তর্কের তুফান ওঠে— যার যে বিষয়ে জ্ঞান আছে চায়ের টেবিলে উজাড় করে দিতে চায়। কেউ কারুর থেকে কম যায় না। হেরে যাওয়াটা বড়ো লজ্জার। আত্মবিশ্লেষণী কবির চিন্তা হঠাৎ অন্তর্মুখী হয়ে ওঠে— দ্বন্দ্বে পড়ে যান। ভাবেন এই তর্কের ফল কী জীবনকে কী মৃত্যুর দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া energy loss এর মাধ্যমে না মৃত্যুকে জীবনের প্রান্তে আহ্বান। কবি নিজে কোনও উত্তর দেন নি। পাঠকদের দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে তাঁর রসপিপাসু মন কৌতুক বোধ করেন।

সংশয় : কবি সংশয়াবিষ্ট। কবি দেখেন এক, ভাবেন অন্য— তিনি উদ্ভ্রান্ত। দিগন্তে বিদায়ী সূর্যের ম্লান আলোর মধ্যে যেন গীতার নির্দেশ পান— 'তস্মাত্ত্বমুত্তি যশো লভস্ব জিত্বাশত্রুন ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম'। জীবনটা একটা যুদ্ধ। সংকট থাকবেই। সঙ্কটবোধ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে লড়াই করে সঙ্কট মুক্ত হতে হবে। 'সংসার সমরাঙ্গণে যুদ্ধ কর দৃঢ়পণে ভয়ে ভীত হয়ো না মানব .... যায় যাবে যাক প্রাণ মহিমাই জগতে দুর্লভ।' কবি একটি সত্য উপলব্ধি করেছেন— পরিচিতি কেউ দেয় না, পরিচিতি ছিনিয়ে নিতে হয়। স্বীকৃতি কেউ দেয় না, স্বীকৃতি ছিনিয়ে নিতে হয়।

'ঘরের মঙ্গল শঙ্খ নহে তোর তরে/নহেরে সন্ধ্যার দ্বীপালোক নহে প্রেয়সীর অশ্রু চোখ। পথে পথে অপেক্ষিছে কালবৈশাখীর আশীর্বাদ শ্রাবণ রাত্রির বজ্রনাদ।' অন্তরাগের স্নেহচ্ছায়ে যেন কবির সম্বিৎ ফিরে আসে, তাঁর অন্তরাত্মা জাগ্রত হয়। তিনি উপলব্ধি করেন যা দৃশ্যমান তার প্রকৃত রূপটি। চোখের নতুন আলোয় তাঁর সংশয়ের অন্ধকার দূর হয়ে যায়। কবি নিজের অজান্তেই এক জটিল দার্শনিক চিন্তার মধ্যে ঢুকে পড়েছেন এবং তার সমাধানও পেয়েছেন। তিনি যেভাবে এই জটিল দার্শনিক চিন্তার অবতারণা করেছেন তা পাঠকদের মনে একটা চিরস্থায়ী ছাপ রেখে যাবে।

কে আমি : কবির সৃষ্ট— 'আমি' মানব জীবনের উর্দ্ধে। সমস্ত মালিন্য, চাওয়া পাওয়ার আকর্ষণ থেকে মুক্ত। জীবনের বাইরে থেকেই জীবনকে উপলব্ধি করতে পারেন। জীবনের সঙ্গে জীবিকাকে আলাদা করে দেখতে পারেন। জীবন প্রবাহে হাবুডুবু খেয়ে ভেসে যেতে যেতে তাঁর এই জীবন-দর্শনের দৃষ্টি শক্তি জন্মাত না। মৃত্যুকে দেখে তিনি ভয় পান না সমস্ত প্রলোভন ও অহংকারের উর্দ্ধে। কবি কল্পনায় জীবনবিহীন অস্তিত্বের খেয়া বেয়ে দূর থেকে জীবনকে পর্যবেক্ষণ করতে প্রয়াসী। তাই তিনি প্রাণ খুলে হাসতে পারেন, ব্যথা বেদনাকে সহ্য করতে পারেন। সকল অবস্থায় তিনি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন। আমার আমিত্ববিহীন জীবনকে কল্পনায় রূপদান করেছেন। এই রকম এক জটিল অবস্থানকে ভাষায় চিত্রায়িত করে নিজেকে দার্শনিকের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন।

পেয়ালা : জীবনের গতি বড়ো বিচিত্র। জীবন প্রয়োজনে কাউকে কাছে টেনে নেয়। মনে হয় যেন ভালোবাসার টানে কাছে টেনে নেওয়া। আবার প্রয়োজন ফুরোলে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। পেয়ালায় যে পানীয় থাকে তা পান করতে গেলে পেয়ালাকে যত্ন করে কাছে টেনে নিতে হয়। মনে হয় পেয়ালাকে খুব ভালোবাসি। কিন্তু পানীয় পান করা হয়ে গেলে পেয়ালাকে ছুঁড়ে ফেলি। ভালোবাসা উবে যায়। কবি স্বল্প পরিসরে ভালোবাসার বিচিত্র রূপ, সেটা যে প্রয়োজনভিত্তিক এবং ক্ষণস্থায়ী— এটা বুঝিয়ে বাস্তববোধের পরিচয় দিয়েছেন।

উদাস : জগৎ চলছে, প্রকৃতিতে প্রাণের প্রবাহ চলছে নিয়ম মত। কিন্তু তবু যেন কেমন অগোছালো ভাব। কবি স্বপ্ন দেখতে চেয়েছেন কিন্তু তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য আধা ঘুম আধা জাগরণের অন্তরালে স্বপ্নালু ভাবের মধ্যে। উত্তরের বাতাসের কাছে প্রশ্ন করার ইচ্ছা আছে। আকাশে মেঘগুলো ভেসে যায়। কে দেখল, কে দেখল না সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। নদীর শান্ত স্রোত অবচেতন মনে একটা শিহরণ জাগায়। জীবনের

গতি, প্রকৃতিতে প্রাণের প্রবাহ যেন তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তিনি যেন এক ঘোরের মধ্যে রয়েছেন। জীবজগতে এবং প্রকৃতিতে যে উদাসীনতা সুন্দরভাবে ভাষায় এঁকে আমাদের আনন্দের সঙ্গী হয়ে উঠেছেন কবি।

আশা : রাত্রি শেষের অন্ধকার ভোরের আলোর বার্তা নিয়ে আসে। সেই আলো জীবনের প্রতীক, আশা জাগায়। সেটি মৃত্যুর সাথে লড়াই করে, সেই আশা বাঁচার শক্তি— এখানে ক্লান্তির কোনও অবকাশ নেই— নিরবিচ্ছিন্ন লড়াই। এই সংগ্রাম খুলে দেবে নতুন দিগন্ত। সেই আশায় স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে থাকা। এই সামান্য কয়েক লাইনের মধ্যে কবি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে আশা জীবনী শক্তির কাজ করে।

সময় : জীবন আনন্দ পাওয়ার জন্য যেমন, আনন্দ দেওয়ার জন্যও তেমনই। আনন্দ পাওয়া বা দেওয়ার জন্য উপযুক্ত মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। সময় অন্তহীন, মৃত্যুহীন শোক, তাপ ব্যথা বেদনার ঊর্দ্ধে। আনন্দের উপহারের জন্য সময়কেও উপযুক্ত মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। জীবনে আনন্দের ক্ষেত্রে সময়ের যে বিরাট ভূমিকা রয়েছে— সেটি কবি সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছেন।

উপলব্ধি : ব্রহ্ম থেকে তৃণ পর্যন্ত সব এই ব্রহ্মময় জগৎ। সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করলে আত্মিক সচেতনতা জন্মায় এবং তার ফলে হিংসা দ্বেষ, শত্রুতার অবসান ঘটে।

সত্যে আলোয় ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা কবি জীবনকে আহ্বান করেছেন সবার অন্তরে সবুজ সত্তা সঞ্চারিত করে যেন সমাজকে আলোকিত করতে পারে। অন্তরাত্মা জাগ্রত হলে মূঢ় গ্লানি, সংকীর্ণ সংশয় মুছে মানুষ বিবেকবান হবে। ব্রহ্মজ্ঞানের সাথে বিবেকের নির্দেশ জীবনকে উপলব্ধি করার সহায়ক হবে এবং জীবনকে পরিণত হওয়ার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। কালই জীবনের পথ পরিক্রমা শেষ করে চরম বাস্তব মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাবে।

জীবনের দার্শনিক রূপটি কবি স্তরে স্তরে কীভাবে উপলব্ধি করা যায় সেটি ভাষা নৈপুণ্যের মোড়কে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছেন।

বহ্নি বৈচিত্র্য : সর্বগ্রাসী আগুনের লেলিহান শিখা যেন পৈশাচিক আনন্দের প্রতিমূর্তি। অন্তরের আগুন শুদ্ধিকরণের কাজে নিবিষ্ট। সেই আগুনে দগ্ধ হয় অহংকার, শেষ হয়ে যায় ক্ষোভ, বিদ্বেষ, মায়া, মমতা। এই আগুন বড়ো রহস্যময়ী। তার কর্ম প্রক্রিয়ায় কোনও ছেদ নেই। আগুনের বিচিত্র রূপ ও কার্যকারিতা বর্ণনা করে কবি পাঠক মনে চিন্তার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছেন।

প্রত্যাশা : জীবনটা বিরামবিহীন দৌড়। এ যেন মরীচিকার পিছনে দৌড়। নাই, নাই শুধু নাই। কিন্তু প্রত্যাশারও শেষ নেই। প্রত্যাশা সৃষ্টি করে আবেগ। সেই আবেগের জোয়ারে আমরা ভেসে চলেছি। মৃত্যুতে তার পরিসমাপ্তি। আশার ছলনে ভুলে সারা জীবন যে দৌড় সেটি এমনভাবে কবি চিত্রিত করেছেন যে প্রশংসার দাবী রাখে।

ভালো থেকো ভালোবাসা : ভালোবাসা হৃদয়ের উপলব্ধি। দু'টি মনের আলিঙ্গন, একাত্মতাবোধ ভালোবাসার কোনও রূপ নেই। নেই কোনও স্থান কাল ভেদ। ভালোবাসা কোনও বস্তুকেন্দ্রিক নয়। ভালোবাসা একটা স্নিগ্ধ স্বপ্নিল আশা। কবির প্রার্থনা এই ভালোবাসা যা দু'টি মনের আলিঙ্গনে আবদ্ধ যা স্বপ্নিল আশায় বিভোর যেন নিষ্কলুষ থাকে। কবি নিজে যেন ভালোবাসার সাগরে ডুব দিয়ে ভালোবাসাকে চিনতে পেরেছেন— তাই কবির বর্ণনা এত প্রাণবন্ত এত প্রাঞ্জল।

আজকের সন্ধ্যাটা : বৃষ্টিঝরা গরমের সন্ধ্যায় যখন কবি ভাবছেন আড্ডাটা বেশ জমবে হঠাৎ এক বন্ধুর ফোন— কবির সাথে দেখা করার জন্য আবেদন— কবির আড্ডার সমস্ত পরিকল্পনা মুহূর্তে ভেসে গেল। জমে থাকা কত না বলা কথা বুকের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করছিল। গাড়ি থামিয়ে বন্ধুকে খুঁজে না পাওয়ার উন্মাদনা কবির মধ্যে যন্ত্রণার সৃষ্টি করছিল। তারপর দু'জনে একসাথে হাঁটা— কত কথা যেন ফুরোয় না। গাড়ি তাঁদের খুঁজছে। যেন গাড়িটা না আসাই ভালো ছিল। গাড়িতে উঠে দু'জনে দু'দিকে পাড়ি দেন। মনে হয় সময়টা বড়ো তাড়াতাড়ি চলে গেল। কবি বন্ধুর স্বপ্নে বিভোর তার ভালোবাসায় প্রশান্তি। বন্ধুর সঙ্গে মিলনের বর্ণনা দিতে দিতে কবি রোমান্টিজমের চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠে নির্মল আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে পাঠকদের মুগ্ধ করেছেন।

অভিশপ্ত অবয়ব : কবির কল্পনাবিলাসী মন অনুভব করে এক অভিশাপ নির্জন মরুভূমির ধারে গুমরে গুমরে কাঁদছে। অভিশাপের অন্ধকারে দেখলেন এক ছায়ামূর্তি। কবি অতিপ্রাকৃত (super natural) চিন্তায় আচ্ছন্ন। কবি প্রথমে ভয় পেয়েছিলেন। এই ভয়ই কবির মনকে সাহস জোগায়। তিনি মনে করেন যে এই অবয়ব কোনও ক্ষতি করতে পারে না। কারণ মানুষের মত হিংস্র নয়। এখানে কবির মনুষ্য বিদ্বেষী রূপটি ধরা পড়েছে।

ইচ্ছে : কবির ইচ্ছেটাই কিন্তু কবিতার ভরকেন্দ্র নয়। মনুষ্যত্ব মানুষ ও মানুষের মধ্যে দ্বৈত সত্তা কবিতার মূল বিষয়বস্তু। সত্য ও সুন্দর মনুষ্যত্বের ভিত্তিপ্রস্তর। মানুষ দোষ ও গুণের সমাহার। এই সংমিশ্রণই মানুষকে সজীব রাখে এবং এটাই সমাজে মানুষের বাস্তবরূপ যে সত্তার বহিরঙ্গে এক রূপ অন্তরঙ্গে অন্যরূপ সেই সত্তাই মানুষের মধ্যে পশুত্বের বিকাশ ঘটায় যার প্রকাশ দানবিক আচরণে। এই নিয়ে তৈরি হয় মানুষের ইতিহাস। কিন্তু এর সবটাই বাস্তব নয়। ঘটনার বর্ণাঢ্য সমাবেশ ইতিহাস নয়। ইতিহাস এমন হবে যেখানে উদাত্ত বাতাসের প্রবাহ আনবে পরিবর্তন, পাল্টে দেবে সমাজের রূপ। সমাজতত্ত্বের বহু জটিল বাঁক স্তরে স্তরে সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করে কবি কবিতার মধ্যে নতুনত্বের স্বাদ এনে দিয়েছেন।

সাংকেতিক সংলাপ : কবি আবেগপ্রবণ, আত্মানুসন্ধানী তাঁর চিন্তা অন্তর্মুখী। বাইরে প্রকৃতির রূপ পরিবর্তন যেন মানব জীবনের স্তর বিন্যাসের সংকেত। মধ্যাহ্নে সূর্যের প্রখর দীপ্তিতে আকাশ থাকে গনগনে। সময় এগিয়ে চলে পড়ন্ত বেলায় দীপ্তিময় সূর্যকে মনে হয়

যেন বড়ো ক্লান্ত। আকাশের বুকে রক্তরাগ ছড়িয়ে দিয়ে পশ্চিমাকাশে তার রক্তাক্ত ক্লান্ত দেহটা যেন এলিয়ে দিয়েছে। জীবন সন্ধ্যার সংকেত। কবি চিন্তা করছেন আজকের এই কর্মঠ জীবনে প্রকৃতির নিয়মে নেমে আসবে ক্লান্তি। কত স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়— বাস্তবে রূপায়িত হয় না। মন বিক্ষিপ্ত। না পাওয়ার তৃষ্ণায় কাতর হয়ে যেন স্বপ্ন মরীচিকার দিকে ছুটে যাই। জীবনের শেষপ্রান্তে মায়ের হাতের স্পর্শে কত না শান্তি। আস্তে আস্তে সমস্ত মায়া, মমতা ক্ষোভ ত্যাগ করে ধরিত্রী মায়ের কোলে আশ্রয় নিই। কবি জীবনকে প্রকৃতির সঙ্গে যেভাবে মিলিয়ে নিয়ে দর্শন করেছেন সেটি ইংরাজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের কথা মনে ক্বরিয়ে দেয়।

গভীরতা : ভালোবাসা আর ভালোলাগা ভালোবাসা চিরন্তন, তার আবেদন সুদূরপ্রসারী অন্তরের অন্তস্থলে তার ঠাঁই, কোন স্বার্থকলুষ কালিমালিপ্ত নয়। কিন্তু ভালোলাগা চিরস্থায়ী নয়। ভালোলাগার অস্তিত্ব ততক্ষণ— যতক্ষণ স্বার্থসম্পন্ন হবে। স্বার্থ মিটে গেলে ভালোলাগাও ফুটো হয়ে যাওয়া ফানুসের মতো চুপসে যায়। ভালোলাগা যায় মরে। ভালোলাগা ক্ষণস্থায়ী, অগভীর। ভালোবাসার গভীরতা মাপা যায় না, সেটি চিরস্থায়ী।

বহুরূপের অনুভূতি : কবি প্রেম ও প্রকৃতির আলোছায়ার মধ্যে অরূপের সন্ধান পান। আবার নিশুত রাতের তারার মধ্যে তাকে খোঁজেন। কখনও এই স্বপ্ন কবিকে করে উদ্ভ্রান্ত, কখনও তাঁর মধ্যে জাগায় উন্মাদনা। সর্বগ্রাসী সভ্যতার অভিশাপে দগ্ধ হয়ে যন্ত্রণা অনুভব করেন। আবার সেই যন্ত্রণাই জাগায় বাঁচার আশা। জীবন আরম্ভ হয় প্রথম আলো দেখে, জীবন শেষও সেই আলোর মধ্যে— 'আমার মুক্তি আলোয় আলোয়'। জীবনের পথ পরিক্রমায় বহুরূপ ধারণ করে চলতে চলতে জীবনের শেষে যেন সেই বহুরূপ অরূপে বিলীন হয়ে যায়। বাস্তব জীবনের বহুরূপ থেকে অরূপে উত্তরণ কবি বর্ণনা করে আধ্যাত্মিকতার পরিচয় দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য হয়ে উঠেছেন।

প্রান্তিক মুক্তি : জীবন বাস্তব অবাস্তবের শৃঙ্খলে বদ্ধ। মন থেকে মানসিকতা বিচ্ছিন্ন হলে মনে এক বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়। জীবনের পথে চলতে চলতে বিভিন্ন সময়ে যুদ্ধ করতে করতে এসে মানসিক শূন্যতায় পৌঁছে যান। প্রান্তিক শূন্যতার স্বাদ পান। কবি তাঁর ইপ্সিত প্রান্তিক মুক্তির জলে স্নান করেন। আবেগপ্রবণ কবি প্রান্তিক মুক্তির মতো একটা Abstret idea -কে যেভাবে রূপ দিয়েছেন সেটি পাঠকবৃন্দ চিরকাল মনে রাখবেন।

জলজ শ্যাওলা : ঘুমহারা নির্জন রাতে যখন একাকীত্ব ছাড়া আর কোনও সঙ্গী নেই তখন ফেলে আসা দিনের কত কথা, কত স্মৃতি মনের অন্দরে উঁকি মারে। সেই স্মৃতি জলে ভালোবাসা ভেসে বেড়ায়। শ্যাওলার মত। পানকৌড়ি ভাসমান শ্যাওলার মধ্যেই জলে ডুব দিয়ে লুকোচুরি খেলে। কিন্তু তার গায়ে জল লাগে না। আমাদের মন পানকৌড়ি ভালোবাসার তৃষ্ণায় তৃষিত হয়ে স্মৃতিজলে ডুব দেয় আবার ভেসে ওঠে। কিন্তু ভালোবাসা অধরা থেকে যায়। 'যাহা চাই তাহা পাই না।' কবির কথা ধরেই বলা যায় ভালোবাসা যেন আলেয়ার আলো যাকে ধরার জন্য যত ছুটে যাই ততই সে দূরে সরে যায়। তাকে ধরা যায় না। মধুর ভাষায় কবির ভালোবাসার এমন সুন্দর রূপায়ন মন ছুঁয়ে যায়, মর্মস্পর্শী ও হৃদয়গ্রাহী।

শরীর-অশরীর : কবি পার্থিব জীবনের পরপারে নতুন জীবনের কল্পনায় মগ্ন। পার্থিব জীবনের ওপারে যাত্রা উৎসের সন্ধানে সেখানে নতুন আলো, উদাসী বাতাস। সেখানে ঠাঁই হবে হয়তো নক্ষত্রপুঞ্জের ছায়াপথে। জীবনের সব হিসাব-নিকেশ চুকে যাবে। সেখানে বিদেহী হয়ে অশরীরে যাবে মিশে। কবি ইহলোক থেকে পরলোকে যাত্রার জন্য যে বিদায়ী পরিবেশ নিভৃত, নিঃশব্দ গোধূলি আলো দিয়ে নিপুণভাবে তৈরি করেছেন সেটি তুলনাহীন।

চিঠি (মেয়ের অনুতাপ) : আপাতদৃষ্টিতে এ তো অনুতাপ নয়। এ তো চিন্তিত বাবা মা'কে আশ্বাস, সান্ত্বনা— যেমন ছিলাম তেমন আছি। জগৎ, জীবন নিয়তই পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনশীলতাই জীবনের লক্ষণ। মেয়ের মধ্যে যে অপরিবর্তন যেন জীবনের স্রোত বন্ধ করে দিয়েছে জীবন যেন স্থবির হয়ে গিয়েছে। তাই অনুতাপ। শৈশব থেকে আজ পর্যন্ত স্মৃতি রোমন্থন, মা-বাবার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরপুর। মা-বাবার দেওয়া শিক্ষার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও আস্থা। সেই শিক্ষাই শক্তি ভোগাবে জীবন যুদ্ধ জয় করার। কবি মা-বাবার প্রতি মেয়ের কৃতজ্ঞতাবোধ ও আত্মনিবেদন এমনভাবে উপস্থাপিত করেছেন যেন কোথাও প্রচ্ছন্ন বেদনার সুর বাজতে বাজতে বিদ্রোহ ও যুদ্ধজয়ের দৃঢ় সঙ্কল্প শোনা যায়। এমন সুচারু বর্ণনা কবির কৃতিত্বের পরিচায়ক।

চিঠি-২ (মায়ের উত্তর) : মেয়ের শক্তিতে আস্থা জ্ঞাপন করে মায়ের আশীর্বাদ— জীবন যুদ্ধে হবে জয়। ধৈর্য্য ও ন্যায়ের পথ ধরে শেষ জয়ই প্রকৃত জয়। 'পথে পথে কন্টকের অভ্যর্থনা পথে পথে গুপ্ত সর্প গুঢ়ফণা নিন্দা দিবে জয়শঙ্খনাদ এই তোর রুদ্রের প্রসাদ' সমাজ তাকে স্বীকৃতি দেবে না। নিজের স্থান নিজেকেই করে নিতে হবে লড়াই করে। মা আশ্বাস দিচ্ছেন মেয়েকে যে যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হবে কিন্তু জয় সুনিশ্চিত। কবি তাঁর নিপুণ লেখনী দিয়ে মেয়েকে বিজয়িনী করে সমাজ সংস্কারের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

বিচ্ছুরণ : কবি জীবনকে বিশ্বের সীমাহীন পরিপ্রেক্ষিতে পর্যবেক্ষণ করছেন। সূর্যের আলোর বিচ্ছুরণ অনন্তকালের পথ অতিক্রম করতে করতে নানা রকম রঙ রূপ ধারণ করে। জীবনের গতিও সেই আলোর বিচ্ছুরণের মত অনন্তকালের পথ দিশাহীনভাবে পরিক্রমা করতে করতে কত ঢেউ জেগে ওঠে। আবার মিলিয়ে যায়। জীবন চলে যেন দিগভ্রান্ত পথহারা পাখির মত। তার পথ চলা অন্তহীন। চলতে চলতে একদিন অনন্তে বিলীন হয়ে যাবে জীবনের সব রঙ। কল্পনাপ্রবণ উদাসীন কবি অনন্তকালের পথে জীবনযাত্রীর যে ছবি এঁকেছেন তা মুগ্ধ বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।

নীরব কান্না : এ কান্না ধরিত্রী মায়ের কান্না, অভিমানের কান্না। এ কান্না

শোনা যায় নিস্তব্ধ রাতের অন্ধকারে। মানবের জন্য ধরিত্রীমা পৃথিবীকে নানা আভরণে সাজিয়েছেন সেই মানব আজ দানবের রূপ নিয়ে ধ্বংসের খেলায় মেতেছে। এদের মধ্যে নেই ভালোবাসা। নেই সদ্ভাব বা মিলনের আশা। তিল তিল করে গড়া অতীত ও বর্তমান সব তলিয়ে যাবে— হয়ে যাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন অতীত। কবি কিন্তু আশাবাদী। এই ধ্বংসই আনবে পরিবর্তন, জ্বলবে নতুন আলো, পাবে নতুন গতি। এই পরিবর্তনই বিবর্তনের বার্তা নিয়ে আসবে। নিয়ে আসবে শান্তি। কবি যে সুন্দরভাবে বর্তমান সভ্যতার ধ্বংসোন্মুখী-অন্ধকারের মধ্য থেকে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে শান্তিময় সভ্যতার স্বপ্ন দেখিয়েছেন সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারা যায় না।

জীবন দর্পন : ফেলে আসা দিনগুলো বারে বারে ডাকে গো আমায়। কিন্তু ফিরে যাওয়ার পথ নেই স্মৃতির বেদনা শ্রাবণের ধারার মত ঝরে ঝরে পড়ে। সম্পদ যতক্ষণ হাতের মধ্যে থাকে ততক্ষণ তার মূল্য বোঝা যায় না। হাতের বাইরে চলে গেলে বুকের মধ্যে এক চাপা যন্ত্রণাবোধ জেগে ওঠে। জমির আল দিয়ে হাঁটা পথ, বাঁশ ও খড়ের ছাউনি দেওয়া বাড়ি, অফুরন্ত চাঁদের আলো শৈশবের স্মৃতিপথে উঁকি দিয়ে মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। সেই গা ছমছম করা বাঁশগাছের জঙ্গল রাতে পেঁচার ডাক, ভূত-প্রেতের কল্পনা যে অনুভূতির সৃষ্টি করত আজ সে অতীত, বহুদূর। কালের ভাটার টানে সব দূরে সরে গিয়েছে। প্রকৃতির স্নেহচ্ছায়া ও মায়াময় পরিবেশে যেমন পুষ্ট হয়েছে তার জন্য সেই ফেলে আসা দিনগুলোর কাছে জমে আছে কত ঋণ। আজ মনে হয় শৈশবের সেই দিনগুলো যদি ফিরে পাওয়া যায় তাহলে ধারাস্নানের স্নিগ্ধতা উপভোগ করা যেত। শৈশবের হারানো দিনগুলোর জন্য কত বেদনা, কত আর্তি কবির লেখনী স্পর্শে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

গো-গোকুলনে : জীবনে বার্দ্ধক্য চরম অভিশাপ। বৃদ্ধ সংসারের কোন কাজে লাগে না। অন্যদের রাগ সেই জন্য। কবির সংবেদনশীল মন বার্দ্ধক্যের অসহায়তা এমনভাবে চিত্রায়িত করেছেন যে মনে একটা বেদনার সুর বেজে ওঠে। চুলগুলো পাকা, গায়ের চামড়া ঝুলে পড়েছে। কারুর দেখে ভয় নেই। লাঠি নিয়ে চলা সকলের সহানুভূতি আদায় করে। অন্যের এই সহানুভূতিও সমবেদনা করুণার মত মনে হয়— বড়ো ব্যথা লাগে। বার্দ্ধক্যের এই করুণ চিত্রটি কবি এমন নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন যে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জন্মায়।

চাঁদ ও চাঁদনী : এ কবিতার বর্ণনা জ্যোৎস্নার অনির্বচনীয় রূপলাবণ্য নিয়ে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাতে যখন দীঘির জলে দূর আকাশ থেকে চাঁদের প্রতিবিম্ব এত মনোরম হয় যে প্রেমের প্রতিমূর্তি রাধাও যেন জ্যোৎস্নাকে ভালোবেসে চাঁদের চোখটি দেখে। বাঁশ বাগানের আড়ে যখন চাঁদের আলো পড়ে ছোট খোকন চাঁদকে দেখতে দেখতে গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে। খোলা মাঠের পাড় যখন জ্যোৎস্নারপ্লাবনে উদ্বেলিত হয় প্রেমিক-প্রেমিকা কল্পনা করে জ্যোৎস্না যেন তাদের আপন। যাকে বেশি আপন ভাবি তাকে নিয়েই আশঙ্কা বেশি— কখন হারাই। যখন জ্যোৎস্না থাকবে না তখন সেই উদ্দীপনার হবে অবসান। কবি জ্যোৎস্নাকে Romance সঞ্চারিণী রূপে এমন সরলভাবে এঁকেছেন যে সকলের মন কাড়ে।

আমিই গামছা : ভিজে গামছায় হাত মোছা যায় না। তাই শুকনো গামছা সবার পছন্দ। এখানে বোকামির কি আছে তা বোধগম্য নয়। আর এই কবির মূল বক্তব্য কি তাও পরিষ্কার নয়। নিজেকে বুদ্ধিমান প্রমাণ করতে হলে প্রথমেই বোকার সংলাপ করতে হবে। কেন? এর সঙ্গে গামছার কি সম্পর্ক তাও বোঝা যায় না।

নিঃশব্দ তরঙ্গ : দীঘির জলে মাছগুলো অফুরন্ত প্রাণশক্তির প্রতীক। এই প্রাণশক্তি তারা পায় কোথা থেকে? তাদের চাহিদা সীমিত। তাদের চাহিদা শুধু আনন্দ। কিন্তু আমাদের মনে সীমাহীন চাহিদা। কী যে চাই সেটা আমরা জানি না। কঙ্কনার মন এবার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে স্থির। সে বুঝতে পেরেছে। জলে একটা আমড়া পড়ে নিস্তব্ধতা ভেঙে দেয়, জলে ওঠে তরঙ্গ। এই তরঙ্গই প্রাণশক্তির প্রতীক। কঙ্কনা বুঝতে পারে এমন তরঙ্গ তুলতে হবে জীবনে। সেই তরঙ্গে ভাসতে হবে, ভাসাতে হবে। সে খুঁজে পেল জীবনের অর্থ। কবি সুন্দরভাবে রূপকের সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করলেন যে জীবন মানে আনন্ত। আনন্দের তরঙ্গে ভাসতে হবে ভাসাতে হবে। তবেই জীবন সার্থক হবে। কবি নিজেই আনন্দের পূজারী। কবির জন্য রইল অভিনন্দন।

দীপিকার দর্শন : বাবা মৃত, রোগ শয্যায় মা, ভাই বোন, পাওনাদারের তাগাদা, রাতের অন্ধকারে ডুকরে কেঁদে ওঠা ছোটো ভাইটার ক্ষুধার্ত মুখ মুহূর্তে দীপিকার সমস্ত সংস্কার লজ্জা, ভয়, সংশয়ের জাল ছিন্ন করে মনে হল পূর্ণিমার চাঁদের চেয়ে আধখানা পোড়া রুটি অনেক ভালো। তাই ক্ষুধার্ত হিংস্র হায়নার মুখে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে সমস্ত সংস্কার, আশা, প্রত্যয়ের বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শাপমুক্তি ঘটাল। জীবনের গতি আনতে রাতের অন্ধকারে ছুটে গিয়েছিল। আজ সে অম্লান, সে বিজয়িনী। কবি অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে চরম দারিদ্র-পীড়িত সংসারকে বাঁচানোর জন্য দীপিকার আত্মবিসর্জন নিপুণভাবে গৌরবময় করে তাকে বিজয়িনী রূপে প্রতিষ্ঠা করে পাঠকদের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন।

অতৃপ্ত অবয়ব : কবি এই কবিতায় একটা অতিপ্রাকৃত (super natural) আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছেন। অমাবস্যার রাত। মনে অন্ধকার, বাইরেও অন্ধকার। সেই আঁধারে দাঁড়িয়ে আছে আর এক অন্ধকার। একি অবয়ব না ঘন কুয়াশা? এক ঝাঁক শকুন লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে বসে আছে। সব মিলিয়ে একটা ধোঁয়াশার সৃষ্টি করে সমস্ত আবহাওয়াকে অতিপ্রাকৃত রূপ দিয়েছেন। কবি বলছেন সেই অবয়বের দু'টি চোখে করুণ চাহনি। যেন কিছু বলতে চেয়েছিল। বলতে পারেনি। কালপুরুষের কারাগারে তার উত্তর আজও ভেসে আছে। মনে হয় যেন অতৃপ্ত আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কবি অতৃপ্ত আত্মার জন্য যেমন পরিবেশ হওয়া দরকার সেটি সুন্দরভাবে এঁকেছেন।

জীবন নামক যুদ্ধ : 'সংসার সমরাঙ্গণে যুদ্ধ করো দৃঢ়পণে ভয়ে ভীত

হয়ো না মানব' সংসারে নিরবিচ্ছিন্ন যুদ্ধ চলছে এরই নাম বেঁচে থাকা— এরই নাম জীবন। যুদ্ধ থেমে গেলেও যুদ্ধের বাতাবরণ থেকে যায়। এই যুদ্ধ কেন? অন্তরাত্মাকে প্রশ্ন করে তার উত্তর পাওয়া যায়— 'রক্ত স্নানের জন্য, ইতিহাস গড়ার জন্য, আর ভালোবাসার জন্য।' ভালোবাসার কোনও নির্দিষ্ট দিন, ক্ষণ নেই। হঠাৎ আগন্তুকের মত আসে। যুদ্ধ চলে। সেই যুদ্ধে পরাজিত হলে জোটে উপহাস। অন্তরে কান্নার রেশ, বাইরে তার কোনও প্রকাশ নেই। ব্যর্থ প্রচেষ্টা। সমস্ত প্রয়াস স্তব্ধ। ভালোবাসার জন্য যুদ্ধ ও তার পরিণতি কবি সুন্দরভাবে পরিবেশন করেছেন।

অস্পষ্ট পদক্ষেপ : অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস চপলতা বিনাশের কারণ হয়। বর্ষার জল পেয়ে ছোটো মাছেরা আনন্দে লাফালাফি করতে করতে জলাশয় থেকে অন্য জমিতে ঠিকরে পড়ে। তারপর রোদ্দুর উঠলে জমির জল শুকিয়ে যায়। ঐ মাছগুলো যায় মরে। যারা ধীর, স্থির, যারা অচঞ্চল তারাই টিকে থাকে, ঘর বাঁধে স্বাচ্ছন্দ্যে। এখানে কার পদক্ষেপ তা খুব একটা স্পষ্ট নয়। কবি হয়তো বিশ্বনিয়ন্তার পদক্ষেপ ইঙ্গিত করেছেন বিশ্বনিয়ন্তা হয়তো চপলমতিদের সরিয়ে দিে ধীর, স্থির, ধৈর্য্যশীল ব্যক্তিদের নিয়ে আনন্দময় পৃথিবী গড়তে চেয়েছেন।

নিয়ম-অনিয়ম : মানুষ সবাই সবাইকে দেখে একটা নির্দিষ্ট মাপকাঠিতে। সব নিরীক্ষণ যে ঠিক হবে এমন নয়। সবাই সবাইকে নিয়ে চিন্তা করে মনের গভীরে। নিয়মের বেড়াজাল ভেঙে পর্যবেক্ষণ থেকে বেরিয়ে আসে অন্য রূপ। কবি বিভ্রান্ত, হতাশ। মানব মনের গতিপ্রকৃতি বিচিত্র পথে বিভিন্নভাবে তুলে ধরে পাঠক মনের প্রশংসার যোগ্য হয়েছেন।

আমি ও সারসী : কবি আবেগপ্রবণ। তাঁর কল্পনা সুদূর আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত। সারসী এখানে রূপক। অন্তরের আকাশে কবি তাঁর প্রেয়সীকে খুঁজে ফেরেন। যেন অমৃতলোক থেকে পদস্খলন হয়ে তাঁর প্রেয়সী পৃথিবীতে অস্তিত্ব ফিরে পেলেন। অক্লান্ত পরিশ্রম করে সারা রাত জেগে কবি তার সন্ধান পেয়েছেন। এই কবিতায় কবি অনির্বচনীয় স্বর্গীয় প্রেমের আর্তি ও অনুভূতি যেভাবে প্রকাশ করেছেন সেটি পাঠকদের মন ছুঁয়ে যায়।

সাংকেতিক অভিপ্রায় : আকাশে বাতাসে যেন পরিবর্তনের সংকেত। ধ্বংসের মধ্য দিয়ে পুরাতনের বিদায়, সৃষ্টিকে নতুন সাজে সাজানোর ইঙ্গিত। আকাশে ক্ষয়ে যাওয়া চাঁদের করুণ মিনতি, মুক্ত বাতাসে যেন নীরব ভাষায় কিছু বলার অভিপ্রায়, সাদা ডানা মেলে হাঁসেদের উড়ে যাওয়া, ধনজন সব অবলুপ্তি যেন পৃথিবীতে এক ধ্বংসের আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে একদল বক আকাশপথে উড়ে গিয়ে মেঘেদের কাছে যেন আরো জল চায় সৃষ্টিকে নতুন সাজে সাজাবার জন্য। প্রকৃতির মধ্যে পুরাতনের বিদায় ও নতুনের আবির্ভাবের সংকেত নিপুণ চিত্রকরের মত ভাষার রঙ তুলিতে কবি যেভাবে উপস্থাপিত করেছেন কোনও প্রশংসাই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট নয়।

স্রোতের বিপরীতে : আমরা জীবনে যা চাই যখন পাই দেখি ঠিক তার উল্টো। চাঁদনী রাতে যখন পৃথিবী জ্যোৎস্নায় স্নান করে স্নিগ্ধ রূপ ধারণ করে তখন হয়তো এক রাশ স্বপ্ন জন্ম নেয় প্রতিহিংসার রূপ নিয়ে। আবার হিংসার শেষ পরিণতি ভালোবাসা। আরম্ভ যেভাবে হয় শেষটা হয় তার বিপরীত ভাবে। অনন্তকাল ধরে বয়ে চলেছে এই স্রোত। শুধু কালের গতির ও রঙের পরিবর্তন হয়। মানুষ বেঁচে থাকে কত রঙিন স্বপ্ন নিয়ে। কিন্তু জীবনের শেষে কত স্বপ্নের সমাধি ঘটে ব্যর্থতার পরিহাসে। এই কবিতায় কবির কণ্ঠে যে জীবনে স্বপ্ন সমাধি ব্যর্থতা ও হতাশার সুর ধ্বনিত হয়েছে সেটি যেমন বেদনাদায়ক তেমন মর্মস্পর্শী।

কাল্পনিক : কবির কল্পনা প্রবণ মন জীবনের নানারকম ঘাত প্রতিঘাত ও বিভ্রান্তির দোলাচলে চঞ্চল হয়ে ওঠে। দ্বিধাবিভক্ত মনের মধ্যে চলে যুদ্ধ। কল্পনাবিলাসী মন যেন উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু বলতে চায়। সময় সমুদ্রের জলরাশি এগিয়ে আসে ছোঁয়া দিয়ে চলে যায়। অন্তিম দিনের দিকে জীবন এগিয়ে চলে ধীরে ধীরে সাম্য, অসাম্যের দোলায় দোল খেতে খেতে। এই কবিতাতেও কবির মধ্যে যেন একটা হতাশার সুর বেজে উঠেছে— কিন্তু তবুও মধুর লাগে কারণ কবি আমাদের অন্তরের মধ্যে স্থান করে নিয়েছেন।

মনস্তাপ : কবি ঘন অন্ধকার রাতে নিজের সঙ্গে নিজেই কথা বলে যান। ফিরে যেতে চান অতীতের ফেলে আসা দিনগুলিতে। স্মৃতি সততই সুখের। কিন্তু 'স্মৃতি তুমি বেদনা।' 'দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না, সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি।' সেই দিনগুলি কেন যে মন চায় মনই বলতে পারে। সে আলেয়ার আলো। তাকে ধরা যাবে না। না পাওয়ার একটা বেদনা আছে। সেই বেদনাই আনন্দের উৎস। কবি স্মৃতির বেদনা এমনভাবে আমাদের কাছে উপস্থাপিত করেছেন যা খুবই মর্মস্পর্শী।

ইতিহাসের প্রতিলিপি : ইতিহাস মানুষের জীবনের পূর্ণাঙ্গ দলিল নয়। তবে ইতিহাসে সব কিছু জীবনের সব কিছু খুঁটি নাটি ঘটনা লিপিবদ্ধ হয় না। যেসব ঘটনা সমাজ বা দেশকে প্রভাবিত করে শুধু সেইটুকু লেখা হয়। সৈকত ও শামলী নোনা জলের স্রোতের ধারে পাহাড়ি ঘাসের কোলে শুয়ে রোদ পোহায় ঘাসের শিশির মেখে। বসন্তের হাসি উপভোগ করে দু'জনে। সূর্য যখন অস্তাচলে, অমাবস্যার রাতে যখন পরস্পরকে দেখতে পায় না ফিরে আসে হোটেলের বদ্ধ ঘরের চারদেওয়ালের মধ্যে। এরা জীবনযুদ্ধে হেরে যাওয়া দুই সৈনিক। এদের জীবন চারদেওয়ালের মধ্যিখানে অত্যাচার সহ্য করার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু এদের বেদনাময় জীবন কোনদিন ইতিহাসে লেখা থাকবে না। 'সংসারে যারা দুর্বল, যারা উৎপীড়িত, মানুষ যাদের চোখের জলের কোনও হিসাব নিল না, তাদের বেদনাই দিল' কবির 'মুখ খুলে, তারাই পাঠালো' কবিকে 'মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে'।

রূপ নামক অঞ্জনা : রূপ ও রূপাঞ্জনা দু'টি নাম। রূপের আছে সংসার

আর রূপাঞ্জনা। কিন্তু রূপাঞ্জনার আছে শুধু রূপ। রূপাঞ্জনা রূপে নিবেদিত প্রাণ। শিলাজ রূপের দাদা। হঠাৎ একদিন রূপের সংসারে উদয় হয়। রূপ থেকে রূপাঞ্জনাকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য অনেক মন্ত্রণা দেয়। কিন্তু তার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কিন্তু শিলাজ হাল ছাড়ে না। সে বিশ্বাস করে যে রূপাঞ্জনার আশা নিরাশা, যন্ত্রণা একদিন তাকে গ্রাস করবে। জীবনের গতিপথ বড়ো বিচিত্র— ব্যথার অতীত। রূপ আজ নেই রূপাঞ্জনার সাথে। রূপ ঘোর সংসারী। রূপাঞ্জনা ঘুরে মরছে মায়ার বন্ধনে যেন এক নেশাগ্রস্ত কুহক। কবি বোঝাতে চেয়েছেন জীবন নদীর গতিপথ বড়ো আঁকাবাঁকা এই চলার পথে কোন কূল ভেঙে কোন কূল গড়বে তার কোনও ঠিক নেই।

প্রতিশ্রুতি : জীবন বড়ো বিচিত্র। শান্তির সংসারে মাঝে মাঝে হঠাৎ ঝড় ওঠে— পদস্খলন হয়, ঘর ভেঙে যায়। সময়ই সব সমাধান করে দেয়। পারস্পরিক ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করে শুধরে নিয়ে নতুন সংকল্প মেঘ সরিয়ে চাঁদের আলোর সন্ধান দেয়। সংসার ঝলমল করে ওঠে। কবি মানসিক নমনীয়তা, পারস্পরিক অটুট বিশ্বাস উদারতা ও দৃঢ় সংকল্প যে সংসারকে বেঁধে রাখতে সক্ষম সেটি এমন নিপুণভাবে দেখিয়েছেন যে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জন্মায়।

হারানো স্মৃতি : স্মৃতি পথ বেয়ে শৈশবের সেই দিনগুলোতে ফিরে গেলে লজ্জা হয়। একটি বালক। তার আকাশের বুক থেকে চাঁদ পেড়ে আনার জন্য দৌড়ের কথা মনে পড়লে লজ্জা হয়। সেই ঝাউবন আজও আছে কিন্তু সেই কাঁচা মন, কাঁচা বয়স আজ নেই। নেই সেই রঙিন চোখ। দীর্ঘশ্বাস পড়ে। একটা চিল আকাশের বুক চিরে নেমে আসে। তার পথ ধরে হারানো স্মৃতিতে ফিরে যেতে চায় মন। কবি শৈশবের আচরণ ও স্মৃতি এমনভাবে এঁকেছেন যে সবার মন কাড়ে।

নীড়ের পাখি : পাখিরা অপরাহ্নে আপন বাসার দিকে ছোটে। মানুষও দিনের শেষে ক্লান্ত। যখন সভ্যতা ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতার অপমৃত্যু ঘটছে তখনই বুকের ব্যথায় শরীর ভেঙে পড়ে। মন তখন ছুটে যায় শরীরের দিকে। ভবিষ্যৎয়ের জন্য চিন্তা থেকেই যায়। এই কবির বক্তব্য খুব স্পষ্ট নয়।

কৃষ্ণচূড়ার ছায়া : কবি কাল্পনিক প্রেমে মশগুল। তাঁর কল্পনার প্রেয়সী রাজনন্দিনী। মনুষ্যত্বের চেয়ে সম্পদ তার কাছে অনেক দামী। কৃষ্ণচূড়ার ছায়ায় কবি তাকে ছুঁয়েছেন। বাস্তবে প্রেয়সীর সামনে কবি দাঁড়াতে চান না। কারণ, তিনি রাজনন্দিনী। বিভিন্ন পরিস্থিতে কবি তাঁকে দূর থেকে ভালোবেসে যাবেন। এই কাল্পনিক প্রেম কবিকে জীবন দান করে। তাতেই তাঁর আনন্দ। কবির সহজ সরল বর্ণনা এ কবিতার বড়ো আকর্ষণ। এ যেন এক স্বর্গীয় প্রেমের অবতারণা। কবি এর জন্য যে মনোরম স্নিগ্ধ পরিবেশ তৈরি করেছেন সেটি কবিকে এক উচ্চমার্গে পৌঁছে দিয়েছে।

কবিতার কল্পনা : কবির মন যখন সচল থাকে তখন কবিতা লেখার চেষ্টাটা থাকে না। তখন কবি তাঁর প্রেয়সীকেই চান। তাঁর প্রেয়সীকে যে চিঠি লেখেন সবাই বলে কবিতা। আবার তিনি এসে সামনে দাঁড়ালে কবির ভাবনাগুলো এলোমেলো হয়ে যায়। তিনি যখন কথা বলেন কোনও কথাই কবির কানে আসে না। কবিতার ভাব মনের অভিব্যক্তির ব্যাপার। এই রকম এক জটিল বিষয় কবি উপস্থাপিত করে পাঠকদের মনে ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করেছেন। ভাষা সহজ সরল। কিন্তু অন্তর্নিহিত ভাব এত গভীর যে পাঠককে ভাবায়।

নীরবতা : কবি চিন্ততে ও মননে অন্তর্মুখী। মনের মধ্যে ডুব দিয়ে মনটাকে বুঝতে চেয়েছেন। নিশুতি রাতে ঘন কুয়াশায় ঘেরা আকাশে তারাদের সাথে তিনি তাঁর সঙ্গিনীকে খুঁজেছেন। এখানে একটু অসঙ্গতি আছে। ঘন কুয়াশায় ঘেরা আকাশে তারারা দৃশ্যমান হয় কেমন করে? নদীর ধারে বহমান বাতাসের চঞ্চলতার মধ্যে তিনি করতালির রূপ দেখতে পান। কিন্তু সেটি নিঃশব্দ। সবই কবির কল্পনা। তিনি আশাবাদী। তিনি মনে করেন বাতাসের তরঙ্গের সাথে তাঁর বিরহ তরঙ্গ মিশে গিয়ে রক্তিম তরঙ্গের সৃষ্টি হবে। রক্তিম বর্ণ নতুন আশা, উদ্দীপনা ও সম্ভাবনার প্রতীক। কবি সেই দিনের অপেক্ষায় থাকবেন। তাঁর সমস্ত চিন্তা শব্দহীন নিস্তব্ধ পরিবেশে কেন্দ্রীভূত করে সকলের চিত্তাকর্ষণ করেছেন।

আবদ্ধ : কবি তাঁর কল্পনার পাখায় ভর করে অনেক কিছু চিন্তা করেন। কবিতার নাম 'আবদ্ধ'। কি সে আবদ্ধ? এক জায়গায় বলছেন 'আমরা সবাই বিচ্ছিন্ন হয়ে হারাবো আমাদের সম্বন্ধ' বিচ্ছিন্ন যদি হয়ে যাই, সম্বন্ধ যদি হারিয়ে ফেলি তাহলে আবদ্ধ হব কি করে? শব্দ প্রয়োগও মনে হয় হেঁয়ালীপূর্ণ। 'আকাশে যখন আকাশ থাকবে' লাইনটি বোধগম্য নয়। কথার মধ্যে absurdity এর ছোঁয়া লাগায় কবিতার বক্তব্যটি ব্যাহত হয়েছে বলে মনে হয়। কবির মনে হয়তো একটা অন্য চিত্র রয়েছে যেটি আমরা অনুধাবন করতে পারছি না। সেটি আমাদের অজ্ঞতা ও ব্যর্থতা। কবির নয়।

মানুষ খুব ছোটো হয়ে গেছে : কবির চিন্তা মানুষ ও মনুষ্যত্বের মধ্যে ফারাক নিয়ে। তাঁর বক্তব্য আমরা সবাই মানুষ হলেও মনুষ্যত্বের নিরীখে সবাই সমান নয়। মনুষ্যত্ব হল মানুষের বিশেষ গুণ চিন্তায় ও মনে যেটি মানুষকে উচ্চমার্গে প্রতিষ্ঠিত করে। কবি বেদনাবোধ করেন যে আমরা আমাদের কাজে সংলাপে ছোটো হয়ে গিয়েছি স্বার্থপরতা ও মানসিক সঙ্কীর্ণতার কারণে। আমরা ছোটো হয়ে গিয়েছি চিন্তায় ও মনে। এটি একটি সামাজিক ব্যাধি। কবি যে এই সামাজিক সমস্যা পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন সেজন্য তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ।

এই রাতে : স্মৃতি বড়োই বেদনার বড়োই করুণ। কবির প্রেয়সী আজ পৃথিবী থেকে বহু দূরে, কবির কল্পনায় ধ্রুবতারায়। কবি মনে করেন সন্ধ্যার শিশির হয়ে আজও তিনি রয়েছেন কবির স্মৃতিতে। মনে পড়ে সেই রাত যখন তাঁর প্রেয়সী আসতেন প্রদীপ জ্বালাতে। সারা বাড়িতে নিজের হাতে প্রদীপ জ্বালাতেন। নিজের হাতে পুজো করতেন। কবির আজ মনে হয় তিনি সেই রাতে দূর থেকে দেখেন তাঁরই জ্বালানো বাতি আজও জ্বলছে। কবি বলেন অকাল বোধনে তাঁর স্মৃতি চারণ

করবেন। তিনি আজও কবির স্বপ্নচারিণী হয়ে, আজও তাঁর সাথী হয়ে থাকবেন। কবি যেভাবে স্মৃতির আলোয় তাঁর প্রেয়সীকে ধরে রেখেছেন এবং সেটি এমন সুন্দরভাবে বর্ণনা দিয়েছেন যে খুবই মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে।

বিভ্রান্ত : এ কবিতায় আছে জীবন যুদ্ধে হেরে যাওয়া, মানসিকভাবে বিধ্বস্ত এক ব্যক্তির স্বীকারোক্তি যে সে বিভ্রান্ত। কী চেয়ে সে কি পেয়েছে তার হিসাব মেলেনি। রূপসী তার কাছে অধরাই থেকে গিয়েছে। নিজেই নিজেকে ধূপের মত পুড়িয়ে নিজে ব্যথা পেয়েও অন্যকে গন্ধ বিতরণ করেছে। সে বিভ্রান্ত। কবি এক হতভাগ্য ব্যক্তির করুণ কাহিনী এমনভাবে তুলে ধরেছেন যে চোখে জল আনে। এইখানেই কবির কৃতিত্ব।

কালান্তর : উন্নতি ও স্থিতিশীলতা যা সমকালীন জীবনযাত্রার সঙ্গে যুক্ত সেইটাই সভ্যতার মানদণ্ড। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে এই মানদণ্ডের ধারণারও পরিবর্তন ঘটে। আজ যা ঠিক কাল তা ভুল। নতুন যুগের জন্য সভ্যতার মানদণ্ডেরও পরিবর্তন ঘটে। জীবনকে গতিশীল করে অনন্ত সত্যের বিকাশের মাধ্যমে উন্নত সভ্যতার নতুন মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত হবে। জীবনযাত্রার উন্নতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে সভ্যতারও রূপ পরিবর্তন ঘটে। তার জন্য চাই আত্মত্যাগ। বিশ্বাসের প্রসার মুছে দেবে অবিশ্বাসের কালোছায়া। মানুষের সাহস ও বলিষ্ঠতা পুরাতনের গ্লানি, সংশয় দূর করে উন্নত সভ্যতার পথ প্রশস্ত করবে। মানুষ হবে কালজয়ী। কবি যে যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উন্নত নতুন যুগের স্বপ্ন দেখেন এবং সেই নতুন যুগে উত্তরণের পথের রূপরেখা এঁকে দেন সেজন্য তিনি শ্রদ্ধার পাত্র।

স্মৃতি ও সংস্কার : কবি প্রগতিশীল। তিনি গতিময় জীবন পথের পথিক। পুরাতন, জীর্ণ, গ্লানিময়, ক্ষয়িষ্ণু সংস্কার ও ধ্যানধারণা যা পরবর্তী প্রজন্মের অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করে যার সংকীর্ণতা অন্তরকে করে কলুষিত, তাকে বিদায় জানানোর আবেদন এই কবিতার মর্মবাণী। সূর্যের আলোয় স্নান করে শুদ্ধ হয়ে সূর্যের স্তুতি গান গেয়ে পবিত্র মনে নতুন আলোর পথের যাত্রী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন কবি। তাঁর সমগ্র মানবজাতির জন্য কল্যাণকামী চিন্তা, তাঁর মধুর ভাষা বিন্যাস কবিকে উচ্চমার্গে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

আমরা কারা ? : একটা অতৃপ্তি নিয়ে জীবনের পথে চলা। ওপর থেকে বোঝা যায় না। শতাব্দীর দূষণ সব কলুষিত করে দেয়। সামাজিকতা অস্তগামী নীরবে অশ্রু ঝরে। নতুন প্রভাতের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করে— যে প্রভাতের মূল্যবোধের পরিসমাপ্তি ভালোবাসায়। এই ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে এক যুগ থেকে অন্যযুগে আমাদের উত্তরণ ঘটছে তখন কবির মনে প্রশ্ন আমরা কারা ? দুরন্ত নদী যখন পাড় ভাঙে, তখন মাটির ভাঙা চাঙড় নদীর জলের মধ্যে গড়াতে গড়াতে অন্য রূপ নেয়। কবির মনে প্রশ্ন জাগে যে আমরা কী পরিবর্তিত যুগের সাথে পরিবর্তিত রূপ না পরিবর্তিত রূপের শেষ যুগ। কবি পুরাতনের গ্লানি থেকে মুক্তি পেয়ে নতুন আলোর স্বপ্ন দেখেন। নতুন যুগের সাথে মানুষ adjust করে নিয়ে নিজেকে যুগোপযোগী করে তুলবে এই কবির প্রত্যাশা।

যাঁরা আছে সাথে : নীচুতলার কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মকুশলতার ওপর নির্ভর করেই ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা সংবাদের শিরোনামে থাকেন। কিন্তু ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তির রূপকার যে নীচুতলার কর্মচারীরা তারা অবহেলিত, অনাদৃত হয়ে পর্দার অন্তরালে থাকে। নীচুতলার কর্মচারীদের আত্মোৎসর্গই ক্ষমতাবানদের উন্নতির সোপান। হৃদয়বান, মানবদরদী কবি ক্ষমতাবানদের উদ্দেশ্যে বলছেন এই সব কর্মচারীদের যোগ্য সম্মান দিতে। এইসব অবহেলিত মানুষদের জন্য ব্যথাতুর কবি যে উদারতা ও মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য তিনি মানুষের হৃদয়াসনে চিরকালের জন্য ঠাঁই করে নিয়েছেন।

সূর্যালোক : সূর্যাস্তের সাথে কবি যেন শক্তিহীন হয়ে পড়েন। দেহ ক্লান্ত, অবসন্ন, মন যেন নেশাগ্রস্ত। কিছু সঞ্জীবনী শক্তির আশায় কবি যেন চেয়ে থাকেন। বারো ঘণ্টা পরে সূর্যোদয় হল। জগৎ আলোয় প্লাবিত হল। কিন্তু কবির মন ভরেনি। কবির মনে এক সুপ্ত বাসনা জেগে ছিল। না পাওয়ার বেদনায় কবির সেই বাসনা আত্মগ্লানিতে পরিণত হয়। শুধু জেগে থাকে তার দুঁটি চোখ। মানুষের মন এমন জিনিস যে পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুসারে দিনের উজ্জ্বল আলো মনে হয় যে রাতের অন্ধকারের চেয়ে বেশি কালো। কবি এক মনস্তাত্ত্বিক চিন্তার দ্বার খুলে দিয়েছেন।

জীবন বিশ্লেষণ : জীবনের পথ বড়ো জটিল। কোথাও যন্ত্রণাবিদ্ধ মানুষ নিজের মুক্তির পথ দেখায় না, দেখায় প্রতিহিংসার রক্তচক্ষু। জীবনে প্রতিনিয়ত অভিনয় করে চলেছি। জীবনটা বাস্তব ঘটনার সমাবেশ। হয়তো এই বাস্তবটাই অভিনয়। দেখা যায় যারা সত্যের কথা বলে তারাই আবার অসত্যের বাণী ছড়ায়। তাদের সত্যের কথা বলাটা বাস্তব হলেও অভিনয়। স্বার্থের কারণে ভদ্র হওয়ার উপদেশ দানকারী ব্যক্তি চরম হিংস্র হয়ে ওঠে। কবির প্রার্থনা তাই আলো চাই যাতে মনের অন্ধকার দূর হয়ে যায়। কবির প্রার্থনা নতুন সূর্যের আলোর জন্য যেখানে মানুষ তার মনুষ্যত্বকে প্রকাশ করবে। ধর্ম যেখানে কুসংস্কারে আবদ্ধ থাকবে না। কবি সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে কুসংস্কার মুক্ত জীবনের প্রয়াসী। কবির উদার চিন্তাধারা, মধুর ভাষার বিন্যাস পাঠক সমাজের মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে।

অবস্থান : জীবনের গণ্ডি ছাড়িয়ে যখন ফেলে আসা জীবনের দিকে তাকানো যায় তখন যেন মন উত্তাল হয়ে ওঠে। প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রান্তরে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে উথাল পাতাল চিন্তার স্রোতে ভাসতে ভাসতে অনেক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যায়— আমাদের অবস্থান ভালোবাসার মায়াজালের মধ্যে। যিনি এই মায়াজাল ছিন্ন করে চলে গেছেন তিনি আজ অন্য জগতে। তাঁর অবস্থান সেখানকার ভালোবাসার মধ্যে। সেখানে নতুন সঙ্গী খুঁজে নেবেন। এখানের ভালোবাসা স্মৃতি হয়ে থাকবে। তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তিনি আমাদের হয়েই থাকবেন স্মৃতির জগতে। কবি জগৎকে দু'টি ভাগে ভাগ করেছেন। একটি মৃত্যু পূর্ব অন্যটি মরণোত্তর। কবি তাঁর গগন বিহারী চিন্তার দ্বারা মরণ পূর্ব ও মরণোত্তর আমাদের অবস্থান সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন।

আবদ্ধ জীবন : ভাবনার জটগুলো কিলবিল করে। ঘুম আসে না। চাহিদার শেষ নেই। অস্থির মনে অগণিত প্রশ্ন এসে ভীড় করে। প্রতিদিন ওঠে নতুন সূর্য। আবার রাত্রিও নেমে আসে। কিন্তু ঘুম আসে না। কত স্বপ্ন জন্ম নেয়। কিন্তু জীবন সেই অস্থিরতা ও অতৃপ্তিতে আবদ্ধ— এর থেকে মুক্তি নেই। কবি স্বল্প পরিসরে জীবনের সার সত্যকে যেভাবে তুলে ধরেছেন সেটি তাঁর জীবন দর্শনের গভীরতার সাক্ষ্যবহন করে।

স্বপ্নাদেশ : জীবন যেন অতৃপ্তির সমুদ্র। কেউ মনের মালিন্যকে শুদ্ধ করার জন্য পূর্ণিমার স্নিগ্ধতাকে আহ্বান করে। কেউ আবার মনের জ্বালা জুড়ানোর জন্য পূর্ণিমার স্নিগ্ধতা প্রার্থনা করে। সবই অতৃপ্তিকে কেন্দ্র করে— যে অতৃপ্তি মনের মধ্যে দাবানলের মত জ্বলতে থাকে। মনের এই দাবানলের উৎস ভালোবাসার মধ্যে যার কোনও সীমা নেই, যা পেয়েও মনে হয় পাওয়া হল না। সেই অতৃপ্তি। মানুষ স্বপ্ন দেখে। সব স্বপ্ন পূরণ হয় না। সেই অতৃপ্তি, সেই কান্না। মানুষ বেঁচে থাকে সেই স্বপ্ন, অতৃপ্তি ও কান্নাকে সঙ্গী করে। 'জীবন যেন কান্নার সরোবরে কামনার পদ্ম।' কবি সংক্ষেপে জীবনের এই মূল সত্যকে তুলে ধরে মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন সেজন্য তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ।

সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস : বয়সের বিভিন্ন স্তর থাকে। এক একটি স্তর অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে মন আরও পরিণত হয়। চোখের রঙও পাল্টায়। যৌবনে কবি সমুদ্রকে দেখেন নি। পরে যখন দেখলেন যে বিশাল জলরাশি ধরণীতে আছড়ে পড়ে সব ধুয়ে মুছে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কবি দূরে থেকেছেন তার এই সর্বগ্রাসী রূপ দেখে। কিন্তু তার নিঃসঙ্গতা কবিকে ব্যথা দিয়েছে। কিন্তু বয়সের সন্ধিক্ষণে সমুদ্রের নিঃস্বার্থ জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে কবি উপলব্ধি করেন সততা, দৃঢ়তা। কবি মন্ত্র মুগ্ধ হয়েছেন। আজ কবি শান্ত মনে সেই জলোচ্ছ্বাসকে দেখেন অন্য চোখে। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে সমুদ্রকে প্রণাম জানিয়ে বলেন সমুদ্র অনন্তেরই সমান। সময়ের অগ্রগতির সাথে যে চিন্তাভাবনার পরিণতি ঘটে এবং সত্য, সুন্দরকে দেখার দৃষ্টিশক্তি জন্মায় কবি এই কথাটি বুঝিয়ে দিয়েছেন।

রবি : অন্ধকার না থাকলে আলোর মূল্য বোঝা যায় না। সূর্যের প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায় না। সূর্যই শক্তির প্রতীক। সূর্যাস্তের পর আঁধার নামলে শঙ্খধ্বনি বেজে ওঠে মনের দুর্বলতা কাটানোর জন্য— উদ্দেশ্য সবাইকে সতর্ক ও সজাগ থাকার জন্য উৎসাহ দান। কবি এখানে সূর্যকে শক্তি ও সাহসের প্রতীক করে উপস্থাপিত করেছেন।

আশঙ্কা : তার জন্ম অজন্তায়— বিষাক্ত, দূষিত আবহাওয়ার মধ্যে। তার শরীরটাকে অশরীরি করে ফেলেছে। তার আশঙ্কা যে তার মনের মানুষকে মৃত্যুর কিনারে ঠেলে দেবে। প্রিয় জন্য সব সময় একটা দুশ্চিন্তা থাকে। এখানে কবি সেটার ওপরে জোর দিয়েছেন।

আমি রূপকথা : যা চিরসত্য, তাই চিরসুন্দর, তাই চরিজীবি, মৃত্যুঞ্জয়ী। রূপকথা বা রূপককথা। গল্পের ছলে রূপকের মোড়কে যা সত্য যা আমাদের ইপ্সিত তাকে প্রতিষ্ঠা করাই রূপকথার কাজ। এখানে আছে পাথরের গায়ে ধাক্কা মেরে লাফিয়ে লাফিয়ে চলা দুরন্ত নদী, আছে মরুভূমির শুষ্ক উত্তপ্ত আবহে অদম্য জেদ ও উদ্দীপনা, নবারুণের আলোর মধ্যে বাঁচার স্বপ্ন, চলতে চলতে হারিয়ে গিয়েও ফিরে আসা, সোনালী মেঘের স্নিগ্ধতা, পাখিদের কলরব সৃষ্টি করে এক স্বপ্নময় জগৎ যা অবাস্তব হয়েও বাস্তবের মোহে আচ্ছন্ন। নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে এ বেঁচে আছে। মৃত্যু এর কাছে পরাজিত, এ অমর। সাবলীলভাবে, নিজস্ব ভঙ্গীতে কবি রূপকথার সত্য প্রতিষ্ঠাকামী, চিরসুন্দর ও মৃত্যুঞ্জয়ী যে রূপটি নিপুণ শিল্পীর মত ভাষার রঙ তুলিতে চিত্রায়িত করেছেন তা প্রশংসার দাবী রাখে।

চুপি চুপি : আসা আবার ফিরে যাওয়া। ফিরে কোথায় যায় ? আকাশে তারাদের দলে মিশে যায় ? এ সবই কল্পনা। চলে যাওয়া বড়ো বেদনার বাণ হানে। সব গ্লানি হয়ে যায় শেষ। নিঃসঙ্গ চলে যাওয়ার মাঝে জাগে এক উন্মাদনা। মনের মধ্যে ডুব দিয়ে সেই এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উত্তরণ চিন্তা জাগায়। তবু জীবন এবং নিঃশব্দ বিদায় চিরকালের সত্য। কবি দক্ষ শিল্পীর মত ভাষার কোমল তুলির টানে আধো আলো আধো ছায়ার আবহে জীবন প্রবাহ এমনভাবে রূপদান করেছেন যে সেটা আমাদের মন কাড়ে।

তুমি আসোনি কোনোদিন : স্মৃতির সরণি বেয়ে হয়তো সে কোনও এক প্রাতের চেতনায় ভেসে আসে অনাহুতের মত। বাস্তবে তার কোনও অস্তিত্ব নেই— তার চলাফেরা অবাস্তবের আঙিনায়। সে বাস্তব জীবনে সব ধরাছোঁয়ার বাইরে। সে বড়ো অসহায়। কবি কোনও স্মৃতিসঞ্চারিণী যাকে কোনও বাস্তব জীবনে পাওয়া যাবে না তার আবির্ভাব সুন্দর ভাষার বিন্যাসে এমনভাবে এঁকেছেন যে মনে একটা ছাপ রেখে যায়।

অসহায় : 'চলেছি সরে চলাচলের পথে/কোন সারথির উধাও মনোরথে ?/নিমেষতরে যুগে যুগান্তরে/দিবে না রাশ ঢিলা।' পৃথিবী চলছে তার নিজের ছন্দে। তার মধ্যে আছে আলো আঁধারের খেলা। আছে ভাঙা গড়া, জন্ম মৃত্যু পাপ পুণ্য। সবই ঘটছে যেন এক অদৃশ্য নির্দেশে। আমরা শুধু দর্শক, নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আমাদের নেই। যাকে উন্মাদ বলে মনে হয় তার 'চিত্ত ভাবনাহীন'। পৃথিবীর শৃঙ্খলায় সেই প্রকৃত জ্ঞানী। সে নিষ্পাপ। কবি এই কবিতায় এক গভীর দার্শনিক চিন্তা ছড়িয়ে দিয়েছেন— যা মানুষকে আত্ম নিমগ্ন করে রাখে। এখানেই কবির কৃতিত্ব।

পরিকল্পনাহীন জীবন : অগোছালো, ঔদাসীন্যে ভরা জীবন চলার পথে সংঘাত ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে শেষ হয়ে যায়। তাদের কাছে 'জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন।' এই রকম অগোছালো জীবন মৃত্যুর সমান। মৃত্যু নব জীবনের উত্তরণের পথের সোপান। কবি জীবনের জটিল মুহূর্ত ও গতি বিশ্লেষণ করে পাঠকের মনে জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে চিন্তার পরিসর গড়ে দিয়েছেন।

জীবনের উৎস তো কাঁচা মাটি

বিবর দত্ত

কবি মানসকুমার ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থ 'কাঁচা মাটি' পড়ে বর্ষিয়ান গদ্যকারের আলোচিত অনুভূতি

'কাঁচা মাটি' কবি মানসকুমার ঠাকুরের গ্রন্থে প্রকাশকের বয়ান নামক আলেখটিতে নবতম প্রয়োগ ঘটেছে। প্রকাশকের ভাষ্য ছন্দতায় ব্যক্ত করা হয়েছে।

পাঠকের চোখ এই নতুন পদ্ধতি নিরিখ করে তৃপ্ত হল। সচরাচর গদ্যতেই প্রকাশককে ব্যক্ত করতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে এক লাইন গদ্য তো বেশ কিছু লাইন কবির লেখা পদ্যাংশ জুড়ে তার সংযুক্তি ঘটিয়ে কবির সৃষ্টিকে মুখরিত ও মনাকর্ষিত করেছেন।

এও এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির উন্মোচন। যা করেছেন রোহিনী নন্দন, পাঠকের কাছে সম্পূর্ণ নতুন মুন্সিয়ানা প্রকাশ করেছেন প্রকাশক এবং এই পাঠকের প্রথম প্রাপ্যও বটে।

কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতাটি মা— জননী স্বর্গাদপী গরিয়সী। কবি মানসকুমার ঠাকুর মা'কে কাব্যে ও জীবন দর্পণে উদ্ভাসিত করে পূজিত করেছেন পাঠকের মুখোমুখি তার প্রয়াস। অর্ঘ্য-নম্র শ্রদ্ধায় নিবেদিত।

পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম, পিতরি প্রতিমা পন্নে - প্রিয়ন্তে সর্ব দেবতা। কলম তুলে লিখেছেন। বাবা শিরোনামে কবিতা। পিতৃগরিমায় গৌরবান্বিত।

তৃতীয় কবিতায় কবি নিজেকে আলোচনা ও প্রেরণার উৎসে এগিয়েছেন বর্তমান কবিতায়— অনুভূতির কিরণে শব্দ ঝলসে ওঠেনি। শান্ত প্রবাহিত স্রোতের মতো বয়ে চলেছে কাব্যের শব্দরা। 'এগিয়ে যাও শরীর ও মনে— মন খারাপ করে থেমে থেকনা।' কাব্যের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কবি মানসকুমার ঠাকুর ভাবের সঙ্গে অতিশয় আবেগ উচ্ছ্বাসে ভেসে যাননি।

নারী ও পুরুষকে হেয় পতিপন্ন করতে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেন যারা তাদের বৈষম্যতা নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে আবেদন কবিতায় নারী হয়ে জন্মানো যে পুরুষের সার্বিক প্রয়োজনে আত্মদান, ত্যাগ, স্নেহ ও ভালোবাসা দান। একথা বার বার স্মরণ করতে কবি নারী পুরুষের বন্ধনকে অটুট দৃঢ়তায়— ঠিক যেন এক বৃন্তে দু'টি কুঁড়ির মতো— প্রকৃতির মাঝে প্রকাশিত হতে বলেছেন তার কবিতায়।

প্রতিটি জীবনের নির্জনতা ও নিঃসঙ্গতা মানুষকে এক অন্যভূমে নিয়ে যায় তারই সংক্ষিপ্ত উপাখ্যান অবকাশ কবিতা— সমর্থিত অনুভূতির চাতালে স্বাধীনভাবে পায়চারি করতে করতে মর্মার্থতায় জেগে সচকিত হয়ে উঠেছেন কবি মানসকুমার ঠাকুর। কবিতার নাম 'তুমি ও তোমার মাধবীলতা'। হারিয়ে ফেলা একান্ত জীবনের ও তার ছায়াকে নিয়ে কবি খানিক কল্পনা ও ভাবনায় স্মৃতি হয়ে থাকার প্রবল ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন।

আদি ও অন্তের চিরন্তন সত্যটাকে পৃথু ও দাদুর মধ্যে প্রতিফলিত করেছেন কবিতায়। যুগের পরিবর্তনে যে ব্যবধান গড়ে উঠেছে তারই নির্মাণ দীর্ঘ বর্ণিত বয়ান।

একাকী জীবন উপলব্ধির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় গড়ে উঠেছে বৃদ্ধার অনুভূতি প্রতিবিম্বিত জীবনের ও তপ্ত ব্যথা বেদনার রোমন্থনে অনুভূতিতে বহু জীবনের নিয়ত কবিতা নয় যেন আরশিতে ফুটে আছে কোনো ভগ্ন জীবন। খোয়ানো জীবনের তত্ত্বতালাশে নিমগ্ন কবি মানসকুমার ঠাকুর শিউলি কাব্যে ফিরে পাওয়া জীবনের মুখোমুখি স্মৃতির ঝোলা থেকে পুষ্পার্ঘ্য বের করে স্মৃতি চারণায় পার্থিব প্রজন্মের কাছে বলছেন, 'তুমি নিষ্পাপ কিছু গন্ধ'।

অনন্ত প্রতিক্ষীত মানুষ যেন বাতাসের সাথে প্রহর গুনে খুঁজে পায় হারানো জীবন ফের শক্তি সঞ্চয় করে হয় উন্মনা কবি মানসকুমার ঠাকুর বিজলী চমকের মধ্যে— এভাবেই খুঁজে ফেরেন তার একান্ত প্রিয়জনকে।

নদীর মধ্যে নারীকে খুঁজি— নারীর অন্তর গভীরে নদী। সেই কবির তৃষিত জীবনের অনুসন্ধান থামে না। চলতেই থাকে কাব্যের বাতাস 'তিস্তার তৃষ্ণা'।

আবর্তে গড়তে থাকে নারী পুরুষের জীবনাঙ্গন তাদের চাওয়া পাওয়ার মধ্যে কবি মানস ঠাকুর আত্মিক ভাবনায় উদ্বেল। তোমার আমার অব্যক্ত অকথিত ভাবনাগুলো যেন পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাতে লেখনি তুলে— তার সচেতনতায় ১৩ লাইনের কবিতায় মুখরিত। ভোরের আকাশ, নীরবতা, সাধ, সমুদ্রছটায় উদ্ভাসিত অবগাহিত হয়ে কবি মানস ঠাকুর পাগল বাউল প্রভৃতি কবিতাতে জীবনায়নের কাঙ্খিত দিকগুলো তুলে ধরেছেন।

প্রেরণা অনুপ্রেরণা দুরন্ত ঢেউ মনকে উতলা করে সাহসী করে তুলে কবি হৃদয়কে ভাবনা সলিলে অবগাহন করিয়ে হাতে তুলে দিয়েছেন মসী— কল্পনায় সিঞ্চিত হয়ে কবি মানসকুমার ঠাকুর লিখেছেন, পরিবর্তন ও আমার কবিতার লাইন, দু'টি কবিতা। কবি মানসকুমার ঠাকুর না চাইলেও অজ্ঞাত মানুষের কর্মকাণ্ডে প্রকৃতি তার পবিত্রতা হারায়। যা দেখে শুনে বুঝে কবি আক্ষেপ ও বেদনাহত

হয়ে কলম তুলে নেন। কাব্যমালা গাঁথতে গাঁথতে কবি ঐ হাসিক ভাবনায় মথিত— ইতিহাসের সুখ দুঃখ ঘটনা স্মৃতি ভাবনায়াত্রী কবিতাটি পাঠকের হৃদয়কে বেদনার্ত করে।

পড়ন্ত বেলার মতো জীবন সায়াহ্নে অফুরন্ত অবকাশ থাকলেও কবি মানসকুমার ঠাকুর সমগ্র জীবনকে কেন্দ্র করে ভাবনার স্রোতে খুঁজে-ফেরে জীবনের প্রতীককে। তার এই খোঁজার সঙ্গী হয়ে যান পাঠক। নির্জনতা ও নিঃসঙ্গতা যে মানুষকে অন্য ভূমে নিয়ে যায়। কাব্যে তারই উপাখ্যান মেলে 'অবকাশ' 'আবেদন' নামক দু'টি কবিতায়।

প্রাণী শ্রেষ্ঠ মানুষ সবার শীর্ষে অবস্থান করে— এ বোধ কবি মানসকুমার ঠাকুরের লব্ধিত ভান। ঈশ্বর লব্ধিত ও প্রাপ্ত এ ভানকে পাথেয় করে তিনি কাব্য লেখায় অবতীর্ন। শেষ প্রান্তে উপনীত মানুষ ভাবনার দিশা হারিয়ে ফিকে জীবনের লগ্নে কুয়াশাচ্ছন্ন হয়। শীতের সকালে সংসার উঠোনে রোদ তাপা আর সবেতেই অপূর্ণতা-অনীহা প্রকাশ পেতে পেতে সাধ কবিতায় কবি কবি মানসকুমার ঠাকুর আন্ত পরিচয়ে ভালোলাগা মানুষের বৃত্তান্ত ব্যক্ত করেছেন। দিনের আলো লাগে ভালো। যদি কথা না হয় বাসি।

সমুদ্র ছটায় উদ্ভাসিত কবি দারুণ রোমান্টিক। তোমাকে ঘিরে তার স্বপ্নীল ভাবনাগুলো যেন যৌবনদীপ্ত তেজে পরিপূর্ণ ফেনীল তরঙ্গের মতোই উত্তাল ঢেউ। পাথরের ওপর শুধু তুমি আর আমি আমাদের সঙ্গী হবে— স্নিগ্ধ চাঁদের আলো আর মাতাল বাতাস।

ভালোবাসা খোয়ানোর ভয় আছে। মৃত্যুহীন এক পাহাড় আছে। আর আছে নিঃস্বতার মধ্যে ভরপুর পাওয়ার আশা সঙ্গোপনে মন গভীরে লুকোচুরি খেলে। এক টুকরো আগুন-একটু রঙ- একটু আলো নিয়ে চলতে চান কবি চেতনা কবি মন যেন পার্থিব ভঙ্গিতে নতজানু হয়ে কবিতাকে শব্দের মালা গেঁথে কবি মানসকুমার ঠাকুর কাব্য প্রতিমার গলায় জয়ের মালা পরাতে লিখেছেন— এক টুকরো আগুন কবিতা। লিখেছেন, অবাস্তবতার আভরণ মুছে দিয়ে দেখি— আমরা সবাই কীট সম নগন্য। এই দেখার চোখ কবি মানসকুমার ঠাকুরের অন্তর গহীনে সজাগ ও উজ্জ্বল।

অন্তর্নিহিত ভাবনাকে ব্যক্ত করতে কবি তোমাতে ডুবে প্রকৃতি সুন্দরতায় সন্ধানরত গবেষক প্রকৃতির সঙ্গোপনের ইচ্ছেকে ব্যক্ত করতে কবিতায় মুখর হয়ে বলে ওঠেন, গন্ধে ভাসিয়ে দিয়ে, আমি দিলাম তোমাদের সুখ। তোমরা আমার ঋণ নিয়েছ- পারবে না দিতে শোধ...

কাব্য পিপাসু পাঠকের প্রিয় লাইন ইচ্ছে গোপন কবিতায় কবি মানসকুমার ঠাকুর নানা পঙতিতে সাজিয়েছেন, তোমাকে কাছে পেয়ে সব জ্বালা জুড়ায়— মিটে যায় অতৃপ্ত আশা- মিটে যায় দুঃখী মনের বিরহের ঋণ। আমি জাগব আবার আসব ফিরে কাঙ্ক্ষিত সেই দিন।

পথের দেখা জীবনের সঙ্গীকে কবি দীর্ঘ ভাবনায় জড়িত করেছেন। পেয়ে হারানোর ব্যথা হৃদয়কে খণ্ডিত করে বেদনার্ত করে কাব্য গুনে যাত্রী কবিতা পাঠক হৃদয়কে পুনঃ পুনঃ পাঠে চালিত করবে।

প্রতিশ্রুত কথাগুলি প্রিয়জনকে একান্তে বলে মানুষ যে পরিতৃপ্ত হয় তারই সুন্দর আবেগপূর্ণ আখ্যান কাব্যে হয়ে উঠেছে শাশ্বত চিরন্তন। এখানেই কবি মানসকুমার ঠাকুরের কাব্য সাফল্যতা। এক চিলতে রোদে পাঠক তাপিত হতে চাইবে।

অব্যক্ত গহীন গোপন কথা সে জনকে কাছে পেলে মৌনতা ছেড়ে মরমী হলে ভাষা মৌনতায় লুকোয়। চোখ তখন বিকুরীর মতো ছলকে ওঠে— একান্ত প্রিয়জনই পারে— অন্য চাহনির তাৎপর্য বুঝতে। এক্ষেত্রে কবি মানসকুমার ঠাকুরও বুঝে নিরুচ্চারণে থাকা শব্দকে উত্থিত করে কাব্যে রূপদান করে লিখেছেন, কিছু সংকেতে কিছু কথা ছিল না বলা ভাষায় কিছু তার চাহনিতে।

আত্ম সমালোচনায় মগ্ন কবি মন উদাস কবিতায় লিখেছেন, বিষাক্ত জীবাণু কুরে কুরে খায় তোমাকে আমাকে সবাইকে।

নিলীমায় নীল নীলাভ প্রকৃতির সাথে কবি মানসকুমার ঠাকুর সঞ্চারিত ভাবনার সিঞ্চনে অবগাহন করেছেন একান্ত হওয়ার জন্য আহ্বান করেছেন প্রকৃতিতে হারিয়ে যাওয়ার ইচ্ছেতে আকুল হয়ে উঠেছে কবির মন কলম।

একালের কপোত কপোতিরা প্রকৃতির মুখোমুখি জীবনকে যেভাবে দেখেন যৌবনকালে যে দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবন উপভোগ করতে চান কবি মানসকুমার ঠাকুরের কবিতায় অয়ন অদিতির মুডে এক ভিন্ন রূপ পেয়েছে। জীবন সত্যের মুখে দাঁড়িয়ে কবি ওদের মনের কথা কলমে লিখেছেন— দিয়ে গেলাম কিছু জল মাটি রেখে গেলাম আগুন ও মহাকাশ, রেখে গেলাম কিছু স্মৃতি, কিছু স্পর্শ— মহাবিশ্বে ভেসে থাকা কিছু মেঘ বাতাস। আর আমাদের পরাজয়।

পরিবেশগত পার্থক্য জীবনের রূপান্তর ঘটবে এই অমোঘ সত্যকে অকপটে স্বীকারোক্তিতে কবি মানস ঠাকুর কাব্যে স্মরণ করে পাঠককেও আগামী প্রজন্মের কাছে নতুন ইশারা বা স্বপ্ন তুলে ধরেছেন তার বৃক্ষাণু কবিতায়। মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা আবাসন— হারিয়ে যাওয়া এক্কা গাড়ি, পাল্টে ফেলেছে মোটর গাড়ি। শুনেছি জীবনের পরিবর্তন এনেছে কম্পিউটার নামক যন্ত্র। গল্পচ্ছলে অচিনের সঙ্গে ব্যক্ত করা কথাগুলোই কবিতার আকর।

অতিক্ষুদ্র ও যে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার তারই সুবিন্যস্ত আলেখ্য ঝিনুকের কল্পনা কবিতাটি— কবি ঝিনুকের কল্পনার সঙ্গে নিজের কল্পনাকে মিলিয়ে যথার্থতায় কলমে রূপ দিয়েছেন পুরুষের কাছে নারীর মনগত ইচ্ছার প্রকাশকে কাব্যে এনে ব্যক্ত করেছেন। পাঠকের এমন ভাবনা অমূলক নয়।

তুমি ঘরে সাজিয়ে রাখবে আমাকে আমার সৌন্দর্যকে প্রতিদিন তুলে নেবে, আমাকে করবে আদর। আমি তোমার পানে চেয়ে থাকব তৃষিত নয়নে সংকলিত শয়নে।

নিত্য দিনের খবরের কাগজকেও কাব্য গুণে প্রেয়সীর স্নেহডোরে ভাবনা— কবি মানসকুমার ঠাকুরের 'খবরের কাগজ' কবিতাটি নতুনভাবে গড়ে তুলেছেন কবি। পাঠকের ভেতরটা ভালোলাগায় ভরে উঠবে।

চাওয়া পাওয়ার মধ্যে এক সাধারণ মানুষ কবি মানসের পার্থক্য তা নিরাপন করা যায়— এ নিরাপন পাঠকের মননে চেতনায় ভাবনায় বিকশিত হয়ে 'মেঘ বৃষ্টি রোদ'কে সঙ্গে নিয়ে তোমাতে লীন হতে চাওয়া তোমাতে হারিয়ে যেতে চাওয়া এসব অনুভূতি ব্যক্ত করাতেই কবির সম্পূর্ণতা, সাফল্যতা। এতসব অনুভবের কাঁচা মাটিকে কবি মানসকুমার ঠাকুর পাকা পোক্ত মন্দির নির্মাণ করেছেন। কাব্য পূজারীরা তো প্রার্থনা ওই মন্দিরেই করবেন।

সামাজিক জীবনের চারপাশে সব খোয়ানো মানুষগুলোর প্রকৃত বাস্তব দৃশ্য স্বীকার করে তাদের জীবন কথা জীবন ব্যথাকে মরমী বেদনায় মূর্ত করে তুলেছেন অন্য সমাজ কবিতায়।

শিরোনাম কবিতা তেরো লাইনের লেখা বহুজন চাইতে ভিন্ন প্রকৃতির— তার দেখা পেয়ে কবি মানসকুমার ঠাকুর তাকে স্মৃতিপটে এঁকেছেন। কাব্যিক শরীরে আভরণ দিয়েছেন। তা থেকে পাঠকও নস্টালজিয়াতে পড়তে বাধ্য।

বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলা চলে কবির উন্মোচন তার আভরণের স্নিগ্ধতায় কবি উৎস খুঁজে ফেরে অশরীরী বিশ্বাসে জীবন চিনেছেন কবি মানসকুমার ঠাকুর। দীর্ঘ কবিতার শেষে লিখেছেন, 'তোমারই জন্য রাখা আছে একটুকরো অভিমান আর আছে শুধু অশরীরী বিশ্বাস।

প্রচণ্ড তাপদগ্ধ মানুষ আসন্ন বৃষ্টির সম্ভাবনায় যে আনন্দিত হয়ে থাকে। কিন্তু কবিদের জীবনে বৃষ্টি ভিন্নতর রূপ পায়। কবি মন হয় উদাস কিংবা উতলা— চেতনার ঘোলা জল সরে গিয়ে স্বচ্ছ ভাবনা আবেগ ঘিরে ধরে। কবিকে এখানে পাল তোলা নৌকোয় কবি মানসকুমার ঠাকুর শৈশবের জীবনের তরী ভাসাতে ভাসাতে পট পরিবর্তনগুলোকে কল্পনায় টেনে এনেছেন। লিখেছেন 'তোর হয়নি আমার ঘর দেখা, না হয়েছে আমার'।

রনাঙ্গণের পরিণতি ও জীবন যাপনের যে উত্তরণ তার জন্য কবি পল পল ভাবনার উৎকণ্ঠিত হয়ে লিখেছেন ওরা বোঝে না কবিতাটি।

বদলে যাওয়া পৃথিবীর মধ্যেই মানুষ তার উত্তরণ ঘটাতে চায়।

দু'টো সমমনস্ক যুবক যুবতী স্বপ্নীল ভালোবাসায় আক্রান্ত হয়ে চাওয়া পাওয়ার মধ্যে লুকোনো নিঃসঙ্গতা নির্জনতা ব্যথা রিক্ত বেদনে কান্না আনে ওদের জীবনে। বাস্তববোধের নিক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন পথ খুঁজে চলে। তারই নির্মম সত্য পরিণতি পাঠকের মনকে 'সৈকত সীমান্তে' কবিতা পুনঃ পুনঃ পাঠে টেনে নেয়। কবি মানসকুমার ঠাকুরের কলম মূর্ত হয়ে ওঠে। মনে পড়ে ভ্রমণ পিপাসু অরুণিমাকে। তাকে কেন্দ্র করে লিখতে, অরুণিমা তুমি ভারত ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে লেখনিতে আনলেও তুমি আজও অসম্পূর্ণ।

পাঁচ ছেলেমেয়ের মুখে আধপেট ভাত শেষে নুন লঙ্কা দিয়ে ভাতের ফ্যান— অরুণিমা তুমি ভ্রমণে এসব দেখনি এখনও।

কবি মানসকুমার ঠাকুরের চোখে এই সমাজের প্রকৃত বাস্তব ছবি কাব্য চিত্রপটে এত চেনা যে কবিতাটি মঞ্চে আবৃতি যোগ্যতায় অবতীর্ণ। ৮৫ লাইনের এই উজ্জ্বল সমাজ কবিতা পাঠ তো বটেই শ্রোতাগণকেও অন্য জগতে টেনে নেবে।

দ্বিধাগ্রস্ত চাঁদ না মানুষের জীবন ও বোধের অন্তর্নিহিত প্রশ্ন, কবির লেখনি যেন ক্রমশই স্মৃতি চারণে সক্রিয় মানব জীবনে রাত যে কতটা ভালোমন্দের নিরিখে জীবন চর্যায় উন্নিত হয়ে বিকশিত ভাবনায় প্রস্ফূটিত। তারই উজ্জ্বল স্বাক্ষর কবি মানসকুমার ঠাকুরের রাত্রির নীরবতা কবিতাটি।

রাত্রির নীরবতা ৮২ পাতায় প্রকাশিত কবিতাটি ভালোমন্দের নিরিখে মানব জীবনে— জীবন চর্যায় রাতকে কেন্দ্র করে কবির ভাবনা প্রস্ফূটিত সৌন্দর্যে বিকশিত। ভাবনার অন্তর্জালে জড়িয়ে না পড়ে কবি কাব্যের বিভ্রান্তি থেকে সজাগ সতর্ক তার লেখা বিরূপ— বিভ্রান্তি যেন কবি মানসকুমার ঠাকুরের স্বউৎসারিত প্রশ্নের মুখোমুখি। প্রতিফলিত দর্পণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমি, তুমি, আমরা— একক-দ্বিতীয়-তৃতীয় থেকে সর্বান্তে বলছেন, জীবন যখন জীবিকার কাছে পর্যুদস্ত জীবন হয়ে থাকে কিংকর্তব্যবিমুখ। ঠিক তখনই বিষাদের ছায়া নামে দেহে ও মনে। কালের কালান্তরে গেলেও কবি মূক থাকে না কথা কয়।

আশা আকাঙ্ক্ষায় জড়ানো জীবন তো তৃষ্ণায় আক্রান্ত কবিকে তাই লিখতে হয়েছে— তারই ইস্পিত বাসনার বাতাস বইয়ে দিতে কবি মানসকুমার ঠাকুর লিখেছেন রঙিন রৌদ্দুর— এক বড়ো আকাশ— আমার একটু জায়গা হবে না। অথবা আমায় যখন পশ্চিম আকাশে ঠেলে দিল বলল, তোমার সময় শেষ। রাগে আমার শরীরটা লাল হয়ে গিয়েছিল।

আমি বা আমরা চলে গেলেও ফিরে আসতে চাই। এ চাওয়া মানব জীবনের উদিত ইচ্ছা— যাকে অবদমন করা যায় না। ৮৬ পাতায় প্রকাশিত এই কবিতায় কবি মানসকুমার ঠাকুর স্বপ্নীল ভাবনায় রোমান্টিকতায় লিখেছেন 'আমি আবার এসেছি ফিরে'— মায়াময় নদীর তীরে, তোমার স্বপ্নে ওড়ে ওই নীলাকাশ।

আমি তুমির ভাবনার মধ্যে তোমাকে কেন্দ্র করে কবি কখনো স্মৃতি তাড়িত কখনো উন্মনা ভাবনায় জড়িত কখনো বা হারানো ব্যথায় কলমে লিখেছেন, 'তুমি যখন ক্লান্ত দুপুরে হাঁটতে হাঁটতে অজানা মন্দিরে ঢুকতে আমার জন্য, আমার মঙ্গলকামনায় নিথর মূর্তিও শুনত তোমার কথা।' এভাবে কাব্যে নিবেদন অনুভূতির কিরণে প্রজ্জ্বলিত হতে কাব্য মনেই সম্ভব। যা কবি মানসকুমারের লেখনি পরিচয় দিয়েছে।

চলমান জীবনের পথিক হয়ে কবি তৃষিত জীবনের সন্ধানী। ৮৮ পাতায় লিখেছেন, বালির সমুদ্রে এক বিন্দু জলের আশায় খুঁজেছি জীবন— পথ হারানো পথিক আমি।

তোমার মধ্যে আমাকে খুঁজি— তুমি খোঁজ রামধনু ও সাত রঙ। কবি মানসকুমার ঠাকুর তার কাব্যে খোঁজে তোমার ভূমিকা ? কাঁচা মাটির ৯০ পাতায় 'অপেক্ষা' কবিতায় কবি যখন গভীর অরণ্যে আকুল হয়ে খুঁজতে খুঁজতে তোমায় পায়— কাব্যে বলে

আমার লাজুক হাত দুটো কেমন অসাড় ছিল।
মনটা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তোমায় মাখাতে রঙ।
অথবা
রঙিন চুলে বিদ্যুতের ঝলকানি
আমাকে জাগিয়ে দিয়েছে অন্ধকার থেকে আলোতে।
কিংবা
গহন অরণ্যে দাঁড়িয়ে ডেকেছি কত তোমায়
গভীর অন্ধকার জানে আমার ব্যকুলতা।

এত অপেক্ষার পর প্রতীক্ষায় প্রহর গুণে কবি মানসকুমার ঠাকুর অনন্ত প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে তার কাব্য লিখনে মনোনিবেশ করে— জীর্ণ পাতায় জীবন্ত স্পর্শ কবিতাটিতে। লেখেনু ভালোবাসার মায়াজালে আগলে রাখা কিছু কথা— সময়ের সংকীর্তনে হারিয়ে যাওয়া কিছু ব্যথা স্মরণ করিয়ে দেয় ভবিষ্যতের ইতিহাস। এটাই কাল— কালের পরিহাস।

লিখতে লিখতে আত্মমগ্ন কবি মানসকুমার ঠাকুর আত্ম নিমগ্নতার দর্পণে নিজেকে দেখতে দেখতে লেখেন 'আমার অবস্থিত' কবিতা

শৈশব সায়াহ্নের স্মৃতিতে ভাসতে ভাসতে জীবনায়নের প্রতিটি পদক্ষেপের ভূমিকা বর্ণনা করেছেন এই ভাবে— আমার বিতৃষ্ণা প্রমাণ করে আমি জিতে গেছি হারতে হারতে। আমার প্রতীক্ষা প্রমাণ করে— আমি আমার রক্তমাংসের শরীরটাকে টেনে নিয়ে বেরোচ্ছি।

জীবনায়নের পোক্ত সাঁকোতে দাঁড়িয়ে কবি তিন দশকের পিছু ফিরে স্মৃতির বাঁশি খুললেন। যেমন পথেই জীবন পথেই মরণ আমাদের সব কিছু পথের বুকে। এভাবেই প্রথম দেখা। বেদিয়া নাম্নী কবির বিপরীত জীবনকে মুহূর্তে হারালেও তার কান্নায় কবি আক্রান্ত হল। যা তার 'আমার চোখের দেখা' কবিতাটিতে মূর্ত প্রতীক হয়ে আছে।

কাঁচা মাটি কবি মানসকুমার ঠাকুরের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থে কবির কলম ঠাকুর বাড়ির জনজীবনের গহীন গোপন ঘটনার উন্মোচন ঘটাতে কাব্যকে অবলম্বন করে লিখেছেন 'কাদম্বরীর কান্না'। ঘটনা অতীত হলেও লেখার মুন্সিয়ানায় ৯৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত দীর্ঘ ১২৯ লাইনের কাদম্বীর কান্নার সঙ্গে সঙ্গে কবির কলম কেঁপে-কেঁদে উঠেছে। বলিষ্ঠ কবির পূর্বাভাস— পূব দিগন্তে উত্থিত সূর্যদয়ের মতোই আলোকিত কবি মানসকুমার ঠাকুরকে এখনো বহু মানুষের অজানা— এই মহিয়সীর বেদনা তার কাব্যে উজ্জ্বলতায় ফুটে রয়েছে। কবিতা পাঠ শেষে মঞ্চে আবৃত্তি যোগ্য কবিতা বলে মনে হল এই পাঠকের। সুপ্তি বেদনায় সত্যের উন্মোচনে কাব্য প্রতিমাটি গড়েছেন কবি মানসকুমার ঠাকুর।

শেষ ও অন্তিম কবিতা 'রবির আত্মগ্লানি' কবিতায় বিশ্ববন্দিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিবেদিত কবি সজাগ সতর্ক প্রহরীর মতো ঘোরাফেরা করেছেন— রবি ঠাকুরের জীবনের ঘটমান ঘটনার বিশ্লেষণ নয় তার পুনরুত্থান— তবে লেখার বাঁধনে শব্দের গাথনীতে উত্তর প্রজন্মের জন্য চিরস্মরণীয় স্মৃতি সৌধ কাব্যে নির্মাণ করেছেন কবি মানসকুমার ঠাকুর।

কাঁচা মাটি কাব্যগ্রন্থটির প্রকাশক রোহিনী নন্দনকে তার সুন্দর প্রকাশনা ও সাহসী পদক্ষেপের জন্য ধন্যবাদ।

প্রাপ্তির স্থান : মানুসকুমার ঠাকুরের মানসী ও কাঁচামাটি কবিতার বই দুটি পাওয়া যাবে এই ঠিকানায় : রোহিনী নন্দন, ১৯/২ রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা - ৭০০০১২।
এছাড়া পাবেন মানসী রিসার্চ ফাউণ্ডেশনে (www.manasiresearch.org)

নাট্যমঞ্চেও অনবদ্য অভিনয়ের ছাপ ছেড়ে যান উত্তম কুমার

উত্তম কুমার শুধু চলচ্চিত্রের নায়কই ছিলেন না, নাট্যমঞ্চেও অনবদ্য অভিনয়ের ছাপ রেখেছেন। তাঁর নাটকের কথা আজকের প্রজন্মের অনেকের কাছেই অজানা। মহানায়কের প্রথম জীবনে নানা শৌখিন ও পরে পেশাদারি মঞ্চে এক সুপারহিট নাটকে অভিনয়ের কথা জানাচ্ছেন সৈকত হালদার

সাহিত্যিক নিরুপমা দেবীর 'শ্যামলী' উপন্যাসের ওপর তৈরি 'শ্যামলী' নাটকের নায়ক ছিলেন উত্তম কুমার। নায়িকা ছিলেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। এই নাটক শুধু জনপ্রিয় হয়নি, বাংলা থিয়েটারের জগতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। ১৯৫৬ সালে এই নাটকই পর্দায় নিয়ে আসেন পরিচালক অজয় কর। সেখানেও ছিলেন উত্তম কুমার। বিপরীতে কাবেরী বসু। এই চলচ্চিত্রও দর্শকদের কাছে এক বিস্ময়।

স্টার রঙ্গমঞ্চে 'শ্যামলী' নাটক অভিনয় করার পর উত্তম কুমারের নাম হয়ে যায় শ্যামল। এই নাম দেন সেসময়ের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। নাটকটি দেখে তিনি এতটাই অভিভূত হন, নাটক শেষে সাজঘরে গিয়ে উত্তম কুমারকে বলেন, এরপর থেকে তিনি উত্তমকে 'শ্যামল' বলেই ডাকবেন। নাটকে অবশ্য উত্তম কুমার অভিনীত চরিত্রের নাম ছিল অনিল। নিরুপমা দেবীর লেখা কাহিনির এই চরিত্র ছিল আধুনিকমনস্ক, সংস্কারমুক্ত এক যুবক। সে শ্যামলী নামে এক অন্ধ মেয়েকে বিয়ে করেছে। ওই চরিত্রে অভিনয় করেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। শত প্ররোচনাতেও অনিল অগ্নিসাক্ষী করা স্ত্রী শ্যামলীকে ছাড়তে রাজি নয়। এই নাটকে অনিলের মায়ের চরিত্রে অভিনয় করতেন নাট্যসম্রাজ্ঞী সরযূবালা দেবী। যাঁকে উত্তম কুমার 'সরযূ মা' বলে ডাকতেন। শোনা যায়, এই নাটক দেখার পর অনেক মহিলা দর্শক বলতেন, আমার যদি উত্তমের মতো একটা ছেলে থাকত!

'শ্যামলী' প্রথমবার মঞ্চস্থ হয় ১৯৫৩ সালের ১৫ অক্টোবর দুর্গাপুজোর সময়। তখন পুজোর সময় নতুন নাটক নামত 'বোর্ডে' মানে পেশাদার থিয়েটারে। তখনও পর্যন্ত উত্তম কুমারের হিট ছবি বলতে ২টো ছবি — বসু পরিবার ও সাড়ে চুয়াত্তর। দায়িত্ববান স্বামী আবার একইসঙ্গে নিষ্ঠাবান ছেলে— এমন এক রসায়নে ভেজা চরিত্র অনিল, যা নিঃসন্দেহে পর্দায় তাঁর 'পারিবারিক হিরো'র কেরিয়ারে বাড়তি আঁচ জোগায়। টানা ৩ বছর ধরে এই নাটকের ৪৮৪ রজনীর নায়ক ছিলেন উত্তম কুমার। যখন শো বন্ধ হয়, তখন তিনি বাংলা ছবির সুপাস্টার। ৫০০ রজনী পূর্ণ হতে তখন আর মাত্র ১৬টা শো বাকি। সপ্তাহে ৪টে করে শো হত এই নাটকের। আর একমাস শো হলে 'মাইলস্টোন' ছুঁয়ে ফেলত 'শ্যামলী'। তখনও এই সৌভাগ্য কোনো নাটকের হয়নি। অথচ এমন সময়ে কেন এই নাটক ছাড়লেন

উত্তম কুমার? ওই সময়ে বাজারে এক 'গুজব' রটে। উত্তমের সঙ্গে নায়িকা সাবিত্রীকে নিয়ে। রটেছিল পারিবারিক অশান্তির জেরে নাকি মঞ্চ ছাড়েন উত্তম কুমার। তবে এটা জানা যায়, মঞ্চে নাকি অসুস্থ হয়ে পড়েন উত্তম কুমার। একরাতে শো কোনওরকমে শেষ করেই তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। বন্ধু ডাক্তার লালমোহন মুখোপাধ্যায় পরীক্ষা করে বোঝেন উত্তমের 'প্যারাটাইফয়েড' হয়েছে। এতে শরীর এত দুর্বল হয়ে পড়ে যে উত্তমের পক্ষে মঞ্চের ধকল নেওয়া সম্ভব হয়নি। ফলে 'শ্যামলী'র অনিল বদলায়। উত্তম কুমারের জায়গায় আসেন নবকুমার। এই নবকুমার ছিলেন মঞ্চের নামি অভিনেতা নির্মলেন্দু লাহিড়ির ছেলে। কিন্তু নাটকের দর্শকরা ওই চরিত্রে উত্তম ছাড়া কাউকে মেনে নিতে চাননি। ফলে, টিকিট বিক্রি কমে যায়। তা শুনে 'স্টার থিয়েটার'এর প্রতি মমত্ববশত উত্তম কুমার এই নাটকে ফিরে আসেন। তবে তা সামান্য দিনের জন্য।

স্টার থিয়েটারে উত্তম কুমারের অভিনয় নিয়ে ২টো কাহিনি শোনা যায়। প্রথমত, অ্যামেচার (শৌখিন) থিয়েটারের ব্যাপারে বিরক্তির কথা একবার জহর গাঙ্গুলিকে বলেন। এই জহর গাঙ্গুলি উত্তমকুমারের আগে বাংলা নাটক ও চলচ্চিত্রের বিশিষ্ট নায়ক ছিলেন। তিনি শিল্পমহলে সুলালবাবু নামে পরিচিত ছিলেন। তখন তাঁরা বিখ্যাত নাটক থেকে তৈরি চিত্রনাট্য 'মানময়ী গার্লস স্কুল'এর শুটিং করছেন। জহর তখন উত্তম কুমারকে পরামর্শ দেন, বাণিজ্যিক থিয়েটারে যোগ দিতে। বলেন, এখানে একেবারে সরাসরি দর্শকের হাটে অভিনেতা নিজের অভিনয় ক্ষমতা ও জনপ্রিয়তার পরিমাপ করে নিতে পারেন। স্টার কর্তৃপক্ষকে তিনি উত্তম কুমারের কথা বলেন। দ্বিতীয়ত, উত্তম কুমারকে স্টারে আনার ক্ষেত্রে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের এক ভূমিকা ছিল। ছবি বিশ্বাস তখন স্টার ছেড়ে মিনার্ভা থিয়েটারে যোগ দেন। এই দুই থিয়েটারের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। ছবি বিশ্বাস তখন মিনার্ভায় ঝিন্দের বন্দি করছেন। নিজেকে প্রধান দ্বৈত চরিত্রে আর উত্তম কুমারকে ময়ূরবাহনের চরিত্রে ভাবেন। এই পরিকল্পনার কথা জানতে পেরে স্টার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে 'শ্যামলী' নাটকে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় উত্তম কুমারকে আনার ব্যবস্থা করে দেন। 'শ্যামলী' নাটকে অভিনয় করতেন উত্তমের এক সময়ের অভিনয় শিক্ষক সন্তোষ সিংহও। পরিচালক ছিলেন দেবনারায়ণ গুপ্ত। যিনি এর আগে উত্তমের স্ট্রাগলিং পিরিয়ডে সিনেমার সেটে তাঁকে দেখে মন্তব্য করেন, দুর্গাদাসের পরে বাঙালি নতুন নায়ক পেতে চলেছে। রঙমহলের সফল নাট্যপরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্ত সেই প্রথম স্টারে আসেন। তাঁর সামনে ছিল নতুন চ্যালেঞ্জ। আর অনেক খরচ করে সেই প্রথম মঞ্চে 'রিভলভিং ডিস্ক' (ঘুরন্ত মঞ্চ) লাগান স্টার থিয়েটারের মালিক সলিল মিত্র। তাই তখন স্টারের নাটকের বুকলেটের প্রচ্ছদে থাকত ১টা ঘুরন্ত বৃত্তের ছবি। ফলে খরচ তোলাও স্টার থিয়েটারের মালিকের সামনে এক চ্যালেঞ্জ ছিল। তবে সব চ্যালেঞ্জ উতরে দেন উত্তম কুমার।

উত্তম কুমারের 'শ্যামলী' শুধু তাঁর বাণিজ্যিক মঞ্চে অভিষেক ঘটায়নি, ঘটায় আরো দু'জনের। তাঁরা হলেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। অনেকেই জানেন না, এই তিনজন এর আগে এক শৌখিন নাট্যদলে একসঙ্গে নাটক করেছেন। ওই দলের নাম ছিল 'কৃষ্টি ও সৃষ্টি'। দলের মহলাঘর ছিল হাতিবাগানে দর্পণা সিনেমার পাশের গলিতে। বন্ধু শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৌলতে উত্তম কুমারের ওই দলে আসা। দলের আগে নাম ছিল 'হুজুগে সঙঘ'। পরে নাম হয় 'কৃষ্টি ও সৃষ্টি'। ওই দলে ভানু চট্টোপাধ্যায় (বন্দ্যোপাধ্যায় নয়) নামে এক পরিচালকের 'আজকাল' নাটকে উত্তম আর সাবিত্রী একসঙ্গে প্রথম নাটক করেন। সাবিত্রী তখন 'উত্তর সারথী' নামে এক দলের প্রযোজনায় 'নতুন ইহুদি' নাটকে অভিনয় করতেন। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে এই নাটক করার পাশাপাশি সাবিত্রীকে প্রথম এই নাটকেই অভিনয় করান। ভানু একদিন বন্ধু উত্তমকে নিয়ে আসেন স্টেজ রিহার্সাল দেখাতে। তখন অরুণ চট্টোপাধ্যায় উত্তম কুমার হননি। সাবিত্রীর অভিনয় তাঁকে মুগ্ধ করে। সাবিত্রীর বাবার সঙ্গে কথা বলেন মেয়েকে দলে পাওয়ার জন্য। বাবা বলেন, মেয়েকে মহলায় নিয়ে যেতে হবে ও কাউকে পৌঁছে দিতে হবে। স্বয়ং উত্তম ওরফে অরুণ সেই দায়িত্ব নেন। এই দলেই এরপর সাবিত্রী-উত্তম একসঙ্গে করেন 'কঙ্কাবতীর ঘাট'। এই নাটকে অভিনয় করেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ও। এছাড়াও অভিনয় করেন 'কানাগলি'তে। এই নাটকের শেষ দৃশ্যে এত তন্ময় হয়ে অভিনয় করতেন উত্তম, শোনা যায় মাঝে মাঝে জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন। ফলে, 'শ্যামলী' নাটকে উত্তম-সাবিত্রীর সাফল্য ছিল আসলে অবাণিজ্যিক থিয়েটারের অবদান।

উত্তম-সাবিত্রী আরেকবার শৌখিন নাটকে একসঙ্গে অভিনয় করেন। আর সে নাটক ছিল 'শ্যামলী'। এ নাটক করা নিয়ে স্টার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে উত্তমের সম্পর্ক ভাঙে আর কী! আসলে শ্যামলী তখন শততম রজনী পার করতে চলেছে। উত্তম কুমারের পাড়ার দল ছিল লুনার ক্লাব। এখানেই তাঁর নাটকে অভিনয়ের হাতেখড়ি। উত্তম পুরোনো নাটক দেখতেন, বয়স্কদের সঙ্গে অভিনয় করতেন, কিন্তু পুরোনো থিয়েটারের ধরাবাঁধা ছক, লম্ফঝম্প আর কৃত্রিম স্বরক্ষেপণে অভিনয় তাঁর পছন্দ ছিল না। চাইতেন স্বাভাবিক অভিনয়। যার ছবি আমরা দেখতে পাই সত্যজিৎ রায়ের 'নায়ক' ছবিতে। আর তাই সমবয়সি বন্ধুদের নিয়ে 'লুনার ক্লাব' গড়া। এখানে 'সাজাহান' নাটকে উত্তম হন দিলদার, কর্ণার্জুন নাটকে শ্রীকৃষ্ণ আর দুই পুরুষে সুশোভন। লুনার ক্লাবের সে বছর সিলভার জুবিলি। উত্তম ঠিক করেন 'শ্যামলী' নাটক করবেন। সাবিত্রী ও উত্তম প্রধান ২ ভূমিকায় আর থাকবেন তাঁর বন্ধুরা। কথাটা জানতে পেরে স্টার থিয়েটারের মালিক সলিল মিত্র নাটকের দুই পরিচালক শিশির মল্লিক আর যামিনী মল্লিককে লুনার ক্লাবে এই নাটক না করার অনুরোধ করেন। কিন্তু উত্তম বলেন, ক্লাবে এই নাটক করতে না দিলে তিনি স্টার থিয়েটার ছেড়ে দেবেন। সরযূবালা আর টেকনিশিয়ানরা উত্তমের পাশে দাঁড়ান। শেষে লুনার ক্লাবে 'শ্যামলী' নাটক হয়।

১৯৬৮ সালে দেবনারায়ণ গুপ্তকে ফোন করে উত্তম আরেকবার স্টারে ফিরে আসতে বলেন। বলেন, একটা নাটক লিখতে যাতে তাঁর চার-পাঁচবার এন্ট্রি থাকবে। তবে সে নাটক হয়নি। উত্তম নাট্যতৃষ্ণা মেটান তাঁর হাতে তৈরি 'শিল্পী সংসদ'এর মাধ্যমে। প্রতি বছর নাটক হত এই ব্যানারে। ১৯৭২ সালে বঙ্গরঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ পূর্তিতে শিল্পী সংসদ বিশ্বরূপা মঞ্চে ৩টে নাটক করে। এই ৩টে নাটক — চারণকবি মুকুন্দ দাস, সাজাহান ও চরিত্রহীন। তিনটেরই পরিচালনায় ছিলেন উত্তম কুমার। যতদূর জানা যায়, আলিবাবা নাটকে অভিনয় করেন উত্তম। এ নাটকে জয়শ্রী সেন ছিলেন মর্জিনা আর বাবা মুস্তাফার ভূমিকায় ছিলেন উত্তম কুমার নিজে। যা দেখে চমকে যান দর্শকরা। ওই অভিনয় হয় রবীন্দ্রসদনে।

মৃত্যুর ৭৯ বছর পরেও অভিনেতা দুর্গাদাসকে নিয়ে কাজ চলছে

বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও পর্দার আদিযুগের কিংবদন্তি অভিনেতা দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় অভিনেতার জন্মভিটেয় তাঁর স্মৃতি রক্ষায় ৭৭ বছর ধরে কাজ করে চলেছে দুর্গাদাস স্মৃতি সঙ্ঘ।

গত শতকের প্রায় অর্ধেক সময় জুড়ে বাংলার মঞ্চ দাপিয়ে বেরিয়েছেন নায়ক দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। রঙ্গমঞ্চের মহাতারকা দুর্গাদাস বাংলা চলচ্চিত্র জগতেরও প্রথম যথার্থ 'স্টার'। একইসঙ্গে পর্দা ও মঞ্চে সমানতালে কাজ করে এক অনন্য নজির তৈরি করেন।

১৮৯৩ সালের ৩ ডিসেম্বর আজকের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুর ব্লকের সোনারপুর (দক্ষিণ) বিধানসভা কেন্দ্রের সাউথ গড়িয়া গ্রামের এক বর্ধিষ্ণু জমিদার বংশে জন্ম দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বাবা তারকনাথ ছিলেন রাশভারী জমিদার। দুর্গাদাসের ছোটোবেলা থেকে শখ ছিল অভিনয় ও আঁকার। দোল-দুর্গোৎসবে অপেরা দলের যাত্রা দেখে তিনি দলও খুলে ফেলেন গোপনে। কিছুদিন পরে ডায়মন্ড নামে আরেকটি দল খোলেন। সাউথ গড়িয়ার স্কুলের পাট চুকিয়ে দুর্গাদাস প্রথমে বউবাজার আর্ট স্কুলে ও পরে সরকারি আর্ট কলেজে আঁকার পাঠ নেন। আর্ট কলেজের ডিগ্রি পাওয়ার পর কাজ পান ম্যাডান থিয়েটার কোম্পানির নির্বাক ছায়াচিত্রের বর্ণলিপিকার হিসাবে। পরের বছর শিশির ভাদুড়ি, নরেশচন্দ্র মিত্র ও আরও ক'জন শিল্পী মিলে গড়ে তোলেন তাজমহল ফিল্ম কোম্পানি। দুর্গাদাস সেখানে কাজে যোগ দেন টাইটল রাইটার হিসাবে। তাঁর মনে আশা ছিল, যদি কখনো ছবি আঁকতে আঁকতে অভিনয়ের সুযোগ মেলে। শেষে সুযোগ হয় নির্বাক ছবি 'আঁধারে আলো'য় এক্সট্রা হিসাবে। এরপরই নরেশচন্দ্র মিত্রের 'চন্দ্রনাথ' ছবিতে নায়কের চরিত্রে অভিনয় করে তিনি সবার নজর কাড়েন। ১০ রিলের এই ছবি থেকে দুর্গাদাস দর্শকদের কাছে হয়ে ওঠেন শ্রদ্ধার 'দুগ্গাবাবু'। একে-একে দুর্গাদাস প্রায় ১৯টা নির্বাক ছবিতে অভিনয় করেন। তাঁর অভিনীত ছবির মধ্যে রয়েছে — জেলের মেয়ে, মিশর রানি, ধর্মপত্নী, কৃষ্ণকান্তের উইল, সরলা, রজনী, ইন্দিরা, রাধারানি, দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতি। ১৯২৭ সালে দুর্গেশনন্দিনী ছবিটা ইউরোপে দেখানোর পর তাঁকে অভিনেতা ডগলাস ফেয়ার ব্যাঙ্কস'এর সঙ্গে তুলনা করা হয়। ১৯৩২ সালের এপ্রিল মাসে তাঁর শেষ নির্বাক ছবি ভাগ্যলক্ষ্মী মুক্তি পায় চিত্রা (পরে মিত্রা) হলে। সহশিল্পী ছিলেন প্রমথেশ বড়ুয়া ও সবিতা দেবী। নির্বাকের পাশাপাশি সবাক ছবিতেও তিনি জনপ্রিয়তার শীর্ষে ওঠেন। এখানে তাঁর বিখ্যাত ছবির মধ্যে রয়েছে — দেনাপাওনা, পুনর্জন্ম, চিরকুমার সভা, চণ্ডীদাস, দেশের মাটি প্রভৃতি। তাঁর শেষ হিট সিনেমা প্রিয় বান্ধবী। ছায়াছবির জগতে অভিনয় করলেও রঙ্গমঞ্চ ছিল তাঁর প্রিয় জায়গা। দুর্গাদাস বলতেন, 'মঞ্চকে আমি ভালোবাসি। মঞ্চের বৈদ্যুতিক আলোর সামনে দাঁড়িয়ে যখন আমার চোখের সামনে অসংখ্য কালো কালো মাথা দেখতে পাই, তখন আমাদের দেহের সব শিরা-উপশিরা আনন্দে তাথৈ তাথৈ করে নেচে ওঠে। কিন্তু এ আনন্দ পর্দায় অভিনয় করে আমি কোনোদিন পাইনি বা পেতে পারি না।'

আর্ট থিয়েটারের প্রযোজনায় কর্ণার্জুন নাটকের বিকর্ণের চরিত্রে অভিনয় দিয়ে তাঁর রঙ্গমঞ্চের পেশাদার অভিনয় শুরু হয়। এই নাটকে কর্ণের ভূমিকায় ছিলেন তিনকড়ি চক্রবর্তী ও অর্জুনের ভূমিকায় ছিলেন অহিন্দ্র চৌধুরী স্বয়ং। অহিন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে দুর্গাদাসের আলাপ এই আর্ট থিয়েটারেই। ১৯২৩ সালের অক্টোবরে মঞ্চস্থ হয় 'চন্দ্রগুপ্ত'। এখানে চন্দ্রগুপ্তের ভূমিকায় অভিনয় করে দুর্গাদাসের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। পরের বছর 'ইরানের রানি' নাটকেও সেই জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁর অভিনীত সব জনপ্রিয় নাটকের মধ্যে রয়েছে—প্রফুল্ল, শাহজাহান, মেবার পতন, আলমগীর, চিরকুমার সভা, মহুয়া প্রভৃতি। কলকাতার সিনেমা ও মঞ্চে অভিনয় করলেও দুর্গাদাসের

সঙ্গে তাঁর জন্মভিটের সম্পর্ক ছিল অটুট। মাত্র ৪৯ বছর বয়সে ১৯৪৩ সালের ৩ জুন তাঁর মৃত্যু হয়।

তাঁর জন্মভিটে সাউথ গড়িয়ায় দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় দুর্গাদাস স্মৃতি সঙ্ঘ। উদ্যোক্তা ছিলেন সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়, প্রমথ নাথ চট্টোপাধ্যায়, বিজয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায়, দাশরথী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখরা। সংস্থার কার্যনির্বাহী সভাপতি পবিত্র চট্টোপাধ্যায় জানান, '৭৭ বছর ধরে আমরা কিংবদন্তি অভিনেতা দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতি রক্ষায় নানা ধরনের কাজ করে চলেছি। তার মধ্যে রয়েছে, নাট্যচর্চা, নাট্য প্রযোজনা, নাট্য কর্মশালা, দুর্গাদাস নাট্যোৎসব, নাট্যসম্মান দান প্রভৃতি। দুর্গাদাস স্মৃতি সংঘের প্রযোজনায় একশোটির বেশি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে।' একসময় দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনীত 'চিরকুমার সভা' নাটক সংঘের সদস্যরা নতুন করে প্রযোজনা করেন। সংঘের সাম্প্রতিক প্রযোজনার মধ্যে রয়েছে — অপরাজিতা, মৃত্যুঞ্জয়, অদৃশান, বিশ্বাস করি না, ধ্রুবপদ, বিধাতা পুরুষ, সন্ধ্যাতারা, মুকুট, সত্যর ইচ্ছা, পূর্ব জন্মের ভাই, খেলা ঘর, ইচ্ছেডানা।

প্রতিবছর ডিসেম্বরের শেষে দুর্গাদাস স্মৃতিসংঘের উদ্যোগে ৩-৪ দিনের দুর্গাদাস নাট্যোৎসব হয়। এই উৎসবে জেলার পাশাপাশি কলকাতার নামি নাটকের দলগুলোও অংশ নেয়। প্রতিবছর নাট্যব্যক্তিত্বদের 'দুর্গাদাস স্মৃতি সম্মান' দেওয়া হয়। সম্মান দেওয়া হয়েছে বিভাস চক্রবর্তী, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অরুণ মুখোপাধ্যায়, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক মুখোপাধ্যায়, চিত্রা সেন, গীতা দে, অসিত বসু, পঙ্কজ মুন্সি প্রমুখকেও। নাটকের নেপথ্য শিল্পীদেরও সম্মান জানানো হয়। সঙ্ঘের উদ্যোগে ২০১৭ সালে নাট্য গবেষক কমল সাহার সম্পাদনায় বিশিষ্টদের লেখা 'নায়ক দুর্গাদাস' নামে দুশো পাতার এক সংকলন বেরোয়। দুর্গাদাস স্মৃতি সঙ্ঘের নাট্যদলে এখন প্রায় ৪০জন সদস্য রয়েছেন। বড়োদের পাশাপাশি রয়েছে ছোটোদেরও ইউনিট। এইসব ক্ষুদে সদস্যদের নিয়ে কর্মশালাভিত্তিক নাটক হয়। যেমন করা হয়েছে খেলাঘর নাটক। সঙ্ঘের কার্যনির্বাহী সভাপতি পবিত্র চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, 'আমাদের মূল উদ্দেশ্য নতুন প্রজন্মকে কিংবদন্তি অভিনেতা দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে জানানো ও তাঁদের নাট্যমুখী করে গড়ে তোলা। আমরা দর্শকদের সবসময় ভালো নাটক উপহার দিতে চাই। যেখানে একদিকে থাকবে বিনোদন ও অন্যদিকে, থাকবে সামাজিক সচেতনতার বার্তা।'

পুতুলনাটক আর সাধারণ নাটকের মধ্যে মেলবন্ধন করছি : সুদীপ্ত

ডলস থিয়েটারের কর্ণধার সুদীপ্ত গুপ্ত। প্রায় ৩ দশক ধরে একজন বিশিষ্ট পাপেটারিয়ান হিসেবে তিনি কাজ করে চলেছেন। সেইসঙ্গে দর্শকদের মনে স্থায়ী জায়গাও করে নিয়েছেন। কাজের স্বীকৃতি হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকারের সংগীত নাট্য আকাদেমি পুরস্কারও অর্জন করেছেন। তাঁর এই জনপ্রিয়তা ও কাজ নিয়ে কথা বললেন মোহিনী সেনগুপ্তের সঙ্গে।

প্রশ্ন : পুতুলনাচ নাকি পুতুলনাটক — কোনটা ঠিক?

সুদীপ্ত : পুতুল তো নাচে না। কৃত্রিমভাবে পুতুলকে নাচানো হয়। কৃত্রিমভাবে পুতুলের এই নাড়াচাড়া, কথা বলা— এসবেরই পোশাকি নাম পাপেট্রি। চলতি কথায়, এটা পুতুলনাচ নামে পরিচিত। যাঁরা পুতুল তৈরি করেন আর নাটক প্রযোজনা করেন, তাঁদের বলা হয় পাপেটারিয়ান। যদিও সারা বিশ্বে এখন বলা হয় পাপেট আর্টিস্ট।

প্রশ্ন : আমাদের দেশে এই শিল্পের শুরু কবে?

সুদীপ্ত : সারা বিশ্বে জনপ্রিয়তা পাওয়া পাপেটের পথ চলা শুরু হয় আমাদের দেশে। তবে কবে থেকে শুরু হয়েছে, তা বলা মুশকিল। সঠিক সময়ের স্বীকৃত কোনও তথ্য নেই। কারোর মতে, এই লোকসংস্কৃতির বয়স সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি দিনের। ইতিহাস অনুযায়ী, আনুমানিক ১৬০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে পুতুলনাচ শুরু হয় ছায়াপুতুল দিয়ে। পতঞ্জলির লেখাতে 'পুতুলবাজি' শব্দটা পাওয়া যায়। তিনি তাঁর লেখায় সম্ভবত শ্যাডো বা ছায়াপুতুলের কথা বুঝিয়েছিলেন। ধীরে ধীরে ভারতীয় সংস্কৃতিতে এটা ছড়িয়ে পড়ে, এরপর দেশের বাইরেও চলে যায়।

প্রশ্ন : কত ধরনের পুতুল নিয়ে কাজ হয়?

সুদীপ্ত : পাপেট্রি দু'ধরনের। ট্র্যাডিশনাল আর কনটেম্পোরারি। অর্থাৎ প্রথমটা পুরোনো দিনের ঐতিহ্যময় পুতুলনাচ বা নাটক ও আরেকটা হল সমসাময়িক। ট্র্যাডিশনাল পাপেট্রির মধ্যে রয়েছে— বেণী পুতুল, সুতো পুতুল, ডাং পুতুল আর শ্যাডো বা ছায়া পুতুল। এ রাজ্যে প্রথম তিন ধরনের পাপেট্রি দেখা যায়। তবে শ্যাডো পুতুলের তেমন চল নেই। মেদিনীপুর, বর্ধমান, নদিয়া আর দুই ২৪ পরগনা জেলার নানা গ্রামের লোকরা এখনো ট্র্যাডিশনাল পুতুল তৈরি করা আর পুতুলনাটক বা নাচের কাজে জড়িত। এখনো সারা রাজ্যে কয়েক হাজার লোকের এটাই জীবিকা।

প্রশ্ন : বাংলায় কনটেম্পোরারি পাপেট্রি'র সূত্রপাত কি প্রবাদপ্রতিম শিল্পী সুরেশ দত্তের হাত ধরে?

সুদীপ্ত : না, প্রথম এই কাজ শুরু করেন রঘুনাথ গোস্বামী। তবে পাপেট্রিকে বাণিজ্যিকভাবে দর্শকদের সামনে নিয়ে আসেন সুরেশ দত্ত। ভারত থেকে গত শতকের ছয়ের দশকে চারজন শিল্পীকে রাশিয়ায় পাঠানো হয়। ওই দেশে গিয়ে সুরেশ দত্ত আধুনিক পুতুলনাটক দেখেন আর সাতের দশকে বিষয়টা পাবলিক স্টেজে আনেন। পুতুলনাটকের মাধ্যমে সমসাময়িক বিষয়কে তুলে এনে দর্শকদের বিপুল প্রশংসা আর সমাদার পান। পরে নিজেই প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠেন।

প্রশ্ন : আপনিও তাঁর ছাত্র ছিলেন?

সুদীপ্ত : হ্যাঁ, আগে আমি মূল ধারার নাটক করতাম। পরে পুতুলনাটকের জগতে আসি। ১৯৮৩ সালে সুরেশ দত্তর অধীনে প্রশিক্ষণ নেওয়া শুরু করি ও টানা ৭ বছর তাঁর কাছে কাজ শিখি।

প্রশ্ন : আপনি নিজে কবে দল গড়লেন?

সুদীপ্ত : স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্য ১৯৯০ সালে ডলস থিয়েটার তৈরি করি।

প্রশ্ন : কাজের জন্য জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন?

সুদীপ্ত : হ্যাঁ, কাজের স্বীকৃতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সংগীত নাট্য আকাদেমির পুরস্কার পেয়েছি।

প্রশ্ন : পাপেট্রি নিয়ে কোন কোন দেশে গিয়েছেন?

সুদীপ্ত : ইরান, ইজরায়েল, বুলগেরিয়া, রাশিয়া আর বাংলাদেশ সফরে গেছি।

প্রশ্ন : বিদেশে পাপেট্রির চর্চা কেমন হয়?

সুদীপ্ত : বিদেশে পুতুলশিল্পীরা খুব সমাদরের সঙ্গে কাজ করেন। ইরানে গিয়ে দেখেছি পাপেট্রির প্রশিক্ষণের জন্য ওদেশে আমাদের 'ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা'র মতো কেন্দ্র রয়েছে। রাশিয়ায় রয়েছে নিজস্ব আকাদেমি। ব্লকে ব্লকে কাজ হয় আর ছেলেমেয়েরা সেখানে কাজ করে। আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কাজ হয়। নিরন্তর গবেষণা চলছে পাপেট্রি নিয়ে।

প্রশ্ন : আর এ রাজ্যে?

সুদীপ্ত : এ রাজ্যের ঐতিহ্যময় লোকশিল্প হলেও পুতুলনাটক বা নাচের শিল্পীরা চরম অবহেলিত। অতিমারির প্রকোপে তাঁরা আরও সংকটে পড়েছেন। গ্রামের শিল্পীদের কাজের মূল জায়গা ছিল নানা মেলা আর স্থানীয় মঞ্চ। পুতুলনাটক প্রশিক্ষণের জন্য আলাদা কোনো প্রতিষ্ঠান নেই। নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা আর এগিয়ে আসছেন না।

প্রশ্ন : রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান?

সুদীপ্ত : হ্যাঁ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটকের ডিজাইনিং বিষয়ে পুতুলনাটক অর্থাৎ পুতুলনাচের একটা অংশ রয়েছে। ওই বিষয়ে পড়াই।

প্রশ্ন : পুতুলনাটকের শিল্পীদের নিয়ে তো একটা মঞ্চ তৈরি করেছেন। তার খবর কী?

সুদীপ্ত : হ্যাঁ, আমরা পুতুলনাটকের শিল্পীদের নিয়ে একটা মঞ্চ গড়ে তুলেছি। ২০১৮ সালে আমাদের যাত্রা শুরু হয়। মঞ্চের মাধ্যমে

শিল্পীদের সব সমস্যা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। শুধু এ রাজ্যে নয়, দিল্লি-সহ নানা রাজ্যে আমাদের কর্মসূচি ছড়িয়ে পড়েছে। অন্য রাজ্যের পাপেটারিয়ানরা আমাদের মঞ্চে আসছেন। এই বছরের গোড়ায় আমরা এক কর্মসূচি নিই। আমাদের দাবি-দাওয়া রাজ্য সরকারের কাছে জানানোর চেষ্টা চলছে। পরিকল্পনা রয়েছে আগামী দিনে পাপেট্রির জন্য আকাদেমি গড়ে তুলব। সরকারি সাহায্য ছাড়া যা সম্ভব নয়। কবিতা, নাটকের জন্য যদি আকাদেমি থাকে তাহলে পুতুলনাটকের জন্য কেন আকাদেমি হবে না! সরকারি সাহায্য ছাড়া পুতুলনাটকের ঐতিহ্য ধরে রাখা কিংবা প্রসার সম্ভব নয়।

প্রশ্ন : সম্প্রতি আপনারা পুতলনাটকের জন্য এক অন্তরঙ্গ মঞ্চ গড়ে তুলেছেন। তার নাম কী ও কেমন চলছে?

সুদীপ্ত : গত বছর অতিমারির সময় আমাদের নিজস্ব কেন্দ্র সেলিমপুরে গড়ে তুলেছি পাপেটোরিয়াম। এখানে পাপেটের জন্য আধুনিক প্রেক্ষাগৃহ আছে। প্রেক্ষাগৃহে ৬০ জনের বসার ব্যবস্থা রয়েছে। তার সঙ্গে রয়েছে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার। এখানে অন্য নাটকও মঞ্চস্থ হয়। ভালো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। আমরা পুতুলনাটক আর সাধারণ নাটকের মধ্যে একটা মেলবন্ধনের চেষ্টা করছি। নাট্য নির্দেশকরা এগিয়ে আসছেন।

প্রশ্ন : আপনাদের পুতুল ওয়ার্কশপে কী হয়?

সুদীপ্ত : নানা ধরনের পুতুল তৈরি, পুতুলের ডিজাইন আর নাটক প্রযোজনা করা হয়। এ ছাড়াও চলে পুতুলনাটক নিয়ে গবেষণা।

প্রশ্ন : ডলস থিয়েটারের নতুন প্রযোজনা কী?

সুদীপ্ত : আমাদের নতুন প্রযোজনা—রোড টু নেতাজী। নেতাজী হওয়ার গল্প পুতুলনাটকের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। দর্শকদের ভূয়সী প্রশংসা পাচ্ছি।

লোকের গান শোনার ধৈর্য কমে গেছে : সুরজিৎ

একটা সময় পুজো আসা মানেই ছিল পুজোর গানের চমক। নতুন পোশাকের মতো পুজোর নতুন গানের মজাই ছিল আলাদা। তবে সেদিন আর নেই। বাংলা গানের বাজার এখন খারাপই। বাংলা গানের এই দুঃসময়, ছেড়ে আসা ভূমি আর নিজের জীবনের নানা কথা শোনালেন গায়ক সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়। *আলাপচারিতায় সমুদ্র সেন*

প্রশ্ন : খবরের মতো আজকাল গানও ভাইরাল হয়। এতে গানের ক্ষতি হচ্ছে না?

সুরজিৎ : এতে তো ক্ষতির কিছু নেই। নেট দুনিয়ায় সবাই চাইছেন নিজের সব কাজ ভাইরাল হোক। ভাইরাল হয় ভালো কাজ করলে বা হাস্যকর কিছু করলে। কে কোন কাজে খুশি হবেন সেটা তাঁর ব্যাপার। আজকাল বড়ো বড়ো কোম্পানি টাকা খরচ করে লাইক তৈরি করে।

প্রশ্ন : শুধু একটা গান ভাইরাল হওয়ায় ভুবন বাদ্যকর এখন রাতারাতি জনপ্রিয়। অথচ আপনারা এতদিন ধরে লড়াই করে চলেছেন তার কোনো দাম নেই?

সুরজিৎ : লোকে ভুবন বাদ্যকরের গান যেমন শুনছেন, তেমনি আমাদের গানও শুনছেন। এতে ভুবনের কোনও দোষ নেই। তিনি হয়তো কিছু রোজগার করছেন। দোষ তাঁদের ভুবনকে নিয়ে যাঁরা মাতামাতি করছেন। হয়তো তাঁদের কোনও উদ্দেশ্য আছে। আজ ভুবন রয়েছে, কাল জীবন আসবে তাঁর জায়গায়। এসব নিয়ে মাথা ঘামাই না। গান ভাইরাল হওয়া মানে বড়ো শিল্পী হয়ে যাওয়া নয়।

প্রশ্ন : সার্বিকভাবে বাংলা গানের বাজার এখন কেমন?

সুরজিৎ : খুব ভালো নয়। মানুষ নতুন গান শুনতে পাচ্ছেন না। আগে এফএম চ্যানেলে নতুন গান বাজানো হত, এখন শুধু সিনেমার গান বাজানো হয়। আগে পুজো মণ্ডপে বাংলা গান বাজানো হত, এখন আর তেমন শোনা যায় না।

প্রশ্ন : আপনারা, মানে শিল্পীরা এফএম চ্যানেলে বাংলা গান বাজানোর অনুরোধ করেন না কেন?

সুরজিৎ : আমরা অনেক দরবার করেছি কিন্তু কাজ হয়নি। বেসরকারি চ্যানেলের ওপর জোর করা যায় না। অন্যদিকে, আজকাল থিম পুজো চালু হওয়ায় আর বাংলা আধুনিক গান সেভাবে বাজানো হয় না। আমি নিজেই অনেক পুজো মণ্ডপে থিম সং গেয়েছি। এছাড়াও আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ, লোকের গান শোনার আগ্রহ ও ধৈর্য কমে গেছে। মানুষ ২৪ ঘণ্টা মোবাইলে ব্যস্ত।

প্রশ্ন : কিন্তু পুজো মণ্ডপে তো সিনেমার গান বাজানো হয়?

সুরজিৎ : ক'টা বাংলা সিনেমার গান বাজানো হয়? সিনেমা হিট করলে তার গান হিট হয়। সিনেমার গান আর বেসিক গান এক নয়। বেসিক গানের জন্য শিল্পীরা জনপ্রিয় হয়। বেসিক গান নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার সুযোগ থাকে। আমাদের নিজস্ব গানের জন্য লোকে আমাদের চিনেছে।

প্রশ্ন : ভূমি'র বারান্দায় রোদ্দুর-এর পর আর তেমন গান হল না কেন?

সুরজিৎ : ১৯৯৯ সালে আমরা ভূমি তৈরি করি, তার অন্তত দশ বছর আগে থেকে আমি গানবাজনা করি। বারান্দায় রোদ্দুর আমার নিজের লেখা ও সুর করা। কিন্তু এই গান নিয়ে যখন বিভিন্ন ক্যাসেট কোম্পানির কাছে রেকর্ড করার অনুরোধ করি, তখন সবাই ফিরিয়ে দেন। ওই গানই রিলিজের পর বিপুল জনপ্রিয়তা পায়। আট থেকে আশি সবার ভালো লাগে। জলসায় এখনও লোকেরা শুনতে চান। গান কেন এত হিট করল, তা আজও বুঝে উঠতে পারিনি। এরপর আমাদের অনেক গান হিট করেছে, কিন্তু বারান্দায় রোদ্দুরের মতো সুপারহিট হয়নি।

প্রশ্ন : ভূমি'র সুরজিৎ ও সৌমিত্র ছিল অভিন্ন বন্ধু ও জুটি। এই জুটি ভাঙল কেন?

সুরজিৎ : সৌমিত্র ভোটে দাঁড়াল। ভেবেছিল ভোটে জিতে রাজনৈতিক কেরিয়ার গড়বে। ধীরে ধীরে আমাদের দু'জনের সম্পর্কে দূরত্ব তৈরি হল। এমনও হয়েছে, আমরা দু'জনে এক ফাংশনে গান করেছি অথচ

আমাদের মধ্যে তেমনভাবে কথা হয় না। তারপর দেখলাম এভাবে অশান্তি নিয়ে একসঙ্গে কাজ করা যায় না। সৌমিত্র আলাদা গানের দল করল। তারপর ২০১২ সালে 'সুরজিৎ ও বন্ধুরা' নামে আমিও নতুন গানের দল করলাম। এখন এই ব্যানারে অনুষ্ঠান করি।

প্রশ্ন : পুরোনো দল ভূমির জন্য মন খারাপ করে না? বন্ধু সৌমিত্রর সঙ্গে এখন কথা হয়?

সুরজিৎ : পুরোনো কোনো স্মৃতি ভোলা যায় না। এখন আমাদের সবার বয়স বেড়েছে। মনোমালিন্য সব ভুলে গেছি। দেখা হলে সৌজন্য বিনিময় হয়। কথা হয়।

প্রশ্ন : সুরজিৎ ও বন্ধুরা এই ব্যান্ড থেকে কী কী গানের অ্যালবাম বেরিয়েছে?

সুরজিৎ : আশা অডিও থেকে বেরিয়েছে ফোক গান। ২০১৬ সালে ভাবনা থেকে বেরোয় রবীন্দ্রসংগীতের অ্যালবাম 'আমার পরাণ যাহা চায়'। এছাড়া আমাদের নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেল থেকে বেরোয় নতুন গান। এখন ডিজিটাল যুগে গানের ফরম্যাট বদলে গেছে।

প্রশ্ন : আপনি বেশ কিছু বাংলা সিনেমায় সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন। কী কী আছে?

সুরজিৎ : হ্যাঁ। কালী আমার মা, জয় মা দুর্গা, হ্যালো মেমসাহেব, ইচ্ছে, মুক্তধারা, হলুদ পাখির ডানা, পতি পরমেশ্বরী, টেক কেয়ার, বসন্ত ফিরে আসে, বুদ্ধু ভুতুম, হাদাভোদা, গোত্র—এই সব সিনেমায় সঙ্গীত পরিচালনা করি। সম্প্রতি 'মহানগর থেকে দূরে' নামে একটি ছবির কাজ করলাম। এছাড়া ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তর নতুন একটি ছবিতে সুর করেছি।

প্রশ্ন : আপনার রঙ্গবতী সুপারহিট। এর রহস্য কী?

সুরজিৎ : গোত্র ছবির 'রঙ্গবতী' গানের কথা আমার, সুর প্রচলিত। আমি ও ইমন গেয়েছি। সহজ-সরল কথা আর সুর সবার মনে ধরেছে।

প্রশ্ন : আপনারাই কি প্রথম লোকগানকে নাগরিক জীবনে পৌঁছে দিয়েছেন?

সুরজিৎ : আমাদের আগে অনেকেই কাজ করেছেন। আমরা সেই রেশ ধরে রেখেছি।

প্রশ্ন : অনেক লোকগায়কের অভিযোগ, এখন নাকি লোকসঙ্গীতের মূল সুর বদলে অন্যভাবে গাওয়া হয়। যার জন্য গানের বিশুদ্ধতা হারাচ্ছে। আপনি কী বলেন?

সুরজিৎ : আমি গান গাওয়ার সময় কখনও মূল সুরকে বদলানোর চেষ্টা করিনি। হয়তো গানের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের আধুনিক প্রযুক্তির বাজনা ব্যবহার করেছি।

প্রশ্ন : এখন টিভিতে রিয়েলিটি শো খুব জনপ্রিয়। এর মাধ্যমে কি নতুন প্রতিভা উঠে আসে?

সুরজিৎ : বিভিন্ন বেসরকারি চ্যানেলে রিয়েলিটি শোয়ে কতটা রিয়েলিটি থাকে তা আমরা সবাই জানি। ওই সব শো থেকে অনেকেই উঠে এসেছেন, আবার অচিরে হারিয়েও গেছেন। দু-তিন বছর পর তাঁদের আর গানের জগতে খুঁজে পাওয়া যায় না। অনেকে চলে যান সিরিয়ালে অভিনয় করতে বা সঞ্চালনার কাজে। শিল্পী হতে গেলে ধৈর্য থাকতে হয়।

প্রশ্ন : আপনার মেয়ে অন্বেষা খুব ভালো বাদ্যযন্ত্র বজায়। মেয়েকে কি গানের জগতে আনবেন?

সুরজিৎ : মেয়ে এখন পড়াশোনা করছে। লেখাপড়ায় খুব ভালো। দারুণ বেহালা বাজায়। অন্যান্য বাজনাতেও দক্ষ। মেয়ের ওপর কিছু চাপিয়ে দিতে চাই না। ওর যা ভালো লাগে তাই করবে। আমরা পাশে থাকব।

প্রশ্ন : আপনার প্রিয় শ্রোতাদের কি বলতে চান?

সুরজিৎ : আমার বাড়িতে আগে কেউ গানবাজনা করেনি। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কারোর কাছে গান শিখিনি। গানকে ভালোবেসে আমার গানের জগতে আসা। কুড়ি-বাইশ বছর ধরে গান গেয়ে চলেছি। এতদিন ধরে সবাই যে আমার গান শুনছেন, তার জন্য কৃতজ্ঞ।

With Best Compliments from...

All Well Wisher

Debasish Ghosal

শংকরের 'চৌরঙ্গী' জীবনদর্শনের এক আশ্চর্য দলিল

রিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

শংকরের 'চৌরঙ্গী' জীবনদর্শনের যেন এক আশ্চর্য দলিল। লেখকের নানা জনপ্রিয় উপন্যাসের মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় এই উপন্যাসের এবার ৬০ বছরে পা রাখল। প্রথম ১৯৬২ সালে এই উপন্যাসের আত্মপ্রকাশ ঘটে। উপন্যাসটি এতটাই জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে ভারতের বিভিন্ন ভাষার পাশাপাশি বিদেশি ভাষাতেও অনূদিত হয়। এই উপন্যাসের শতাধিকের বেশি সংস্করণ হয়েছে। আর কতবার পুনর্মুদ্রিত হয়েছে তা শুনলে অবাক হতে হয়। চৌরঙ্গীকে বাংলা সাহিত্যের এক ধ্রুপদী উপন্যাস বলে মনে করা হয়। অরুণাভ সিনহা এই উপন্যাস ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। ২০০৭ সালে সেটি 'ভোডাফোন ক্রসওয়ার্ড বুক প্রাইজ' জয় করে। এছাড়া ২০১০ সালে উপন্যাসটি ইন্ডিপেনডেন্ট ফরেন ফিকশন পুরস্কার পায়। এই উপন্যাসের শাজাহান হোটেলটি অনেকটাই কলকাতার একসময়ের স্পেনসেস হোটেলের আদলে গড়া। চৌরঙ্গী উপন্যাস নিয়ে সিনেমা করেন পরিচালক পিনাকী মুখোপাধ্যায়। ১৯৬৮ সালে মুক্তি পায় এই বাংলা সিনেমা। চৌরঙ্গী উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র স্যাটা বোসের চরিত্রে অভিনয় করেন মহানায়ক উত্তমকুমার। লেখক এই চরিত্রকে কীভাবে খুঁজে পান? এক সাক্ষাৎকারে লেখক উল্লেখ করেছিলেন, "ইস্টার্ন রেলওয়েতে এক ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁর নাম ছিল সত্যসুন্দর বসু। আমি তখন ওখানে চাকরি করি। তিনি সাহেবদের সঙ্গে খুব মিশতেন। স্কাউটিং করতেন। স্মার্ট লোক ছিলেন। কায়দা করে ইংরেজি বলতেন। সবসময় বলতেন, আমার নাম স্যাটা বোস। খুব পপুলার ফিগার ছিলেন। আমি অবশ্য দূর থেকে দেখেছি। অতটা আলাপ ছিল না। আবার স্পেনসেস হোটেলে একজনকে পেয়েছিলাম, যিনি পরে গ্রেট ইস্টার্নে চলে যান। তাঁর মধ্যে একটা অভিভাবকসুলভ ব্যাপার ছিল। তাঁরও ধারণা ছিল ওঁকে ভিত্তি করে লিখেছি"।

চৌরঙ্গীর প্রিমিয়ার শো'য়ে লেখকের পাশে বসে এই সিনেমা দেখেন স্যাটা বোসের চরিত্রে অভিনয় করা মহানায়ক। উত্তমকুমার তখন লেখকের কাছে জানতে চান, তাঁর তৈরি চরিত্রটা ঠিকঠাক সিনেমায় ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন কিনা? উত্তরে শংকর বলেন, 'আমার তৈরি চরিত্রটাকে আপনি পর্দায় জীবন্ত করে তুলেছেন'। সিনেমাটা ওই সময় হিট হয়। সিনেমায় শংকরের ভূমিকায় শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় ছাড়াও অঞ্জনা ভৌমিক, সুপ্রিয়া দেবী, বিশ্বজিৎ ও আরো অনেকে অভিনয় করেন। এরপর পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়ও চৌরঙ্গী নিয়ে সিনেমা করেন। যদিও ওই সিনেমার গল্প ২০১৮ সালের প্রেক্ষাপটে তৈরি হয়।

আমাদের সবার জীবনেই হয়তো স্যাটা বোসেরা রয়েছেন তাঁদের নিজস্ব ভঙ্গিমায়। 'চৌরঙ্গী'র প্রেক্ষাপট গত শতকের পাঁচের দশকের কলকাতা। উপন্যাসের কথক এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবক। তাঁরও নাম শংকর। এক ব্রিটিশ ব্যারিস্টারের কাছে সচিবের চাকরি করত। কিন্তু সেই ব্যারিস্টারের অকালমৃত্যুর পর সে বেকার হয়ে পড়ে। দরজায় দরজায় ঘুরে খবরের কাগজ বিক্রির পেশা নেয়। একদিন বন্ধু বায়রন শহরের সবচেয়ে পুরোনো ও নামি হোটেল শাজাহানে তাকে কাজ জোগাড় করে দেয়। সেই হোটেলের চিফ রিসেপশনিস্ট স্যাটা বোস। কিছুদিন টাইপিস্টের কাজ করার পর সে স্যাটা বোসের প্রধান অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়। আর হয়ে ওঠে স্যাটা বোসের সবচেয়ে বিশ্বস্ত সহকর্মী। কলকাতার উচ্চবিত্ত সমাজের অন্ধকারে থাকা এক দিক তুলে ধরেন শংকর। সমাজের লোভ, অপকর্ম ও লজ্জাজনক ব্যবহার প্রথম দিকে ওই যুবককে অবাক করেছিল। অচিরেই এই সবকিছুতে সে ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে ওঠে। তবে এর সঙ্গেই রয়েছে নানা বিচিত্র মানুষের অন্তরমহলের কথা। যা আমাদের অবাক ও মুগ্ধ করে। আর উপন্যাসের কেন্দ্রে প্রেমে মিলন না হওয়ার ট্রাজেডি যা সিনেমা তৈরি করতে উৎসাহিত করে পরিচালকদের। কিন্তু এত জনপ্রিয় উপন্যাস নিয়েও লেখককে নানা কথা শুনতে হয়। 'চৌরঙ্গী' প্রসঙ্গে শংকর লেখেন, "প্রথমদিন থেকেই শক্তিমানদের নাক-উঁচু ঘেন্না। প্রথমদিন থেকেই সমালোচনা যে রেস্টুরেন্ট আর রেস্তরাঁর তফাৎ বোঝে না, সে লিখেছে হোটেল নিয়ে বই। এক নামি লেখিকা 'দেশ'এর সম্পাদককে চিঠি পাঠিয়ে 'অশিক্ষিতের উপন্যাস' বলে অভিযোগ করেন। তাঁর কথায়, যে লোকটা 'ব্রেড অ্যান্ড ব্রেকফাস্ট'-এর সঙ্গে 'বেড অ্যান্ড ব্রেকফাস্ট'কে গুলিয়ে ফেলতে পারে সে লিখেছে হোটেল নিয়ে বই। পাঠকরা যেমন ঢেলে দিয়েছেন, সমালোচকরাও তেমনি ঢেলে আক্রমণ করে গেছেন। মানুষ বলে কেউ মনে করেননি। কোনো পুরস্কার দেয়নি। ভুল বললাম। একটা পুরস্কার 'চৌরঙ্গী' পেয়েছিল। শ্রেষ্ঠ বাইন্ডিংয়ের জন্য"।

অথচ পাঠকের বিচারে এটাই লেখকের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও মহৎ উপন্যাস। শংকরের লেখা এই উপন্যাসের শুরু অদ্ভুতভাবে। যা আজও পাঠকদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায় — 'ওরা বলে এসপ্ল্যানেড। আমরা বলি চৌরঙ্গী। সেই চৌরঙ্গীই কার্জন পার্ক। সারাদিন ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত শরীরটা যখন আর নড়তে চাইছিল না তখনই ওখানে আশ্রয় মিলল। ইতিহাসের মহামান্য কার্জন সাহেব বাংলাদেশের অনেক অভিশাপ কুড়িয়েছিলেন। সুজলা-সুফলা এই দেশটাকে কেটে দু'ভাগ করার বুদ্ধি যেদিন তাঁর মাথায় এসেছিল, আমাদের দুর্ভাগ্যের ইতিহাস নাকি সেই দিন থেকেই শুরু হয়েছিল'।

সত্যজিৎ রায় ও ঋত্বিক ঘটকের ছবির মা গীতা দে

সবুজ সেন

এক বা দু'দশক নয়, টানা ছয় দশক ধরে বাংলা চলচ্চিত্র ও রঙ্গমঞ্চে দাপটের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। অথচ যোগ্য সম্মান পাননি। বাংলার উপেক্ষিত এই প্রতিভাময়ী অভিনেত্রীর নাম গীতা দে। বাংলা সিনেমার জগতে অনেকের কাছে তাঁর পরিচয় ছিল 'গীতা মা' বলে। অথচ এই প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী একসময় বিস্মৃতির আড়ালে চলে যান।

১৯৩১ সালের ৫ আগস্ট কলকাতার দর্জিপাড়ায় গীতা দে'র জন্ম হয়। তাঁর বাবা অনাদিবন্ধু ছিলেন পেশায় ডাক্তার। মা'র নাম ছিল রেণুবালা। মাত্র ৫ বছর বয়সে বাবা-মার বিচ্ছেদ তাঁর জীবনকে লড়াইয়ের দিকে ঠেলে দেয়। সেই সময় আদালতের পক্ষ থেকে শিশু গীতাকে প্রশ্ন করা হয়, সে কার সঙ্গে থাকতে চায়? গীতা বাবার বদলে মাকেই বেছে নেন। মেয়েকে বুকে টেনে নিয়ে মা বলেন, 'কী বোকা রে তুই! ডাক্তার বাবার কাছে থাকলে ধনীর দুলালি হতিস। আমি কিইবা তোকে দিতে পারব!' কিন্তু ধনীর দুলালি সেদিন মাকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কেঁদে বলেছিল, 'মা আমি তোমার সঙ্গেই থাকব'। বাবা-মায়ের বিচ্ছেদ তাঁর লেখাপড়ায় ব্যাঘাত ঘটায়। বড়ো স্কুলে ভর্তি হতে পারেননি গীতা। বেশিদূর লেখাপড়াও করতে পারেননি।

বিচ্ছেদের পর মা রেণুবালা দেবী ফের বিয়ে করেন। তবে দ্বিতীয় বাবা অজিত কুমার ঘোষ গীতার দায়িত্ব নিতে চাননি। তখন নিজের দায়িত্ব নিজে নেওয়ার জন্য অভিনয় জগতে পা রাখেন গীতা। মাত্র ৬ বছর বয়সেই মায়ের সঙ্গে নাটকের দলে নাম লেখান তিনি। প্রবোধ গুহর মঞ্চে তখন বিখ্যাত নাটক কালিন্দী চলছে। সেই নাটকে গান গেয়ে মাসে ৫ টাকা আয় করতেন গীতা। এই মঞ্চ থেকে তাঁর খুব নামডাক হয়। গান গাওয়ার পাশাপাশি অভিনয়ও করতেন। এরপর চলে আসেন নাট্য ভারতীতে। 'দুই পুরুষ' নাটকে ছোটো মমতার চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকদের মন জয় করেন। গীতার বয়স যখন ১৪-১৫ বছর, তখনই আচমকা তাঁর মা মারা যান। তিনি খুব একা হয়ে পড়েন। তবে এক মায়ের অভাবপূরণ করেন আরেক মা। বন্দনা দেবী ওই সময় গীতার অভিভাবক হয়ে দাঁড়ান। গীতাকে আলাপ করিয়ে দেন নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ির সঙ্গে। সেখানে প্রথম দিকে বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করতে হত তাঁকে। এ নিয়ে গীতা দে'র মনে অসন্তোষ ছিল। কিন্তু শিগগির তিনি বুঝতে পারেন এই নাট্যমঞ্চ তাঁর জীবনের অন্য দরজা খুলে দিয়েছে। পাঁচ বছর তিনি শিশির ভাদুড়ির পরিচালনায় কাজ করেন। এই সময়ে গীতা দে নাচ ও গানে পারদর্শিতার পরিচয় দেন। শিশির ভাদুড়ি সম্পর্কে তিনি বলেন, 'শিশির ভাদুড়ি ছিলেন আমার গুরু। অভিনেত্রী হিসাবে আমার সেরা গুণের তিনি পূর্ণ রূপ দেন'।

গীতা দে নাটকে বেশ কয়েকজন নামি পরিচালকের সঙ্গে কাজ করেন। যেমন, তুলসী লাহিড়ি, শম্ভু মিত্র, তুলসী চক্রবর্তী, জ্ঞানেশ মুখার্জি, কালী সরকার, কানু ব্যানার্জি, দিলীপ রায় প্রমুখ। ১৯৫৬ সাল থেকে টানা ১৮ বছর তিনি স্টার থিয়েটারে অভিনয় করেন। ওই সময়ে পরিচালক ছিলেন দেবনারায়ণ গুপ্ত। ১৯৭৬ সালে তিনি যোগ দেন কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে। সেখানে 'অঘটন' নাটকে গীতা দে জ্ঞানেশ মুখার্জির পরিচালনায় কাজ করেন। পরে অভিনয় করেন সমরেশ বসুর 'বিবর' নাটকে। সেখানে পরিচালক ছিলেন রবি ঘোষ। তাঁর অভিনীত শেষ নাটক 'বাদশাহী চাল'। ১৯৯৬ সালে উত্তর কলকাতার রঙ্গনা মঞ্চে পরিবেশিত এই নাটকের নির্দেশক ছিলেন গণেশ মুখোপাধ্যায়।

ছবির জগতে

এদিকে, মাত্র ৬ বছর বয়সে গীতা দে 'আহুতি' ছবিতে কাজের সুযোগ পান। ছবির পরিচালক ছিলেন ধীরেন গাঙ্গুলি। এরপর অভিনয় করেন 'দম্পতি' ও 'নন্দিতা'য়। ১৯৫১ সালে গীতা দে নতুন করে বাংলা সিনেমার জগতে ফেরেন। ওই সময়ে তাঁর প্রথম ছবি ছিল 'শিল্পী'। পরে অগ্রদূত পরিচালিত 'লালু ভুলু'তে মায়ের চরিত্রে অভিনয় করেন। এরপর কাজ করেন নির্মল দে পরিচালিত 'বিয়ের খাতা' ছবিতে। উত্তম কুমার ও মালা সিনহার সঙ্গে 'সাথীহারা' ছবিতেও কাজ করে প্রশংসিত হন। ১৯৫৬ সাল ছিল তাঁর জীবনের যুগান্তকারী বছর। অভিনেতা কালী ব্যানার্জি তাঁর সঙ্গে পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের পরিচয় করিয়ে দেন। গীতা দে অভিনয় করেন 'মেঘে ঢাকা তারা', 'কোমল গান্ধার' ও 'সুবর্ণরেখা' সিনেমায়। ঋত্বিক ঘটকের বিষয়ে তিনি বলেন — 'ক্যামেরার ব্যবহার ও শট নেওয়ার ব্যাপারে এত বড়ো মাপের পরিচালক আর দেখিনি। তিনি আমার জন্য বেশ কিছু ফিল্মের কথা

ভেবেছিলেন কিন্তু শেষপর্যন্ত সেসব আর হয়নি।' সত্যজিৎ রায়ের 'তিন কন্যা'র শেষ গল্প সমাপ্তিতে অপর্ণা সেনের মায়ের ভূমিকায় গীতা দে অভিনয় করেন। তিনি মা-র চরিত্রে অভিনয় করেন আরও অনেক ছবিতে। ৩৫০-৪০০থেকে চার শো। অভিনয় করেন দেবকীকুমার বসুর 'সাগর সঙ্গমে' ছবিতে। ছয় দশকের অভিনয় জীবনে তাঁর অভিনীত উল্লেখযোগ্য আরও কিছু ছবির মধ্যে রয়েছে — অজয় করের 'সাত পাকে বাঁধা', 'নৌকাডুবি', 'মাল্যদান', অরবিন্দ মুখার্জির 'নিশিপদ্ম', 'দুই ভাই', 'বর্ণচোরা', 'মৌচাক', তপন সিংহর 'জতুগৃহ' আর 'এখনই' ছবিতে। এ ছাড়াও রয়েছে — 'বাঘবন্দি', 'দম্পতি', 'দত্তা', 'সূর্যসাক্ষী', 'হিরের শিকল', 'মহাপৃথিবী', 'সন্তান', 'পরিণীতা', 'চিরদিন তুমি যে আমার', 'আহ্বান', 'ব্যাপিকা বিদায়','মর্জিনা আবদুল্লা', 'নতুন পাতা' প্রভৃতি। নায়িকা হিসাবে অসামান্য অভিনয় করেন 'ডাইনি' ছবিতে।

উত্তম কুমার ও গীতা দে

শিল্পী, অনিন্দিতা, মেমসাহেব-এসব ছবিতে অভিনয় করার সুবাদে তাঁর উত্তম কুমারের সঙ্গে পরিচয়। পরে উত্তম কুমারের সঙ্গে তাঁর পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। উত্তম কুমারের মা চপলাদেবী গীতা দে'কে শুধু স্নেহ করতেন না, বলতেন, 'আমার তো কোনও মেয়ে নেই, তুই আমার মেয়ে।' গীতার অভিনয়ের খুব প্রশংসা করতেন মহানায়ক। সামনে ও আড়ালেও। গীতা এক জায়গায় বলেন, এটাই একজন ভালো মানুষের মহৎ গুণ। অভিনয় প্রসঙ্গে গীতা দে সাংবাদিকদের বলতেন, 'আমি সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটকের ছবির মা'।

পর্দায় দজ্জাল কিন্তু ব্যক্তিজীবনে ছিলেন সাদামাটা

পর্দায় দজ্জাল, কুচুটে, ঝগড়ুটে চরিত্রে গীতা দে ছিলেন আইকনিক। কিন্তু মানুষ হিসাবে ছিলেন খুব সাদামাটা ও দুঃখী। মাত্র ১৫ বছর বয়সে কলকাতার তালতলার ব্যবসায়ী অসীমকুমার দে'র সঙ্গে বিয়ে হয়। ধনী ব্যবসায়ী স্বামী, বিশাল বাড়ি। কিন্তু জনমদুখী গীতার সুখ সইল না স্বামীর ঘরে। ছবিতে অভিনয় করা তাঁর শ্বশুরবাড়ির পছন্দ হয়নি। শাশুড়ি ছেলেকে অন্য জায়গায় বিয়ে দেন। দুই ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে গীতা দে স্বামীর ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। কিন্তু আজীবন স্বামীর পদবী ও বিয়ের চিহ্ন হিসাবে সিঁথিতে সিঁদুর ব্যবহার করতেন। টালিগঞ্জ পাড়ার সব কলাকুশলীদের কাছে তিনি ছিলেন, গীতা-মা। সুচিত্রা সেনের অন্দরমহল পর্যন্ত একবাক্যে তাঁর অবারিত দ্বার ছিল। গীতা দে কোনও দিন টাকাপয়সা জমাতে পারেননি। অথচ সবার দায়িত্ব নিতেন সাধ্যমতো। কেউ বিপদে পড়ে গীতা-মাকে দুঃখের কথা বললেই তিনি বলতেন একটাই কথা, 'চলে আয় আমার কাছে'। নিজের যেটুকু ছিল তাই দিয়ে পরকে আপন করতেন। মায়ের মতো আগলে রাখতেন বিপদে পড়া মানুষদের। এক সময় রত্না ঘোষাল ও ইরা ঘোষাল এই দুই বোনকে গীতা দে আশ্রয় দেন। যার সঙ্গে ছবিতে তাঁর অভিনীত চরিত্রকে কখনও মেলানো যায় না।

চরম একাকীত্বে কাটে শেষ জীবন

তাঁর শেষ জীবন কেটেছে চরম অভাব আর একাকীত্বে। যখন গ্যাসের যুগ শুরু হয়েছে, তখনও তিনি উনুনে বা স্টোভে রাঁধতেন। শেষ জীবন পর্যন্ত কাজ করে গেছেন। কোথাও টাকা পেয়েছেন, আবার কোথাও পাননি। যে বাড়ির তিনতলায় থাকতেন, সেখানে ওঁর অংশের দেওয়ালে ঠিকমতো রঙ বা প্লাস্টার করাও ছিল না। দুঃখের বিষয়, গীতা দে সারাজীবন সবার জন্য করে যান অথচ তাঁর যখন দরকার হল, তখন তাঁর ছেলেমেয়ে, ভাইবোন, বন্ধুস্বজন কেউ শেষ জীবনে পাশে ছিলেন না। সবাই ব্যস্ত থাকলেন নিজের কাজে। অনেক পরিচালক, প্রযোজক গোষ্ঠীর কাছ থেকে প্রাপ্য টাকা তিনি পাননি। গীতা দে এক সাক্ষাৎকারে আক্ষেপের সুরে বলেন, 'তোমাদের ঋতুপর্ণ ঘোষ তো আমায় ঠকিয়েছে। ওঁর ছবিতে আমায় দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়ে টাকা দেয়নি'। ঋতুপর্ণ ঘোষের একটি টেলিফিল্ম '১ নম্বর মালতীবালা লেন'এ গীতা দে অভিনয় করেন। সোমা চক্রবর্তী ও স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় অভিনীত ওই টেলিছবিতে বয়স্কা ঠাকুমার চরিত্রে অভিনয় করেন। তাঁকে শেষ জীবনে শাড়ির ব্যবসা করতে হয়েছে। অনেক যন্ত্রণা পেয়ে গীতা দে চলে যান ২০১১ সালের ১৭ জানুয়ারি। তাঁর শেষ ছবি 'আজও দু'চোখে তুমি'। গীতার অভিনয় দেখে মুগ্ধ এক বিদেশি পরিচালক বলেন, ইউরোপ বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মালে অস্কার পুরস্কার পেতেন। কিন্তু এই বাংলায় তিনি না পেয়েছেন আর্থিক স্বাচ্ছল্য, না পেয়েছেন নিজের অভিনয় দক্ষতার জন্য কোনও পুরস্কার।

With Best Compliments from...

ALL WELL WISHER

পুজোয় খান পেট পুরে ** শর্তাবলী প্রযোজ্য

হাতে রয়েছে আর মাত্র কয়েকটা দিন। তারপরই দেদার মজা, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সারাদিন ধরে প্যান্ডেল হপিং। পঞ্চমী থেকে বিজয়া দশমী পর্যন্ত মন খুলে খাওয়াদাওয়া। সারা বছর যাঁরা শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতন থাকেন পুজোর এই কয়েকটা দিন তাঁরাও সব নিষেধ ভুলে পেট-পুজোয় মেতে ওঠেন। পুজো শেষ হলে তার ফলও মেলে হাতেনাতে। কিন্তু তাতে কী! বিশিষ্ট ক্লিনিক্যাল ডায়েটিশিয়ান অ্যান্ড ডায়েবিটিস এডুকেটর সৌম্যেন্দু ঘোষ অবশ্য বলছেন, নো, চিন্তা। পুজোর দিনগুলোতে পেট পুরে খান। তার জন্য পুজোর আগের কয়েকটা দিন ও পুজোর পর মেনে চলুন হেলদি ডায়েট। সেইসঙ্গে কয়েকটি জরুরি টিপস মাথায় রাখলেই পুজোর আনন্দ দ্বিগুণ উপভোগ করা যাবে।

আমাদের প্রত্যেকেরই এটা জানা উচিত প্রতিদিন আমরা কত ক্যালরির খাবার খাব। সেক্ষেত্রে আমাদের উচ্চতা এবং ওজনের অনুপাত ঠিক কী হওয়া উচিত সেটা আগে জানা প্রয়োজন। আমাদের দৈহিক ওজনকে (কেজিতে) যদি দৈহিক উচ্চতা (মিটার স্কোয়ারে) দিয়ে ভাগ করা যায় তাহলে যে ভাগফলটি বেরোবে সেটা ১৮ থেকে ২৩ কেজির মধ্যে হতে হবে। ২৩-এর উপরে যেমন—২৫, ২৮ বা ৩০ কেজি হলে ওভারওয়েট অর্থাৎ রিস্ক ফ্যাক্টর হয়ে যাবে। ডায়েটিশিয়ানদের মতে, এই বিষয়টিকে মনে রেখে আমাদের কত ক্যালরির খাবার খেতে হবে সেটা যেমন ঠিক করতে হবে, তেমনি সঠিক ডায়েট তালিকা তৈরি করতে হবে। অতিরিক্ত ক্যালরি মানেই ওজন বৃদ্ধি। কিন্তু ডায়েট কন্ট্রোল মানে আবার রোজকার স্বাভাবিক খাদ্য গ্রহণ কমিয়ে দেওয়া বা খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেওয়া একেবারেই নয়। তাতে শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন, মিনারেলস, প্রোটিনের ঘাটতি দেখা দেয়।

হেলদি টিপস

◆ পুজোর সাত-আট দিন আগে থেকে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ কমিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ বাড়িতে আমরা যে পরিমাণ ভাত বা রুটি খাচ্ছি সেটা কমাতে হবে। যেমন — রাতে বা দুপুরে যদি তিনটে রুটি খাই সেটা কমিয়ে দুটো রুটি খেলে ভালো। দু'কাপ ভাতের পরিবর্তে পরিমাণটা এক কাপ করে দিন।

◆ প্রচুর পরিমাণে শাক-সবজি, ফল খান। মাটির তলার সবজি (আলু, ওল) এড়িয়ে চলতে হবে।

◆ যাঁরা অফিসে চাকরি করেন বা ব্যস্ত গৃহবধূ তাঁদের 'মিল-গ্যাপ'টা অনেক বেশি হয়ে যায়। খাবারের মাঝের গ্যাপটা হতে হবে তিন ঘণ্টা। তার বেশি নয়। এর মাঝেমাঝে ওটস, স্যালাড, ব্রাউন ব্রেড, ফল, ডবল-টোনড দুধের সঙ্গে কর্ণফ্লেক্স, টক দই-এর মতো খাবার খেতে হবে। একটা কথা মনে রাখতে হবে, খাবার খাওয়ার মধ্যে ৫-৬ ঘণ্টা গ্যাপ রাখলে ওয়েট সহজে কমবে না।

◆ প্রতিদিন খাদ্য তালিকায় চিনি ছাড়া টক দই রাখুন। এটা ওজন কমাতে যেমন সাহায্য করবে তেমনি স্কিনের জন্যও খুবই ভাল।

◆ একটা করে ফল অবশ্যই খেতে হবে। কিন্তু সেই তালিকায় যেন কলা, সবেদা না থাকে। কারণ, তাতে বেশি পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট রয়েছে।

◆ পুজোতে সুস্থ ও ভালো থাকতে গেলে শরীরচর্চা অবশ্যই করতে হবে। পুজোয় বেশি সময় পাওয়া না গেলে অন্তত ২০ মিনিট ব্যায়াম করুন। সেক্ষেত্রে স্পট জগিং, জোরে হাঁটা ভালো কাজ দেয়।

◆ জেনে রাখুন, একটা ১৫০ ক্যালোরিযুক্ত রসগোল্লা খেলে তার জন্য অন্তত ৪০ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা হাঁটা প্রয়োজন। তবে পুজোর সময় যেহেতু অত সময় থাকে না তাই পুজোর আগে এবং পরে শরীরচর্চা বেশি করে করতে হবে।

◆ পুজোর সময় বিভিন্ন ডান্সিং অ্যাক্টিভিটিতে যোগ দিন। এতে খুব ভালো ক্যালারি খরচ হয়। শুধু তাই নয়, নাচের সময় মনে উৎফুল্লতার কারণে শরীরে একটা হরমোন সিক্রেশন হয় যেটা খুবই ভাল।

◆ রোজ সকালে একটা করে কাঁচা হলুদ খান। এটা খুব ভালো অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ দেয়।

◆ সকালে উঠেই উষ্ণ গরম জলে একটা পাতিলেবু চিপে খেয়ে নিন। লেবু ফ্যাট কমায়, স্কিন ভালো রাখে।

◆ পুজোর সময় নিজেকে হাইড্রেটেড রাখতে হবে। প্রচুর জল খেতে হবে। তবে তেষ্টা মেটানোর জন্য কখনওই কোল্ড ড্রিঙ্কস নয়। তার পরিবর্তে ফলের রস, ডাবের জল, লস্যি (চিনি কম দিয়ে) খান। প্রয়োজনে বাড়ি থেকে জল নিয়ে বাইরে বেরোয়।

এড়িয়ে চলুন

◆ পুজো মানেই অফুরন্ত কোল্ড ড্রিঙ্কস, চিপস, চকোলেট আর আইসক্রিম খাওয়া। চকোলেট আর আইসক্রিম ডেয়ারিজাত হওয়ায় ক্ষতিটা সেভাবে হয় না। কিন্তু পুজোতে যদি যথেচ্ছ কোল্ড ড্রিঙ্কস আর চিপস খাওয়া হয় তার পরিণাম কিন্তু যথেষ্ট খারাপ হবে। অত্যাধিক ক্লোল্ড ড্রিঙ্কস খাওয়ার ফলে

আমাদের দেহে প্রচুর ফ্রি-র‍্যাডিক্যালস তৈরি হয়, অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের অভাব হয়। এছাড়া কোল্ড ড্রিঙ্কসে প্রচুর ক্যালারি থাকে।

◆ চিপসে যেহেতু বেশি মাত্রায় আজিনা-মোটো দেওয়া থাকে তাই স্বাভাবিকভাবেই তা শরীরের পক্ষে খারাপ। তাই যতটা পারা যায় এসব এড়িয়ে চলাই ভালো।

◆ মিষ্টি বা চিনি শরীরে অতিরিক্ত ক্যালরির জোগান দেয়। আর বেশি ক্যালরি শরীরে গেলেই সুগার বাড়বে, ওজনও বাড়বে। একইসঙ্গে অতিরিক্ত তেলও অত্যাধিক হারে শরীরে ক্যালরি জোগায়। ২ চামচ তেল — ১০০ ক্যালরি, ৫ চামচ চিনি সমান ১০০ ক্যালরি। তাই পুজোর আগে এই দুটো জিনিসকে একটু এড়িয়ে চললে ভালো। পুজোর আগে একটু কম তেলে রান্না করা খাবার খেলে ভালো। বাড়িতে অতিরিক্ত ভাজাভুজির বলে সেদ্ধ খান, বিকেলের স্ন্যাক্সে চপ, মুড়ি, সিঙারার পরিবর্তে কাঁচা বা সেদ্ধ ছোলা, রাজমা চাট মশলা ছড়িয়ে খান।

উপোস কিন্তু ভেবে চিন্তে

অষ্টমীতে অনেকেই উপোস করে থাকেন। এর মধ্যে অনেকেই আছেন যাঁরা ডায়াবেটিক বা ওভারওয়েট। ৪-৫ ঘণ্টা উপোস করার পর যে খাবারটা খাওয়া হচ্ছে সেটাই কিন্তু ফ্যাটে পরিণত হচ্ছে। সুগারের রোগীদের এতক্ষণ উপোস থাকার ফলে 'সুগার ফল' করে। এই সুগার ফলের কারণে শরীরের অনেক অঙ্গই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এমনকী সেই ব্যক্তি অজ্ঞানও হয়ে যেতে পারেন। তাই পুজোর সময় যদি উপোসের প্ল্যানিং থাকে তাহলে চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে আগে থেকে ওষুধ বা ইনসুলিনের ডোজটা অ্যাডজাস্ট করে নিন।

বিরিয়ানি খান কিন্তু.....

এক প্লেট বিরিয়ানিতে মোটামুটি ৭০০-র মতো ক্যালরি থাকে। সারাদিনে আমাদের মোটামুটি ১২০০-১৪০০ ক্যালরির প্রয়োজন হয়। সেক্ষেত্রে এক প্লেট বিরিয়ানিতেই অর্ধেক ক্যালরি শরীরে চলে গেল। তাই পুজোর সময় রাতে যদি বিরিয়ানির প্ল্যানিং থাকে সেক্ষেত্রে সারাদিনে ডায়েটকে সিম্পল করে দিতে হবে। দুপুরে ভাত না খেয়ে সবজির স্টু, স্যালাড, ফল, দই-এর মতো হেলদি খাবার খেলেন। রাতে বিরিয়ানি খাবার পরও যদি বাড়ি এসে খিদে পায় সেক্ষেত্রে এক কাপ দুধ, সঙ্গে একটা বিস্কুট খেয়ে নিন।

স্বজন-বন্ধুদের 'খাও-খাও'

পুজোতে সবাই খাওয়ার জন্য জোরাজুরি করেই থাকে। সবাইকে খুশি করার জন্য খেতেই পারেন। কিন্তু পরিমাণটা অল্প হতে হবে। বিজয়ায় সৌজন্য বজায় রাখার জন্য দুটোর জায়গায় প্লেট থেকে একটা মিষ্টি তুলে নিন।

উৎসবের আগে—পরে ব্যালেন্স ডায়েট

সকালে উঠেই উষ্ণ গরম জলে লেবু দিয়ে খেয়ে নিন। অনেকে মধুও দিতে পারেন।

সকাল ৮.৩০-৯টা : ২টো রুটি, সবজি, স্যালাড বা ২টো পাউরুটি মাখন ছাড়া, এক কাপ ডবল-টোনড দুধের সঙ্গে কর্ণফ্লেক্স কিংবা ওটসের উপমা অথবা ডালিয়া খেতে পারেন। ব্রেকফাস্টে কখনওই শস্য জাতীয় খাবার বাদ দেওয়া যাবে না।

সকাল ১১-১২টা : *টক দই, ফ্রুট স্যালাড, যে কোনো একটা ফল খান।*

দুপুর ১-১.৩০(লাঞ্চ) : ৫০-৬০ গ্রাম চালের ভাত, সঙ্গে সবজি (পুজোর আগে থেকে পুজোর শেষ পর্যন্ত মাটিরতলার সবজি খাওয়া কমিয়ে দিতে হবে), ডাল, সোয়াবিন, মাছের ঝোল। যাঁরা ওভারওয়েট তাঁদের মাছ আর ডাল একসঙ্গে চলবে না।

বিকেল ৪-৪.৩০ : ফল বা ফলের রস খান।

সন্ধ্যে ৬-৬.৩০ : পেঁয়াজ, লঙ্কা শশা সহযোগে ছোলা, মুড়ি কিংবা রাজমা খান।

রাত্রি ৯.৩০ — ১০ (ডিনার) : ১-২টো রুটি, মাছের ঝোল কিংবা চিকেন স্টু, সবজি।

যাঁদের ওজন অনেকটাই কম তাঁরা সবকিছু খান কিন্তু অবশ্যই তা হেলদি ডায়েট হতে হবে। কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার বেশি খান (৫০-৬০ শতাংশ)। ১০০-১৫০ গ্রাম চালের ভাত খেতে পারেন। শস্যজাতীয় খাবার অবশ্যই খেতে হবে। ডিম, মাখন, বাদাম, কাজু-কিসমিস খেলেও ওজন বাড়বে।

নদী বাঁচাতে ও জল সংরক্ষণের লড়াই চালাচ্ছেন সাইক্লিস্ট সম্রাট মৌলিক

নিছক ঘোরার নেশা বা অ্যাডভেঞ্চারের স্বপ্ন নয়, নদী বাঁচানোর পাশাপাশি জল সংরক্ষণের তাগিদে সাইকেলে চড়ে দেশ-বিদেশ অভিযান করে চলেছেন 'দ্য রিভার সাইক্লিস্ট' নামে পরিচিত বাঘাযতীনের সম্রাট মৌলিক।

কখনও অজানাকে জানতে আবার কখনও নির্ভেজাল বেড়ানোর নেশায় অনেকে পাহাড়, সমুদ্র বা জঙ্গল অভিযানে যান। এসবের বাইরে দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ানোর অনেক কারণ ও উদ্দেশ্য থাকে। যেমনটা রয়েছে সম্রাট মৌলিকেরও। নিছক বেড়ানো নয়, নদী বাঁচানোর পাশাপাশি জল সংরক্ষণের জন্য সাইকেলে চড়ে দেশ-বিদেশ অভিযান করে চলেছেন তিনি। 'ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস' হোল্ডার সাইক্লিস্ট ও বিশ্ব পর্যটক সম্রাট মৌলিক এখন সারা বিশ্বে 'দ্য রিভার সাইক্লিস্ট' নামে পরিচিত। নতুন প্রজন্মের জন্য মধ্য চল্লিশের এই যুবক পরিবেশ সুরক্ষা আর নদী ও জল বাঁচাতে কাজ করে চলেছেন।

কলকাতার বাঘাযতীন এলাকার ছেলে সম্রাট মৌলিক। পড়াশোনা কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে। বেড়ানোর নেশায় ২০০৩ সালে ৮ বন্ধুর সঙ্গে পাহাড় অ্যাডভেঞ্চারে যান। ১৪ দিনের ট্রেকিংয়ে পাহাড়কে কাছ থেকে জানার চেষ্টা করেন। তারপর হঠাৎই তাঁর মনে হয় কীসের জন্য অ্যাডভেঞ্চার করব! কলম্বাসের মতো তো নতুন কোনও দেশ আবিষ্কার করব না! তাহলে? ঠিক তখনই সম্রাটের মাথায় আসে আগামী দিনে পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো সমস্যা জল। তাই বাঁচাতে হবে পরিবেশ ও জল। কারণ, জলের সংরক্ষণ করতে না পারলে মানুষের জীবন হবে বিপন্ন। আর এই ভাবনা থেকেই সম্রাট ২০১০ সালে বেরিয়ে পড়েন হিমালয় ও লাগোয়া অঞ্চলের অভিযানে। ২০১১ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত একা একা পায়ে হেঁটে উচ্চ গাঙ্গেয় উপত্যকার ভাগীরথী, অলকানন্দা, মন্দাকিনী ইত্যাদি নদীর অবস্থা ঘুরে দেখেন। তারই মাঝ বারবার গিয়েছেন সিকিমের রঙ্গিত ও তিস্তা নদী অঞ্চল দেখতে। ওই সব বিস্তীর্ণ এলাকার নদীর অবস্থা দেখে সম্রাটের মনে হয় মানুষ নিজের স্বার্থের জন্য নদীকে দূষিত করছে। তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ছে মানুষের জীবনে। অথচ কারোরই কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই।

২০১৮ সাল থেকে শুরু হয় সম্রাটের সাইকেল অভিযান। প্রথম অভিযান ছিল ভারতের গঙ্গোত্রী থেকে বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত। প্রায় ৩ হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেন তিনি। তাঁর দ্বিতীয় অভিযান ছিল লাদাখ থেকে কন্যাকুমারিকা। তাঁর ১০৪ দিনের সাইকেল অভিযান শুরু হয় ২০১৮ সালের ৮ নভেম্বর ও শেষ হয় ২০১৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। তাঁর এই অভিযানে ছিল লাদাখ, জম্মু-কাশ্মীর, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, নয়া দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাত, মহারাষ্ট্র, গোয়া, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, কেরালা। ১১৩টা নদী পথ অতিক্রম করেন। তাঁর তৃতীয় অভিযান ছিল প্রতিবেশি বাংলাদেশের ২১টা জেলা ও ভারতের ৫টা রাজ্য। একক সাইকেল অভিযানে ১৪,০০০ কিমি পথ পাড়ি দেন। এর পরের বছরে তাঁর অভিযান ছিল প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ। ওই দেশের ২১টা জেলায় ঘোরেন।

সম্রাটের জীবনের এক স্মরণীয় ইভেন্ট রাশিয়ার ভলগা নদী ও লাগোয়া অঞ্চলে সাইকেল অভিযান। ওই অভিযানের তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ভারতের নদীর সংস্কৃতি রাশিয়ার সাধারণ মানুষের মধ্যে তুলে ধরা। অভিযান শুরু হয় ২০২১ সালের ৭ সেপ্টেম্বর যা শেষ হয় ওই বছরেরেই ৩ অক্টোবর। যাত্রাপথ ছিল রাশিয়ার বিখ্যাত শহর- টিভার, মস্কো, স্টুপিনো, সামারা, সারাতোভ, ভলগোগ্রাদ ও আস্ত্রাখান। রাশিয়ায় গিয়ে বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্পসংস্থার সেমিনারে অংশ নেন তিনি। নিজেও সচেতন হন নলবাহিত পানীয় জলের ব্যবহার, স্বচ্ছ পানীয় জলের নিয়ন্ত্রণ, ভূগর্ভস্থ জল নিয়ন্ত্রণ বিধি ও জলের পুনর্ব্যবহারযোগ্যতা সম্পর্কে। চলতি বছরের ৩ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিল ছিল তাঁর সম্পূর্ণ শ্রীলঙ্কা অভিযান। এই অভিযানে তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল শ্রীলঙ্কায় বিভিন্ন অঞ্চলে বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব কতটা পড়েছে তা দেখার।

প্রখ্যাত সুরকার শান্তনু মৈত্রের গঙ্গা অভিযানের শামিল হয়েছিলেন সম্রাট মৌলিক। ওই যাত্রাপথের সুর নিয়ে তৈরি হয় শান্তনুর 'সঙ অফ দ্য রিভার'। ৬ পর্বের এই মিউজিক ভিডিয়ো এ বছর ১৫ আগস্ট বেরিয়েছে।

সম্রাট কর্পোরেট চাকরি ছেড়ে একের পর এক সফল সাইকেল অভিযান করে চলেছেন। জল, নদী ও পরিবেশ বাঁচাতে ভারত-সহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নদীর অবস্থা প্রত্যক্ষ করছেন। ব্যবহারযোগ্য জলের সুষম বন্টনের প্রকৃত পরিস্থিতি নিয়েও তথ্য সংগ্রহ করেছেন। ভারত, বাংলাদেশ, রাশিয়া, শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ডের এই ৫ দেশের ১৫ হাজার কিলোমিটার পথ সাইকেলে একাকী ঘুরতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় অসংখ্য নদ-নদীর। উপলব্ধি করেন নদীর ও ওই সব এলাকার মানুষের সুখ ও দুঃখের বারোমাস্যা। নানা রাজ্যে ঘুরতে গিয়ে মানুষের বিচিত্র জীবনযাত্রা ও খাওয়া-দাওয়ার সঙ্গেও পরিচিত হন। দেশে-বিদেশে নানা টক শো ও সেমিনারে নিজের সেসব অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছেন। জীবনের নানা অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা তাঁর প্রথম বই 'দাগ' প্রকাশিত হয়েছে। যা এরমধ্যে পাঠক মহলে সাড়াও ফেলেছে। সম্রাটের আগামী দিনের সাইকেল অভিযান-ওমান মরুভূমি অঞ্চল। প্রথম দফায় ১০০০ কিলোমিটার সাইকেলে যাবেন ওমান ও দ্বিতীয় দফায় পায়ে হেঁটে ৩০০ কিলোমিটার যাবেন ওয়াহিবা মরুভূমিতে। যাত্রা শুরু হবে ৩ নভেম্বর সালালা থেকে। শেষ হবে মাসকটে ২ ডিসেম্বর। অভিযানের মূল থিম, বিশ্ব উষ্ণায়নের বিরুদ্ধে লড়াই।

নানা দেশ ঘোরার অভিজ্ঞতা নিয়ে সম্রাট মৌলিক জানান, 'আমরা পরিবেশের বিপদসীমা পার করে ফেলেছি। এখনই সচেতন না হলে ২০৩০ সালে জল ও পরিবেশ নিয়ে ভয়াবহ সঙ্কট নেমে আসবে গোটা বিশ্বজুড়ে। তাই সবাই এগিয়ে আসুন।'

ভারতের ফুটবলের জনক নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারীকে কেউ মনে রাখেনি

সৃঞ্জয় ঠাকুর

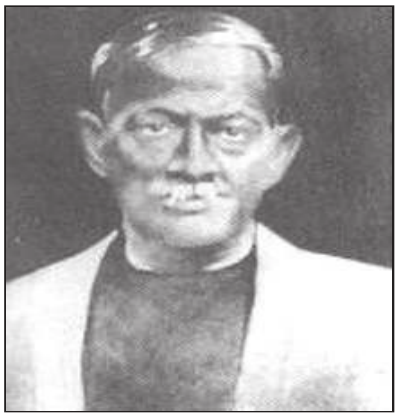

১৮৭৯ সাল। মোহনবাগানের মাঠের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল এক বালক। আচমকা একটা বল রাস্তার ওপর গড়িয়ে আসে। বলটাকে দেখতে পেয়ে তড়িঘড়ি বলটা লাথি মেরে মাঠে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। সাহেবরা মাঠ থেকে বলেছিলেন, 'কিক ইট বয়, কিক ইট'। সেদিনের ওই বালক একটাসময় বাঙালির মগজে ও মনে সর্বপ্রথম ফুটবলকে পরিচিত করায়। যাঁর নাম নগেন্দ্র প্রসাদ সর্বাধিকারী। ভারতের ফুটবলের জনক হিসাবে তাঁকে চিহ্নিত করা যায়।

নগেন্দ্র প্রসাদের জন্ম ১৮৬৯ সালের ২৭ আগস্ট হুগলির রাধানগরে। তাঁর বাবা সূর্য কুমার সর্বাধিকারী ফ্যাকাল্টি অফ মেডিসিনের প্রথম ভারতীয় ডিন ছিলেন। মা ছিলেন হেমলতা দেবী। নগেন্দ্র প্রসাদের শিক্ষাজীবন শুরু হয় হেয়ার স্কুলে। এরপর প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পাশ করেন। তাঁর ফুটবল খেলায় উৎসাহ দেখে কলেজের অধ্যাপক মিস্টার স্ট্যাক নিজের উদ্যোগে নগেন্দ্র প্রসাদকে ফুটবল শেখান। তাঁর উৎসাহে নগেন্দ্র খুব কম সময়ের মধ্যে বাংলার সেরা সেন্টার ফরওয়ার্ড হিসেবে অদ্বিতীয় হয়ে ওঠেন। ব্রিটিশরা বাঙালিদের অলস ও ভীতু বলে অপমান করত নগেন্দ্র প্রসাদ সেই অপমানেরই উত্তর দিয়েছিলেন ফুটবল খেলা শিখে ও শিখিয়ে। কৈশোরেই তিনি বেশ কিছু ক্লাব তৈরি করেন। তার মধ্যে 'বয়েজ ক্লাব' হল ভারতে প্রতিষ্ঠিত প্রথম ফুটবলের সংগঠন। এই ক্লাবের মাধ্যমে তিনি কলকাতায় হকি ও টেনিস খেলার সূচনা করেন।

উনিশ শতকে ব্রিটিশ সৈনিক ও ব্যবসায়ীদের স্পনসর করা ফুটবল ম্যাচে ভারতীয়রা ছিলেন ব্রাত্য। নগেন্দ্র প্রসাদ তাঁর সহপাঠী চোরাবাগানের মল্লিক পরিবারের নগেন্দ্র মল্লিককে সঙ্গে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন 'ফ্রেন্ডস ক্লাব'। এই ক্লাব থেকে শুরু হয় কলকাতা ক্লাব ফুটবলের। এরপরে তিনি ১৮৮৪ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'ওয়েলিংটন ক্লাব'। এখানে ফুটবল ছাড়াও ক্রিকেট, হকি, রাগবি, টেনিস খেলার ব্যবস্থা ছিল। বর্ণবৈষম্য দূর করতে ওই ক্লাবে কুমোরের ছেলে মণি দাসকে সদস্য করায় নগেন্দ্র প্রসাদের সঙ্গে অনেকের মনোমালিন্য হয়। তাতেই তিনি ওয়েলিংটন ক্লাব ভেঙে ১৮৮৬ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'শোভাবাজার ক্লাব'। এই ক্লাবের প্রথম সদস্য হন মণি দাস। যিনি পরে মোহনবাগান দলের হয়ে ফুটবলের নেতৃত্ব দিয়ে নিজের প্রতিভার পরিচয় দেন। এই ক্লাব তৈরির মাধ্যমে তিনি সামাজিক বিপ্লবের সূচনা করেন। ১৮৯২ সালে একটা উন্মুক্ত ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। যেখানে শোভাবাজার ক্লাব গোটা ইউরোপীয় ক্লাবগুলোকে ২-১ গোলে হারিয়ে জিতে নেয় 'ট্রেডস কাপ'। এই জয় শুধুমাত্র ভারতীয়দের জয় ছিল না, এটা ছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে অপমানজনক ব্যবহার ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে জয়। ইউরোপীয়ান ক্লাবের সঙ্গে ভারতীয় ক্লাবের খেলা দেখতে দর্শক হিসেবে ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। শিকাগো কাঁপিয়ে বিবেকানন্দ ওই সময়ে সদ্য দেশে ফিরেছেন। বিবেকানন্দকে নিয়ে সারা কলকাতা তখন আপ্লুত। শোভাবাজার রাজবাড়ির সংবর্ধনা সভায় তিনি নগেন্দ্র প্রসাদকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, 'ওঁর মতো মানুষ, ওই রকম মরদ চাই'।

ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে এই জয়ের জন্য নগেন্দ্র প্রসাদ কলকাতার রাজবাড়িতেই শুধু সম্মানিত হননি, তাঁকে সম্মান জানানো হয় পাঞ্জাবের পাতিয়ালাতেও।

নগেন্দ্র প্রসাদ বহু মানুষকে ফুটবল খেলায় অনুপ্রাণিত করেন। তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ফুটবলের জগতে আসেন কালীচরণ মিত্র। যিনি পরে কিংবদন্তি ফুটবলার গোষ্ঠ পালকে আবিষ্কার করেন। ১৮৮৩ সালে এক বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। যার উদ্যোগ নিয়েছিলেন নগেন্দ্র প্রসাদ। তিনি অনুভব করেছিলেন শুধু ফুটবল খেললেই হবে না, তৈরি করতে হবে খেলার উপযুক্ত পরিকাঠামো। সেই উদ্দেশ্যে ১৮৯২ সালে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব, ডালহৌসি ক্লাব ও ন্যাভাল ভলান্টিয়ারস এই তিনটি ক্লাবের সঙ্গে মিলে তিনি আয়োজন করেন সর্বভারতীয় শিল্ড। শিল্ড পরিচালনার জন্য তৈরি হয় ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। আইএফএ শিল্ড গঠনের উদ্যোগে নগেন্দ্র প্রসাদই ছিলেন একমাত্র ভারতীয় সদস্য। ১৮৯২ সালে আইএফএ শিল্ড খেলা হয়। তাঁর পথ অনুসরণ করে ১৮৮৯ সালে মোহনবাগান ক্লাব ও ১৯৯২ সালে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯১১ সালে মোহনবাগানের আইএফএ শিল্ড জয়ের মতো ঐতিহাসিক জয়ের নেপথ্যে ছিল নগেন্দ্র প্রসাদের ভূমিকা। তিনিই ভারতীয় ফুটবলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১৮৭৭ থেকে ১৯০২ সাল পর্যন্ত তিনি ৭০০'র বেশি ম্যাচ খেলেছিলেন। শুধু ফুটবল নয়, ক্রিকেট খেলাতেও তাঁর অবদান ছিল। তিনিই প্রথম ভারতীয় ক্রিকেটার, যাঁর ওভার হেড বোলিং করার ক্ষমতা ছিল। মোনা বসু ও সুধন্য বসু এই দুই বিখ্যাত ক্রিকেটার ছিলেন নগেন্দ্র প্রসাদের শিষ্য। তাঁর চেষ্টায় ক্রিকেট খেলায় 'হ্যারিসন শিল্ড' প্রতিযোগিতা শুরু হয়। যার মাধ্যমে তিনি ইংরেজদের সঙ্গে ভারতীয়দের প্রতিযোগিতার পথ দেখিয়েছিলেন। দীর্ঘ ২৫ বছর ভারতীয় ফুটবলকে নেতৃত্ব দিয়ে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাটর্নি জেনারেল হন। ফুটবলের পাশাপাশি নগেন্দ্র প্রসাদ ছিলেন নাট্যানুরাগীও। শেক্সপিয়ারের নাটক 'দ্য টেমপেস্ট' ও 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস' বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন নগেন্দ্র প্রসাদ।

১৯৭৭ সালে নগেন্দ্র প্রসাদের সম্মানে ভারতীয় ফুটবলের শতবর্ষ পূর্তি উদযাপন করা হয় মাত্র। এর বেশি আর কেউ তাঁকে মনে রাখেনি। ২০১৯ সালে শ্রীভেঙ্কটেশ ফিল্মসের প্রযোজনায় পরিচালক ধ্রুব ব্যানার্জি নগেন্দ্র প্রসাদের জীবনী অবলম্বনে তৈরি করেন 'গোলন্দাজ'। ছবিতে তাঁর ভূমিকায় অভিনয় করেন অভিনেতা দেব।

Manasi Research Foundation
INSTITUTE OF SKILLS
Under Management Control of Manasi Research Foundation
ভারত সরকার দ্বারা অনুমোদিত
Vocational প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
ভর্তি চলছে
আমাদের কোর্স
যোগাযোগ করুন
website : https://manasiresearch.org
E-mail : instituteofskills2022@gmail.com / manasimrf2014@gmail.com
Mob : 7980272019 /9330847337
• SMART ACCOUNTANT
• HOSPITALITY MANAGEMENT SERVICE
• E-COMMERCE -BPO-KPO-LPO
• OFFICE MANAGEMENT PROCEDURES AND PROTOCOL
• COMMUNICATION SKILLS
Be Skill & Let Skill
Build Your Capacity, Build your Career

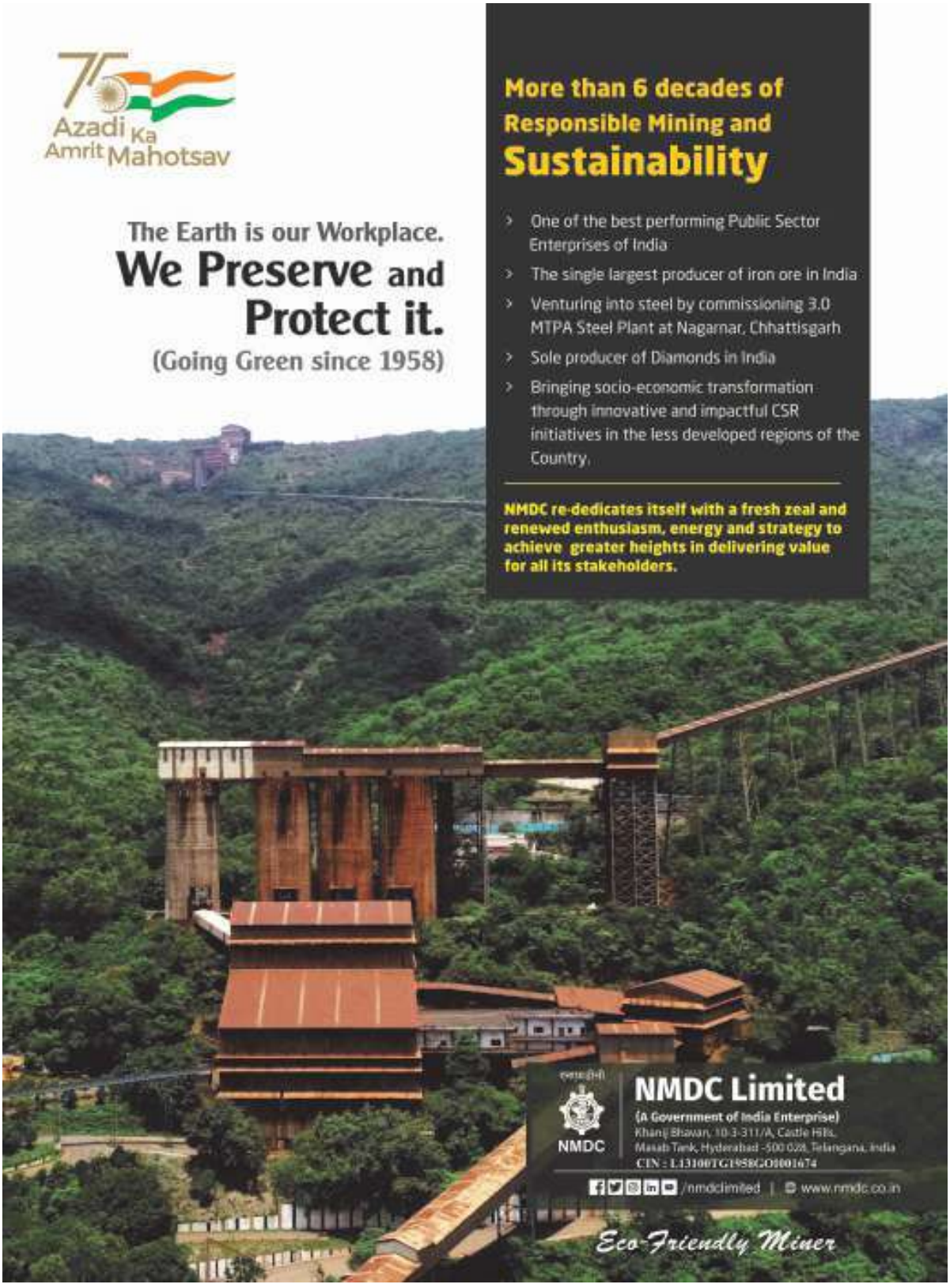
Azadi Ka Amrit Mahotsav
The Earth is our Workplace.
We Preserve and Protect it.
(Going Green since 1958)
More than 6 decades of Responsible Mining and Sustainability
One of the best performing Public Sector Enterprises of India
The single largest producer of iron ore in India
Venturing into steel by commissioning 3.0 MTPA Steel Plant at Nagarnar, Chhattisgarh
Sole producer of Diamonds in India
Bringing socio-economic transformation through innovative and impactful CSR initiatives in the less developed regions of the Country.
NMDC re-dedicates itself with a fresh zeal and renewed enthusiasm, energy and strategy to achieve greater heights in delivering value for all its stakeholders.
NMDC Limited
(A Government of India Enterprise)
Khanij Bhawan, 10-3-311/A, Castle Hills,
Masab Tank, Hyderabad -500 028, Telangana, India
CIN : L13100TG1958GOI001674
/nmdclimited | www.nmdc.co.in
Eco-Friendly Miner

S. K. Samanta & Co. (P) Ltd.

(An ISO 9001:2015 Company)

An Infrastructural Engineering Company

Corporate Office:

2/5, Sarat Bose Road, Kolkata 700 020
Phone: +91 33 6637 4090, 2454 4090, Fax: +91 33 2454 4094
E-mail: kol@sksl.in

Specialists in Turnkey Construction of:

- *Material Handling Plants*
- *Heavy Industrial Workshop Complexes*
- *Earthwork by Heavy Machineries*
- *Booster Pumping Stations*
- *Electrical Sub-stations*
- *Cross Country Water Conveying Systems*
- *Water & Waste Treatment Plants*
- *Roads, Bridges & Dams*

Serving the Nation for last 75 years

SKSL

We Practice Innovative Technology & Quality
For Achieving Total Customer Satisfaction

FINSHASTRA RESEARCH FOUNDATION

A trust for Generation

ABOUT US

FRF aims to build an equitable relationship of knowledge , opportunity and dignity between the youth of urban and rural India aspiring for commerce as a field of Education . It has been working tirelessly to bring value to commerce education including e-commerce , finance literacy with in the reach of a student sitting at farthest and remotest corner of India. It strives to take commerce education to such level that by 2030 each household in India will have its own financial advisory . It uses the under utilised urban material as a tool to trigger development with dignity , across the country .

OUR COURSES

- FINANCR FOR ENGINEERS
- FINANCE FOR LAWYERS
- PERSONAL FINANCE FOR DOCTORS
- FINACE FOR PROFESSIONALS

JOIN NOW

WHY US ?

- PROFESSIONAL FACULTY
- INDUSTRY FOCUSED CURRICULUM
- PRACTICAL APPROACH

Contact US

AshokGarh, Post: ISI, Kolkata- 700108

9987408142 2,8918610280,9874011899

finrfoundation@gmail.com

frf.finshastra.org

•GST

•INCOME TAX RETURN

•TDS RETURN

•P-TAX, TRADE LICENSE

•ESIC+PF REGISTRATION & MAINTAIN

•DSC, MSME

•CO. REGISTRATION

8420696088

gitakundudoll@gmail.com

TAX CONSULTANCY SERVICES

With Best Compliments from...

All Well Wisher

SrikantaMishra

With Best Compliments from...

All Well Wisher

Dol Gobinda Mandal

With Best Compliments from

ENGINEERS &
CONSTRUCTORS

TECHNO ELECTRIC AND ENGINEERING CO. LTD.

Mechanical Division:
6A, Park Plaza-South block, 6th Floor, 71, Park Street, Kolkata - 700 016
Tel: 30214700, Fax: 033-30214772, E-mail: tec hon@cal.vsnl.net.in

With Best Compliments from...

Phone : 227-8667
41/2/3, SERPENTINE LANE
CALCUTTA - 700014

G . DECO

On Central@Provincial Government Approve List of Suppliers

With Best Compliments from...

ALL WELL WISHER

SUPER ELECTRICAL

With Best Compliments from...

ALL WELL WISHER

PAPPU ELECTRICAL

Mobile : 9830710640

MOONLIGHT ELIECTRICALS

ELECTRICAL ENGINEERS & GOVT. LICENCE CONTRACTOR

Enlisted by WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DISTB.CO.LTD.

Resi : VIII, & P.O,- Wadipur, P.S. - Domjur, Dist. - Howrah-711411

With Best Compliments from...

ALL WELL WISHER

DEBABROTA DEY

স্বাধীনতা

সন্তোষ কুমার সরকার

হলুদ পাখিরা উড়ে যায় নীলাভ দিগন্তে মরু প্রান্তর ছাড়িয়ে বহুদূর...
তাদের কানে ভেসে আসে নদীর জলে হাঁসেদের জলকেলির শব্দ!
কখনো মনে হয় তারাও বন্ধু হবে, তাদের সাথে
বসবাস করবে নাম না জানা কোন দেশে!
কখনো মনে হয় এই বুঝি ভেজা মেঘের পরশ
লাগবে দু-হাতে, তারাও তো বাঁধন ছাড়া...
ইচ্ছে করলেই অবলীলাক্রমে ঝরে পড়ে
নয়নাভিরাম এই সুন্দর পৃথিবীর বুকে চুমু খেতে --
এই বাংলায় পৌষের শেষে সরষে খেতে ভ্রমরেরা
গুনগুন গানের সুর তোলে
তারা ফুলের কাছে সুগন্ধি ধার করে গায়ে মাখে
অন্য ফুলের কাছে যাবে বলে...
আপন স্বাধীনতায়।
সেই পাখিরা খাবারের সন্ধানে চলে যায় বহুদূর
আরো দূরে...
আবার কখনো উড়ে এসে বসে গাছের মিহিন মগডালে
তাদের মাথায় কখনো আসেইনা ডাল ভেঙে
দুর্ঘটনার শিকার হবে—
কারণ ভরসা রেখেছিল নিজের ডানায়
সেই পাখিরা ডানা ঝাপটায় স্বাধীনভাবে,
স্বাধীন সত্তায়।
কিচ্ছুটি জানেনা পক্ষীশাবক, শুধায়!
মানুষ কেন পথ চলে, শেকল পড়া পায়?

শিরোনাম-অভিনয়

নারায়ণ নন্দী

জীবনে চলার পথে-চলেছি করে শুধুই অভিনয়।
কখনো নিরুপায় হয়ে, আবার কখনোবা পেয়ে ভয়।
আসলে পৃথিবীটা একটা রঙ্গমঞ্চ-সকলেই অভিনেতা।
প্রত্যহ চলার পথে করি অভিনয়-করি কত ভণিতা।
না খেয়েও বলি খিদে নেই, অনেক খেয়েছি আজ।
পরিপাটি হয়ে বেরিয়ে যাই-অথচ নেই কোন কাজ।
অসুস্থ হলেও চেপে রাখি কভু-থাকেনা কোন উপায়।
নিরুপায় হয়েই-করতে হয় ভালো থাকার অভিনয়।
হাসিমুখে বলি ভালো আছি, অথচ ভিতরটা যায় জ্বলে।
আরো অভিনয় করি-ব্যথা যন্ত্রণাগুলো থাকতে ভুলে।

FINSHASTRA RESEARCH FOUNDATION

A trust for Generation

ABOUT US

FRF aims to build an equitable relationship of knowledge , opportunity and dignity between the youth of urban and rural India aspiring for commerce as a field of Education . It has been working tirelessly to bring value to commerce education including e-commerce , finance literacy with in the reach of a student sitting at farthest and remotest corner of India. It strives to take commerce education to such level that by 2030 each household in India will have its own financial advisory . It uses the under utilised urban material as a tool to trigger development with dignity , across the country .

OUR COURSES

- FINANCR FOR ENGINEERS
- FINANCE FOR LAWYERS
- PERSONAL FINANCE FOR DOCTORS
- FINACE FOR PROFESSIONALS

JOIN NOW

WHY US ?

- PROFESSIONAL FACULTY
- INDUSTRY FOCUSED CURRICULUM
- PRACTICAL APPROACH

Contact US

AshokGarh, Post: ISI, Kolkata- 700108

99874081422,8918610280,9874011899

finrfoundation@gmail.com

frf.finshastra.org

INSTITUTE OF SKILLS

Under Management Control of Manasi Research Foundation

ভারত সরকার দ্বারা অনুমোদিত

Vocational প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

ভর্তি চলছে

আমাদের কোর্স

- SMART ACCOUNTANT
- HOSPITALITY MANAGEMENT SERVICE
- E-COMMERCE –BPO-KPO-LPO
- OFFICE MANAGEMENT PROCEDURES AND PROTOCOL
- COMMUNICATION SKILLS

যোগাযোগ করুন

website :
https://manasiresearch.org

E-mail :
instituteofskills2022@gmail.com /
manasimrf2014@gmail.com

Mob : 7980272019 /9330847337

Be Skill & Let Skill

Build Your Capacity, Build your Career